দীপু কে

মুখবন্ধ

বাংলার উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে একটা গৌরবের যুগ—বাঙালীর জাতীয় জীবন ও বিকাশধারার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ অধ্যায়। এই কথা বলা খুব অত্যুক্তি হবে না যে এক চৈতন্যের যুগকে বাদ দিলে বাংলায় এর চেয়ে গৌরবের যুগ আর আসেনি ; পূর্ববর্তী পাঁচশত বছরে বাংলা তথা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে পরিবর্তন ঘটেছিল-- শুধুমাত্র উনিশ শতকের পরিবর্তন তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মে ও সমাজে, চারিত্র্যে ও বিদ্যা-চর্চায়, সাহিত্যে ও শিল্পে, এই শতকে বাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ অপার্থিব আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, জাতীয়তার ভাব ও নবজাগ্রত সংস্কারমুক্ত, স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত নতুন নতুন আদর্শ যে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা দিয়েছিল—তারই ফলে প্রথমে বাংলাদেশে, পরে সারাভারতে এক নতুন জাতীয় জীবনের সৃষ্টি হয়, রচিত হয় আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতির বনিয়াদ। সেই জন্যই উনিশ শতকের ইতিহাসের আকর্ষণ দুর্বার।

॥ ২ ॥

উনিশ শতক পরিবর্তনের যুগ এবং সে পরিবর্তন এসেছে সারা শতক জুড়ে যুগপৎ ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তনের সারথি হয়েছিলেন উনিশ শতকে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এরা ছিলেন অনুসন্ধিৎসু, সমাজ সচেতন, আপন ব্যক্তিত্বে আস্থাবান। নতুন যুগের নতুন শহর কলকাতা হল পরিবর্তনের কেন্দ্র। পরিবর্তনের ঢেউ ছুঁতে পারেনি গ্রামবাংলার অগণিত দরিদ্র জনসাধারণকে, যারা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত এবং নবচেতনার আলোক বঞ্চিত। এই সময়ে বাঙালী সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় সভ্যতা—প্রায় পরস্পর বিরোধী এই দুই ধারার : উনিশ শতকের বাঙালীরা একটা সার্থক চেষ্টা করেছিলেন এই দুই সভ্যতার মিলনের। এই মিলনের প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক ভাবধারার আঘাতে দেখা দিয়েছে জীবনের সমগ্র পরিসরে এক অভিনব সংঘাত ; ভেঙে পড়েছে প্রাচীন জীবনাদর্শ, সামাজিক বিন্যাস, মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা। আর তারই অন্তর ভেদ করে অঙ্কুরিত হয়েছে নতুন জীবনাদর্শ, চিন্তা ও প্রত্যয়। উনিশ শতকে বাঙালী মন হঠাৎ জেগে উঠেছিল এবং সকল বিরোধ-সংঘর্ষ ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই জাগরণ যে পরিণামের অভি-

মুখী হয়েছে, সে পরিণাম—জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, এক নতুন জাতীয়তাবোধ। ইংরেজ-শাসন ও তদধিক ইংরেজি শিক্ষা আঘাত হেনেছে বাঙালীর ভাব-জীবন ও চিন্তাজীবনের মূলে, তাঁর আত্মতৃপ্তির মানসদুর্গে। আঘাত হেনেছে আচার সর্বস্ব, পুঞ্জীভূত অনাচার, অজস্র বিধিনিষেধের আকর ধর্মে এবং নাড়া দিয়েছে প্রথাজীর্ণ, অবসাদাগ্রস্ত, হাজারো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালী সমাজকে। সেই আঘাত ভেঙেছে অবসাদ, আঘাতে অচল হয়েছে সচল এবং গতানুগতিকতা পেয়েছে নবরূপ, ঘটেছে জাগরণ—বাঙালীর প্রাণ, মন ও আত্মার সুপ্তিভঙ্গ।

বৃটিশ বিজয়ের ফলে বিজয়ীর বোধবুদ্ধি, মনন, ভাষাসাহিত্য, রুচি ইত্যাদি ভারতে নতুন সামাজিক গতি ও অন্তর প্রেরণা এনে দিয়েছিল। বন্ধুতা এবং বৈরিতা,—এই উভয় সম্পর্ক থেকেই ঐ প্রেরণা ধীরে ধীরে সমাজের বুকে সঞ্চারিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা এবং সেই সূত্রে আগত পাশ্চাত্যের চলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফসল—আত্মসচেতনতা, রাজনৈতিক চেতনা, নতুন অর্থ-নৈতিক ও সেই সূত্রে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা ইত্যাদি প্রচলিত অনেক বিশ্বাসের প্রতি সংশযের জন্ম দিল, যুক্তিহীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী আচারের সঙ্গে নবজাগ্রত যুক্তিবোধের দ্বন্দ্বে সমাজ হল চঞ্চল, আলোড়িত এবং তা থেকে এল নবচেতনা, জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা পরিব্যাপ্ত হল ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে। তবে, ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে সমাজজীবনে যতকিছু মতভেদ, অনৈক্য, পরস্পর-বিদ্বেষ, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ। এমনকি হিন্দুর ধর্ম বা হিন্দুর শাস্ত্রকে যারা বাতিল করতে চেয়েছিলেন তাঁদেরও ভাবনা-চিন্তার মূলে প্রেরণা ছিল ধর্ম (যেমন, ডিরোজিও শিষ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)। সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও অব্যাহত। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানগুলি প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। স্বভাবতই ধর্মের পথ ধরে এলো সমাজ-জিজ্ঞাসা। তাই বলা যায়, বাঙলার জাগরণ যুগ বিশেষভাবে ধর্মজিজ্ঞাসার যুগ।

উনিশ শতকের সূচনাকালে নানাদিক থেকে হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ হতে লাগল। প্রচলিত হিন্দুধর্মের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন খ্রীষ্টান মিশনারীগণ, আহ্বান জানালেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য; রামমোহন রায় ও তাঁর অনুবর্তীরা হিন্দুত্বের সবকিছুকে বর্জন না করে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে চাইলেন, ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠী নবজ্ঞানের উত্তেজনায় হিন্দুধর্মকে আক্রমণে আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করে যুক্তির পথ ধরে তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে প্রয়াসী। এই অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত সনাতনপন্থীদের মধ্যে দেখা দিল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। শুরু হল বাক্‌-বিতণ্ডা, দলাদলি। দ্বন্দ্ব দেখা দিল একদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সমর্থক ও হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের মধ্যে, আবার অন্যদিকে হিন্দুধর্মের

আক্রমণকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, এমনকি কেশবচন্দ্র সেনও অবতীর্ণ হলেন খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে, ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠী আক্রমণ করলেন রামমোহন ও তার অনুগামীদের 'হাফ লিবারেল' বলে। শুধু কি তাই, দ্বন্দ্ব দেখা দিল ব্রাহ্মদের মধ্যেও। এমন কি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অনেকেই শিকার হলেন ভাবদ্বন্দ্বের। হিন্দুধর্মের শিকড় এতই শক্ত ছিল যে আঘাতে তার মূল উৎপাটিত হয়নি, ভেঙেছে শুধু অবাঞ্ছিত শাখা-প্রশাখা এবং নববিদ্যার মহাসমুদ্রে স্নাত হয়ে আসল হিন্দুধর্ম, হিন্দু ঐতিহ্য আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তাই, দেখা যায় নাস্তিক বা সংস্কার পন্থী নেতৃবৃন্দের চরিত্রেও উদার নীতিবাদের সঙ্গে রক্ষণশীলতার সংমিশ্রণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গোঁড়া যুক্তিবাদী কৃষ্ণমোহন হয়ে দাঁড়ান যুক্তিহীন ধর্মান্ধ কৃষ্ণমোহন। ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যমণি 'নাস্তিকাগ্র গণ্য' দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যিনি বর্ধমানের বিধবা মহারাণী বসন্ত কুমারীকে বিবাহ করে 'বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও রেজিস্ট্রী বিবাহ' একসঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন, পরবর্তীকালে অযোধ্যায় গিয়ে তিনি টিকি রেখে ফোঁটা তিলক কেটে হলেন পরম বৈষ্ণব। প্যারীচাঁদ মিত্র হলেন প্রেতচর্চায় নিবিষ্টচিত্ত। জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিবাহ করার জন্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু হিন্দু জাত্যাভিমান ত্যাগ করতে পারেন নি। তিনি নিজেকে বলতেন 'ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান'। সেকালের আরেক চিন্তাধারা প্রত্যক্ষবাদে (Positivism) বিশ্বাসীরাও এই ভাব-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে পারেন নি। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ) বিশ্বাস করতেন 'পজিটিভিজম'-ই হবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ধর্ম। তিনি ছিলেন পৌত্তলিকতা বিরোধী, কিন্তু প্রাচীন বর্ণভেদের সমর্থক এবং বিশ্বাস করতেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠাই ভারতের উন্নতির উপায়। যোগেশ চন্দ্র ঘোষও শেষজীবনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাবান হয়েছিলেন। 'প্রগতিশীল' ব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই ভাবদ্বন্দ্বের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত।

ভাবদ্বন্দ্বের পরিসর ছড়িয়ে পড়ল ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায়। তর্ক উঠল মূর্তিপূজা নিয়ে, আলোচনা গভীরে প্রবেশ করল ধর্মের স্বরূপ নিয়ে, ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়ে —নিরাকার ও সাকার ব্রহ্মের ব্যাখ্যায়। তুলে ধরা হল মানবধর্মবাদ।

॥ ৩ ॥

ধর্মজিজ্ঞাসা থেকে এল সমাজ জিজ্ঞাসা এবং সমাজজিজ্ঞাসা থেকে অনুভূত হল সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা। পাশ্চাত্য ভাবধারার অভিঘাতে বাঙালী পেল মানুষ ও সমাজকে নতুন করে দেখার নতুন দৃষ্টি। সে দৃষ্টি দৈব নয়, মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করল স্বকীয় সত্তায়। ব্যক্তি মানুষ স্ব-নির্ভর হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে

চাইলো। লক্ষ্য করার বিষয়, ধর্মের কুসংস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজ-ব্যাধি নিবারণের প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমাজের চিন্তানায়করা জোর দিয়েছিলেন সমাজ সভ্যদের একাংশ অর্থাৎ নারীকল্যাণের চিন্তায়। সমাজ সংস্কারকগণ যেন নারীকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ-এর প্রকাশ পেয়েছে সতীদাহ নিবারণে, বিধবা বিবাহ আইনে। কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসে।

কিন্তু গোল বাধল সংস্কারের পরিধি ও উপায় নিয়ে। সংস্কারকগণ বিভক্ত হয়ে পড়লেন। সনাতনপন্থীগণ রক্ষণশীলতার আবরণ ছিন্ন করতে না পেরে সর্বক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজধারার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চাইলেন। বিপরীত প্রান্তে ছিলেন একদল উগ্রপন্থী সংস্কারক যারা প্রাচীন সমাজধারা ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন, আপত্তিকর সামাজিক প্রথাগুলি বর্জন করে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাইলেন; এমনকি নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ধারণাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে পুরোপুরি পাশ্চাত্যমুখী হয়ে পড়লেন। মধ্যপন্থীগণ দু'কূলই বজায় রেখে প্রাচীন আচার রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করে কিছুটা সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, সব গোষ্ঠীই সংস্কার প্রচেষ্টায় শাস্ত্রের সমর্থন খুঁজেছেন। কারণ, সংস্কারের বিষয়গুলি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং সাধারণ মানুষ যুক্তি বোঝেনা, শাস্ত্রের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল এবং একমাত্র শাস্ত্রের অনুশাসন তারা মেনে নেবে।

সংস্কারের উপায় সম্পর্কেও দেখা গেল মতভেদ। সমাজ সংস্কারের সহজতম পথ ছিল সরকারি আইন প্রণয়ন। খ্রীষ্টান মিশনারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারি আইন প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। আবার, সমাজ মনকে তৈরী না করে অনেক সংস্কারক সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। অনেকে আবার সমাজের যে কোন ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অনেকে বলেন, শিক্ষাই একমাত্র পারে সংস্কারের কন্টকাকীর্ণ পথকে সুগম করতে।

॥ ৪ ॥

বৃটিশ বিজয়ের ফলে ভারত সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াল। খ্রীষ্টীয় প্রচারবাদ, উপযোগবাদ ভারত সভ্যতাকে চিত্রিত করল সভ্যতা বিবর্জিত বলে। তাদের মতে, হিন্দুধর্মই ছিল অধঃপতিত, যার মূল পর্যন্ত পচে গেছে এবং যা সংস্কারেরও অযোগ্য। অপর দিকে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্গণ ঘোষণা করেন, ভারতের স্বর্ণযুগ রয়েছে অতীত সংস্কৃতিতে যা গ্রীসের প্রাচীন যুগের সঙ্গে তুলনীয়।

॥ ৫ ॥

উপরের আলোচনা থেকে এইকথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা একটু অস্বাভাবিক মাত্রায় অস্থির। নতুন এসে প্রাচীনকে পথ ছেড়ে দিতে বলছে—সেই লগ্নে ঘটেছে সংঘাত—ভাবজগতে, কর্মজগতে। বাঙালী যেন এই পর্বে ধর্ম, সমাজ ও জীবনকে পুনর্গঠন করতে প্রয়াসী। এই পর্ব বাঙালীর আত্মরক্ষার ও আত্মআবিষ্কারের পর্ব। একদিকে ভারতীয় অধ্যাত্ম-চেতনা আর এক দিকে ইউরোপীয় ভাবধারা—এই দুয়ের প্রভাবে গড়ে উঠেছে বাঙালীর মননভূমি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মত পার্থক্য, ও দলাদলি সত্ত্বেও সেই সময়কার বাঙালীরা ইংরেজি চর্চা থেকে তিনটি বড় শিক্ষা পেয়েছিলেন। প্রথম ধর্ম-জিজ্ঞাসা,—মনসা-শীতলা ও জাতপাতের উপধর্মকে তারা ধর্ম বলতে অস্বীকার করেছিলেন। দ্বিতীয় সমাজ-জিজ্ঞাসা,—আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজ যে একেবারেই বদ্ধ ও জীবনীশক্তিহীন, ইংরেজের গতিশীল সমাজের সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তটা মেনে নিয়েছিলেন। তৃতীয় সভ্যতা-জিজ্ঞাসা,—উইলিয়ম জোন্স-এর সময় থেকে সংস্কৃত চর্চার যে নতুন ধারার সূচনা হয়, যে ধারার মূল কথা হচ্ছে মধ্যযুগীয় ভারত সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার, সেই ধারাটাকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেছিলেন। এই তিনটি জিজ্ঞাসা থেকে তিনটি প্রধান ভাব সে-যুগের বাঙালী সমাজে বিশেষ প্রবলতা লাভ করে। প্রথমতঃ, ধর্মের ক্ষেত্রে মোটামুটি এই ধারণাটাই স্বীকৃত হয় যে, আমাদের ধর্মের মূলে স্মৃতিশাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্র নয়, ধর্মের মূলে হচ্ছে গীতা আর উপনিষদ, এবং স্মৃতি-পুরাণকে যতদূর পর্যন্ত গীতা-উপনিষদের ভাষ্যরূপে দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত স্মৃতি পুরাণ। তখন থেকে নিষ্কাম কর্ম, সর্বভূতে প্রীতি এবং লোকসেবাই হিন্দুধর্মের মূল শিক্ষারূপে স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তাঁরা চেয়েছিলেন, সমাজের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে সমাজের সংস্কার করতে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রানুগামিতা, দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা—এইগুলি সবই সমাজধারা রক্ষার সহযোগী সমাজসংস্কারের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তৃতীয়তঃ সভ্যতা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে মোটামুটি ইউরোপীয় ভারত-তাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্তটাই গৃহীত হয়, কিন্তু বাঙালীরাই সে-যুগে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে একটা নতুন সভ্যতা নির্মাণের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করার সাহস দেখান;—সেটাকে বলা যায়, নতুন এক ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতা। সে যুগের সাহিত্যে শিল্পকলায় স্বাদেশিকতায় এই জিনিসটাই প্রকাশ পায়। সাহিত্যে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কীর্তিকেও পুরোপুরি প্রাচ্য জিনিস বলা যায় না,—কিন্তু তাঁদের প্রতিভার গুণে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ সেদিন একটা মৌলিক সৃষ্টির গৌরব অর্জন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে,

এই সমস্ত কিছুর পিছনে ছিল উইলিয়ম জোন্স থেকে আরম্ভ করে ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত, সংস্কৃতজ্ঞ ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচারিত, সেই বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত—যার সার-মর্ম হচ্ছে যে, হিন্দুরা এক আদি ও অভগ্ন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সন্তান-দাসত্বের জন্মগত ললাট-লিখন নিয়ে তারা ধরধামে অবতীর্ণ হয়নি। এরই অনুসিদ্ধান্ত-রূপে উনিশ শতকের বাঙালীরা ভেবেছিলেন, এই যুগেও তারা ইউরোপীয়দের অন্ধ অনুকরণ করতে পারে না, পারে শুধু তাঁদের স্বাধীন ইন্দো-ইউরোপীয় পরিচয়টা নতুন করে ঘোষণা করতে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ এইভাবে সৃষ্টির বেদনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে বাঙালী ভাঙাগড়ার খেলায় ব্যস্ত, যা কিছু করেছে তাতে সে তার আত্মাকেই খুঁজেছে, তখনও পায়নি, তার প্রমাণ, সে ইতিপূর্বে সমাজ ও সংস্কারের প্রশ্নে বাদানুবাদ করেছে, অনুকরণ করেছে। দ্বিতীয়ার্ধে আসে নতুন প্রেরণা : বিরোধ-সংঘর্ষ নয়, সমন্বয়ই পথ। সেই পথে যুগব্যাপী সাধনা সার্থক হয়ে উঠে—সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার এবং পরে আধ্যাত্মিক সত্য পিপাসা, এবং এই সকলের মধ্য দিয়েই পূর্ণমনুষ্যত্বের যে পথ ও পাথেয় সন্ধান—তা-ই এই যুগের যুগব্যাপী সাধনা। ইতিমধ্যে সে আত্মপ্রকাশের ভাষাও খুঁজে পেল—নব্য বাংলা সাহিত্যের জন্ম হল। ফলত এতদিনে সে কবি ও ঋষির পদে—স্রষ্টার আসনে—অধিষ্ঠিত হল; রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের যুগ পরিণতি লাভ করল মধুসূদন, বঙ্কিম, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। যে জাগরণ এতদিন সমাজ, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ ছিল তা-ই সমগ্র জাতির প্রাণকে উদ্দীপ্ত ও সঞ্জীবিত করল। বিবর্তনের ধারা রূপ পেল **নব্য হিন্দু আন্দোলনের** মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনের ভাব-ইতিহাস (History of Ideas) এই পুস্তকের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

॥ ৬ ॥

উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে বাংলায় যে ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দিয়েছিল কিছু কিছু লেখক তাকে "হিন্দু পুনরুত্থান" বলে অভিহিত করেছেন। এই অভিধা আরোপের পেছনে মূল বক্তব্য ছিল—হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা কিছু কুসংস্কার ও যেসব অনভিপ্রেত আচার আচরণ ভারতে পাশ্চাত্য বুদ্ধিবিভাষা (Enlightenment) প্রসারের ফলে অচল ও অর্থহীন হয়ে পড়েছিল—এই ধর্ম আন্দোলন ছিল সেগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপঃপ্রয়াস মাত্র। এই তথাকথিত পুনরুত্থান প্রয়াসের বিরুদ্ধে আর একটা ইঙ্গিতময় বক্তব্য ছিল, তা নাকি উনিশ শতকে যেসব সুসংস্কার প্রয়াসী সম্প্রদায়গুলো, বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজীরা যা কিছু

কল্যাণকর কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, যে সব কুসংস্কার আর কদাচারকে খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং পশ্চিমের যে বুদ্ধিবিভাষাকে তাঁরা নিজেদের বিশ্বাসের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন তার সব কিছুকেই এই আন্দোলন নস্যাৎ করে দিচ্ছিল।

আমরা আলোচনাকালে দেখতে পাবো এই ধরনের অভিযোগগুলো আদৌ সঙ্গত নয়। "হিন্দু পুনরুত্থান'' অভিধাটি যথার্থ নয়; বরং এই আন্দোলনেরই অন্যতম উদ্যোক্তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে "নব্যহিন্দু আন্দোলন'' বলে যেভাবে অভিহিত করেছিলেন, তা-ই এক্ষেত্রে অনেক বেশী সুপ্রযুক্ত মনে হয়। বঙ্কিম 'নব্যহিন্দু' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন লোক ব্যবহার সিদ্ধ ও বিচারবিযুক্ত গোঁড়ামির সঙ্গে বিজড়িত আচার আচরণ থেকে হিন্দুধর্মের তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার জন্য। এই নব্য হিন্দুয়ানার ধারণাটি আসলে অনেক বেশী পরিব্যাপ্ত। বহুল প্রচলিত 'হিন্দু পুনরুত্থান' অভিধাটির চেয়ে 'নব্যহিন্দু আন্দোলন' কথাটির মধ্যে দিয়ে সমগ্র যুগটির মূল প্রেরণা অনেক বেশী সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়। এই আন্দোলন যথার্থ ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার সীমানা ছাড়িয়ে প্রবলভাবে একই সঙ্গে সমসাময়িক সাহিত্য, চারুকলা, সঙ্গীত, ইতিহাস শিক্ষাজগৎ এবং সবার ওপরে রাজনীতির ভাবজগৎকেও আলোকিত করে তুলেছিল। আসলে, এই নব্যহিন্দু আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ উপলব্ধির জন্য এই নব্যহিন্দু আন্দোলনের ভাবধারা সমূহের নিবিড় অধ্যয়ন ও অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। আবার এই আন্দোলনের পরিব্যাপ্তি ছিল আরো অনেক বেশী—নবীন ভারতের নির্মাণক্ষম ভাবকল্পনারই মূর্তপ্রকাশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই আন্দোলনের রাজনীতি ছিল নিছক একটি উপজাত মাত্র। এ ধরণের ব্যাপক একটা আন্দোলন নিশ্চয়ই সতন্ত্র অধ্যয়নের দাবী রাখে।

যেসব ভাব ও ভাবনা এই আন্দোলনকে সম্ভব করে তুলেছিল এবং নতুন অভিধাকে যথার্থতা এনে দিয়েছিল তাদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ধর্মক্ষেত্রে বিচারশীলতার অনুশীলন, (২) ধর্মানুসরণের মধ্য দিয়ে আত্মানুভূতি বা ব্যক্তিসত্তার দীপ্তিময় জাগরণ; (৩) পাশ্চাত্যমুখী ভারতের কাছে গৌরবদীপ্ত সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রাসঙ্গিকতা।

(১) পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জিত মুক্তবুদ্ধির চেতনা এবং খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের স্রোতের প্রতিকূলতার মুখে পড়ে প্রচলিত হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও আচার বিশ্বাসের অসম্পূর্ণতার যে উপলব্ধি হিন্দুদের বিহ্বল ও বিমূঢ় করে তুলেছিল তার মধ্য দিয়েই ধর্মক্ষেত্রে বিচারশীলতার উদ্ভব ঘটে। লোকদেখানো আচার সর্বস্বতা এবং সামাজিক রীতিনীতির ভারে অবসন্ন একটি

ধর্মমত হিসাবেই হিন্দুধর্মকে চিহ্নিত করা হত। রামমোহন রায়-ই প্রথম ধর্মক্ষেত্রে বিচারশীলতার এই মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এবং কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রমুখ পরবর্তী ব্রাহ্ম নেতারা বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের উপর ভিত্তি করে এক ধরণের বিচারশীল সাধনমার্গকে বরণ করে নিয়েছিলেন। আত্মার উপলব্ধির মাধ্যমেই ধর্মের নিহিত সত্য স্বতঃপ্রমাণিত—এই মতবাদের বিভ্রান্তি ছিল স্পষ্ট; কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে এই আত্মার উপলব্ধির পরিণতি হয়ে দাঁড়ালো এমন এক ধরণের আত্মগত অন্বেষা যা কেশবচন্দ্রের মতো স্রষ্টারই শুধু অধিগম্য ছিল। ১৮৬০-এর দশক শেষ হতে না হতে ব্রাহ্ম যুক্তিবাদের এই বিড়ম্বনাময় পরিণাম হিসেবে ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে একটি নতুন ভিত্তিভূমির অনুসন্ধান তাই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো। পাশ্চাত্যের তথা ইউরোপীয় যুক্তিবাদী বিচারশীলতার মনোভাবের প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মদের প্রতিক্রিয়া বৃহত্তর মূল প্রশ্নটিকে সযত্নে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল অর্থাৎ যে সংশয়াত্মক যুক্তিবাদ ধর্মবোধের মূল ভিত্তিকে ধরে টান দিচ্ছিল তার সন্তোষজনক জবাব ধর্মীয় চেতনার পক্ষে সম্ভব কি না তাকেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮৩৪-১৮৯৪) সর্বপ্রথমে এই বৃহত্তর প্রশ্নের মোকাবিলা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি বললেন—ধর্মের একটি প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক ভিত্তি রয়েছে; মানবধর্মবাদের (Humanism) দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি ধর্মীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত সত্তানিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলেন—'মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব; মানুষের স্থায়ী সুখ, মনুষ্যত্বে; মানুষের সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব'। ধর্মশাস্ত্র গীতার নির্দেশ অনুসরণ করে মানুষের সকল কর্ম, সকল কামনা ও সকল জ্ঞানকে ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে মানবজীবনের শ্রেয়ঃ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে তিনি গ্রহণ করলেন এবং এই নিঃশর্ত আত্মনিবেদনকেই ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে সন্তোষজনক সমাধানের উপায় বলে নির্দেশ করলেন। ধর্মসম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারশীল এই মনোভাবকে অনাবিল হিন্দুশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে দাঁড় করালেন এবং হিন্দুধর্মের এমন এক ব্যাখ্যা তিনি উপস্থিত করলেন যাতে পাশ্চাত্যের নতুন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ধর্মজিজ্ঞাসুর সকল সংশয়ী জিজ্ঞাসার উত্তর বহুলাংশে হাজির করা সম্ভব হল।

(২) দ্বিতীয় ভাবনাটি ছিল ধর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনের দীপ্তিময় জাগরণ সম্পর্কে অবিচল প্রত্যয়। হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মসমাজীয় বিশ্লেষণ বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসার অনেকখানি সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হলেও তা গভীরতর নানা প্রশ্নের সমাধান হাজির করতে ব্যর্থ হয়। কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই দুজনই ব্রাহ্ম সমাজের একনিষ্ঠ অনুরাগী হিসেবে সুপরিচিত। এই দুজনের জীবনকাহিনীতে আশ্চর্য সুন্দরভাবে ঐ সময়ের মানুষের ধর্মজিজ্ঞাসার একটি ছবি ফুটে

উঠেছে। দেখা গেল, একান্ত সংস্কার প্রয়াসী একটি ধর্মমত হিসেবে ব্রাহ্মধর্ম মানবমনের আকুল ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানে ব্যর্থ। কেশবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব 'নববিধান' উপস্থিত করলেন, অন্যদিকে বিজয়কৃষ্ণ হাজির করলেন হিন্দুধর্মের চৈতন্যবাদী এমন একটি রূপ যা সমকালের শিক্ষিত দেশবাসীর অন্তরে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হল। শ্রীরামকৃষ্ণের পরমশিষ্য বিবেকানন্দ ব্যক্তিগত আত্মানুভূতি বা দীপ্তিময় জাগরণের এক নতুন মতবাদ হাজির করলেন যা সমাজের কল্যাণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ আকুলতা দিয়ে ব্রাহ্মদের বিশুদ্ধ বৈদান্তিক বিশ্লেষণকে প্রাণময় করে তুলল—জীবসেবাকেই ঈশ্বরোপাসনার এমন একটি সোপান হিসেবে তিনি উপস্থাপিত করলেন যাতে করে আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের পথে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি হল না।

(৩) তৃতীয় ভাবনাটি ছিল ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী বর্তমান ও ভবিষ্যতের দৃষ্টিপথে তুলে ধরে একটি উজ্জ্বল যোগসূত্র সমন্বিত করা। গৌরবদীপ্ত অতীতের সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার জয়গানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ তাকে সমকালের ভারতীয় পটভূমিতে হাজির করলেন এক মহিমামণ্ডিত রূপে।

এই ধ্যানধারণাগুলোই ছিল নতুন আন্দোলনের মর্মকথা। শুধু অনুধ্যানেই তা অবসিত ছিল না, তা সঙ্গে করে নিয়ে এল এক ইতিবাচক মহৎ কর্মপ্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিগ্রাহ্য ধর্মানুশীলন এবং বিবেকানন্দের ব্যক্তিজীবনের দীপ্তিময় জাগরণের আদর্শ আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নমার্গীয় বলে প্রতিভাত হলেও সেবাধর্মের একই মহৎ লক্ষ্যে এসে এই দুয়ের আশ্চর্য সম্মিলন সাধিত হল: প্রথমতঃ, বেদান্তের শিক্ষা অনুসারে মানবসেবার মধ্যে দিয়ে সর্বভূতে ব্রহ্মের উপলব্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ, গীতার নির্দেশিত পথে একধরণের নিষ্কাম দেশসেবার মনোভাব থেকে ভারতবন্দনা। প্রথম মনোভাব থেকে দেখা দিল বিবেকানন্দের 'নরনারায়ণে'র উদ্বোধনের ও ভারতের নারীসমাজের মুক্তির যুগান্তকারী দুটি মহৎ সমাজ সংস্কার প্রয়াসী উদাত্ত আহ্বান; অন্যদিকে দ্বিতীয় মনোভাব থেকে দেখা ছিল দেশসেবার এক নতুন ভাবাদর্শ যা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পেছনে একটি প্রবল শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। ঐ যুগের রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস হিসেবে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ভাবকল্পনা আদর্শরূপে উপস্থাপিত হল। ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের এই আদর্শই কালক্রমে মহাত্মা গান্ধীর রামরাজ্যের কল্পনায় রূপায়িত হল, যদিও মহাত্মার অহিংসার জয়গান তাতে উপেক্ষিতই ছিল। স্বদেশী যুগের, বৈপ্লবিক সন্ত্রাসের' পথেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস দেখা দিল কিন্তু আসলে গোপন রাজনীতির বেড়াজাল 'সন্ত্রাসের' এই চোরাবালিতেই সেই প্রয়াসকে বিপর্যস্ত করে ফেলল। বঙ্গভঙ্গ রদ হল কিন্তু যে ধর্ম আন্দোলন প্রভূত পরিমাণে

স্বদেশী আন্দোলনে একদিন প্রেরণা জুগিয়েছিল তা ক্রমে ক্রমে একেবারে হীনবল হয়ে গেল।

সমস্ত সাফল্য ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও উনিশ শতকের ভারতে এই আন্দোলন প্রবল ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে দেখা দিলেও তার কোন নির্ভরযোগ্য ইতিবৃত্ত আজও লিপিবদ্ধ হয় নি। বর্তমান রচনায় এর একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমেই এই অধ্যায়ের সময়সীমা চিহ্নিত করে নেওয়া দরকার। ১৮৬৬ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত সময়সীমা আমাদের আলোচ্য অধ্যায়। ১৮৮২ সালের আগে এই "নব্যহিন্দু আন্দোলন" প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে বলা চলে না কারণ ঐ বছরই স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার পাতায় হিন্দু পৌত্তলিকতা নিয়ে কলকাতার জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউসনের (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) তদানীন্তন অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড হাস্তি (Hastie) এবং রামচন্দ্র ছদ্মনামের আড়ালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে একটি বিতর্ক শুরু হয়েছিল। কলকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এই বিতর্ক বিরাট আলোড়ন তোলে এবং এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুরা সনাতন হিন্দুধর্মের নানা ত্রুটি বিচ্যুতির সমাধান হিসেবে ব্রাহ্মদের ঈশ্বরবাদকেই একমাত্র পন্থা বলে আর মনে করেন না। বাংলা সাময়িকী 'নবজীবন' এবং 'প্রচার'-এর মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্যান্য লেখাগুলো প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮৮৮ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ধর্মতত্ত্ব" প্রকাশিত হল এবং তাতে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দুধর্মের একটি ধারাবাহিক ব্যাখ্যা হাজির করলেন। তারপরই প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় স্মরণীয় গ্রন্থ "কৃষ্ণচরিত্র" ১৮৯২ সালে। এই ঘটনাবলীর সূত্র ধরেই যেন এল স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে বিখ্যাত বক্তৃতা। তাই বলা যায় ১৮৮২ সাল থেকে এই নব্যহিন্দু আন্দোলন একটানা এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু সেই ১৮৬৬ সালে যখন ব্রাহ্মসমাজ দুটো পরিষ্কার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—এক পক্ষ তাদের হিন্দু পরিচয়কে সামনে তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন, অন্যদিকে অপর পক্ষ হিন্দুধর্মের সর্ববিধ কুসংস্কারকে একেবারে দূর করে দিতে চাইলেন—তখন থেকেই বলতে গেলে ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুরা সংস্কার প্রয়াসীদের প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। আসলে ব্রাহ্মদের মধ্যেকার যে বিভেদ দেখা দিল "রক্ষণশীল" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং "প্রগতিশীল" কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে তা মুখ্যতঃ দেখা দিয়েছিল অসবর্ণ বিবাহ এবং ব্রাহ্ম আচার্যদের উপবীত ধারনের মতো সামাজিক কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাকে যথার্থ ধর্মসাধনার একমাত্র পথ হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে এর মধ্যেই ইংরাজী শিক্ষিত অংশের মধ্যে ব্যাপক সংশয় দেখা দিয়েছিল। ফলে ১৮৬৬ সালকে অত্যন্ত সঙ্গতভাবে উনিশ শতকের বাংলাদেশের ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নতুন

পর্যায়ের সূচক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

অন্যদিকে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হল। ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচিত হল। যেহেতু ঐ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা এসেছিল তদানীন্তন ধর্মীয় আন্দোলন থেকে এবং দেখা গেল ঐ ধর্মীয় আবেগ রাজনৈতিক আন্দোলনের রসদ যোগাতে প্রায় পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে আসছিল। তাই বলা যায়, ঐ রাজনৈতিক আন্দোলনের সমাপ্তি এক অর্থে ছিল সংশ্লিষ্ট ঐ ধর্মীয় আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি।

॥ ৭ ॥

যেহেতু এই হিন্দু জাগরণ 'হিন্দু পুনরুত্থান' বলে সাধারণভাবে অভিহিত হয়ে থাকে, তাই প্রথমেই এই বিষয়টি আলোচনা করা দরকার। ব্রাহ্ম ইতিহাসবিদ্‌রা এবং পরবর্তীকালে মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ্‌রা এ বিষয়ে সহমত পোষণ করে এই ধর্মীয় 'পুনরুত্থান'কে হেয়জ্ঞানই করে গেছেন। ধর্মীয় পুনরুত্থান আর সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পশ্চাদমুখ অভিযাত্রাকে তারা সমার্থকই জ্ঞান করেছেন। ঐ সময়ের অন্যতম ব্রাহ্ম মুখপাত্র বিপিনচন্দ্র পাল। এঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই জেনেছি; তিনি মনে করেন এই আন্দোলন ''একদিন যে সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রবণতাগুলো ভ্রান্ত ও হানিকর বলে খোলাখুলি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সেগুলোর স্বপক্ষে নিত্যনতুন যুক্তিজাল রচনায় নিয়োজিত হল"। তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি ব্যাখ্যা করলেন কিভাবে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ 'হিন্দু পৌত্তলিকতা', 'জাতিভেদ' ও 'বাল্যবিবাহের' সংরক্ষণে তৎপর। তাঁর বক্তব্য হল ''পুনরুত্থানবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল'' এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে "এই আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের সমূহ মৌল প্রগতিমুখী ভাবনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল'' এবং "সাময়িকভাবে হলেও ধর্মীয় ও সমাজসংস্কার প্রয়াসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুললো।'' মিশনারী ইতিহাসবেত্তা জে. এন. ফারকুহার তো রামকৃষ্ণ আন্দোলনের মধ্যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কারের প্রতি ঔদাসীন্য ও "জীর্ণ বিশ্বাসের স্বপক্ষে পরিপূর্ণভাবে দাঁড়াবার প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন।'' মার্কসবাদী ঐতিহাসিক আর. পি. দত্ত-র কাছে এই আন্দোলন ''সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ধর্মবোধ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের" উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল এবং তা ''পিছিয়ে পড়া সর্ববিধ সনাতনী ভাবনাকে'' উচ্চে তুলে ধরেছিল এবং সসম্মান শ্রদ্ধায় বরণ করে নিয়েছিল। তাঁর মতে এই আন্দোলন ছিল একটি পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ, কেননা সনাতন ধর্মের এবং ''প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার তথাকথিত আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান করতে করতে …তা জাতীয় আন্দোলনের এবং রাজনৈতিক চেতনার যথার্থ অগ্রাভিযানকে

অনিবার্যভাবে প্রতিহত ও দুর্বল করে তুলেছিল।''

একে একে এই সমালোচনাগুলোর জবাব দেওয়া অনাবশ্যকই মনে হয়, অভিযোগগুলোকে খুঁটিয়ে দেখলেই চলে। পৌত্তলিকতার যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা মূলতঃ খ্রীষ্টীয় ও ঐস্লামিক দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয়েছে। বাস্তব ঐতিহাসিক বিচারে তা অর্থহীন। এতে সন্দেহ নেই ইহুদীয়, খ্রীষ্টীয় তথা কোরা-ণের অনুশাসন থেকে দেখলে মূর্তিপূজা একান্ত গর্হিত কাজ নিশ্চয়ই। নব্য-হিন্দু আন্দোলনের প্রবক্তারা বহু আয়াসে হিন্দু পৌত্তলিকতাকে প্যাগান পৌত্তলিকতা থেকে স্বতন্ত্র করে দেখিয়েছেন এবং মানুষের অনুকৃতিতে রচিত দেবদেবীর বহুরূপের আড়ালে প্রতিটি মূর্তির মধ্যে একটি দৈবীশক্তির অভি-ব্যক্তিকেই হিন্দু পৌত্তলিকতার মূলকথা বলে দেখাতে চেয়েছেন। নৈতিকতা, শিক্ষা বা রাজনৈতিক—এমন একটি ক্ষেত্রও নেই যেখানে দেখা যাবে না এই নব্যহিন্দু আন্দোলন পূর্ববর্তী দশকগুলোর সংস্কার প্রয়াসী আন্দোলনের, বিশেষ করে ব্রাহ্ম আন্দোলনের, অর্জিত কোনো সুফলকেই বিন্দুমাত্র নস্যাৎ করেছে।

বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক প্রয়াসের প্রতি নব্যহিন্দু আন্দো-লনের মনোভাব ছিল অনেকটা নিরাসক্ত ধরণের, তাকে সংহত বিরোধিতা বলা চলে না। এই বিষয়ে নব্যহিন্দু আন্দোলনের মনোভাব সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি থেকে যখন তিনি বলছেন, একটা জাতি বা ধর্মের মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব কত বেশী সংখ্যক বিধবাকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দেওয়া হল তা দিয়ে স্থিরীকৃত হয় না। কিছু কিছু 'সংস্কারক'-কে যেভাবে অবতাররূপে চিত্রিত করার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসহিষ্ণুতার সঙ্গেই বিবেকানন্দের এই মনোভাবের মিল রয়েছে অনেক বেশী। তাঁর মতে নব্যহিন্দুদের লক্ষ্য সমসাময়িক হিন্দু সমাজে একটি 'নৈতিক ও রাজ-নৈতিক নবজাগরণ' নিয়ে আসা; তাঁর মতে এই কাজটি হচ্ছে সকল সমাজ সং-স্কারের জন্য অপরিহার্য প্রথম কাজ। এই মনোভাবকে অবশ্যই সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধতা বলে চিহ্নিত করা চলে না; এ থেকে শুধু সমাজ সংস্কারের আগে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারের উপর গুরুত্বদানের কথাই বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে যে বাল্যবিবাহ প্রথা সমসাময়িক সংস্কারকদের বিচলিত করে তুলেছিল, সেই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের তীব্র মন্তব্য ও শানিত বিদ্রূপ বাক্য ছিল অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট ও স্বার্থহীন। মুখবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু রামমোহন রায়-এর বিরুদ্ধবাদীদের আমরা যে হিসেবে প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে চিহ্নিত করতে পারি সেই অর্থে নব্যহিন্দু আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক অভিমতগুলোকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে অভিহিত করা অন্যায় হবে। সদ্য-বিধবাদের মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রবর্তন এবং বিধবা বিবাহের

বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজা রাধাকান্তদেব (১৭৮৪-১৮৫৭) যে 'ধর্মসভা' ১৮৩০ সালের জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নব্যহিন্দুরা গড়ে তোলেন নি। তবে বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন বা অনুরূপ অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে নব্যহিন্দুরা কোনো আন্দোলন কেন গড়ে তোলেন নি তার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

নব্যহিন্দু আন্দোলন মূলতঃ সমগ্র হিন্দু সমাজের নবজাগরণের লক্ষ্যে নিবেদিত একটি অন্দোলন এবং স্বাভাবিকভাবেই তার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের আধ্যাত্মিক জাগরণ। এই উদ্দেশ্য সাধনে নব্যহিন্দুরা ব্রতী হয়েছিলেন স্বধর্মের নিহিত মর্মোদ্ধার করে ধর্মকে ও ধর্মীয় ভাবনাকে পরিশীলিত করে তুলতে। এক নতুন ভক্তিবাদের মধ্যেই এই ধারণাগুলো অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে; স্বদেশ ও মানবজাতির ধর্মবোধের কেন্দ্রীয় সত্যরূপে নিষ্কামধর্মের প্রবর্তনা ছিল তার মূলকথা। হিন্দুধর্মের মৌল মর্মবাণী হিসেবে 'সর্বভূতের প্রতি প্রীতির প্রসার' রূপে তাদেখা দিল এবং ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আত্মার জাগরণের লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ নির্দেশ করল। অন্যান্য ধর্মকে তাঁরা ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেন নি, তাঁরা বলতে চাইলেন তাদের স্বধর্মে সকল ধর্মের সারকথাই সত্যরূপে নিহিত রয়েছে, অর্থাৎ তাদের ধর্মই সার্বজনীন। এই অনুভবই বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার মূল কথা এবং তারই ভিত্তিতে অন্য কোন ধর্মমতের প্রতিকূলাচরণ না করেই তিনি বিশ্বব্যাপী হিন্দুধর্মের প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। কর্মায়োজনের নিরিখে দেখতে গেলে অন্যান্য সংস্কার প্রয়াসী সম্প্রদায়ের চেয়ে এই অভিযানের ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশী ও সুদূরপ্রসারী; কেননা ঐ সম্প্রদায়গুলো বড় জোর হিন্দু সমাজের বিশেষ কিছু অশুভ কুপ্রথারই শুধু অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। নব্যহিন্দু আন্দোলনের এই কর্মসূচীর পরিণতি সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত যা-ই দাঁড়াক না কেন, "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রভৃতি নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা বলতে চেয়েছিলেন মুখ্যতঃ বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারে সেই চেতনাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে—এই কথা অনস্বীকার্য। বিবেকানন্দের প্রচারের ফলে সমগ্র ভারত জুড়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটল জাতীয় জীবনের সংস্কারের দুটি মূল প্রশ্নে—ভারতের আপামর জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং জাতীয় জীবনের পুরোভাগে ভারতের নারীসমাজকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা। এই লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে নব্যহিন্দু আন্দোলনের সাফল্য যাই হোক না কেন, মুখ্যতঃ এই আন্দোলনের প্রয়াসের পরিণতি হিসাবে ভারতের ভাবজগৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার চিন্তার সংকীর্ণ অন্ধগলি থেকে মুক্তি পেল এবং এক বৃহত্তর চেতনায় তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। তা জাতীয় জীবনে এমন এক নতুন চেতনার উদ্বোধন ও জাতীয় ক্ষেত্রে এমন এক নতুন কর্মকাণ্ডের দ্বার উন্মোচন করে ছিল যা পূর্বতন সংস্কারকদের পক্ষে ছিল অভাবিত।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর রচনায় ১৮৮০-১৮৯০ এই অধ্যায়টি আলোচনা করেছেন, ফলে বিবেকানন্দ তাঁর আলোচনার বাইরে রয়ে গেছেন। অন্যদিকে যুক্তিবাদী নব্যহিন্দু বঙ্কিমচন্দ্রকে এবং আপাত যুক্তিবাদী ও সাময়িক খ্যাতিমান শশধর তর্কচূড়ামণিকে একই স্তরে রেখে তিনি আলোচনা করেছেন। তাই তাঁর অভিযোগগুলো খানিকটা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় কারণ তর্কচূড়ামণি মহোদয়ের মনোভঙ্গি ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী—আমাদের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনাতেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল একথা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী যুক্তিবাদী ব্রাহ্মচিন্তাবিদ্‌দের ও পরবর্তীকালের বিবেকানন্দের সঙ্গেই মিল ছিল বেশী, শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে নয়। একথা ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্রের সমালোচনা অনেকটা আড়ষ্ট, একেবারে খড়্গহস্ত সমালোচনা তিনি করেন নি। কিন্তু শশধর তর্কচূড়ামণির মতো প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণা এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরে বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণার পার্থক্য তিনি যে অনুধাবন করতে পারেন নি তার কারণ হল, ব্রাহ্মসংস্কার ভাবনা বিপিনচন্দ্রকে প্রচণ্ডভাবেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আর জে. এন. ফারকুহার সম্পর্কে বলা যায় তিনি ছিলেন খ্রীষ্টীয় মিশনারী এবং তাঁর সকল চিন্তাভাবনাই উনিশ শতকের ধর্ম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিল, ফলে সাধারণভাবে হিন্দুদের প্রতি ও বিশেষ করে বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার প্রতি তাঁর মনোভাব প্রত্যাশিতভাবেই খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত হয়েছিল। একই মন্তব্য রজনী পাম দত্ত সম্পর্কেও করা চলে, কারণ তিনি ধর্মের ব্যাপারে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করায় নব্যহিন্দু আন্দোলনের মতো একটি জটিল আন্দোলনকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন নি। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের চরিত্রায়নকালে তিনি 'অচল', 'অজ্ঞেয়বাদী', 'প্রতিক্রিয়াপন্থী' ইত্যাদি অভিধা যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু যথার্থ নব্যহিন্দু চিন্তাবিদ্‌দের একজনেরও প্রকৃত প্রতিক্রিয়াশীল কোন ধর্ম বা ভাবনার একটি দৃষ্টান্তও তিনি উল্লেখ করেন নি। গোঁড়া ধর্মচিন্তা ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের জয়ধ্বনি অনিবার্যভাবে জাতীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধনকে ব্যহত করেছে ও যথার্থ অগ্রগতিকে দুর্বল করে দিয়েছে—তাঁর এই প্রত্যয় ঘোষণার বিচার স্বদেশী আন্দোলনের আলোচনাকালে আমরা করব।

॥ ৮ ॥

আলোচনার ধারাকে আমরা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছি সেসম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমেই ১৮৭০-এর বছরগুলোতে বাংলার ধর্মীয়

প্রেক্ষাপটের একটা ব্যাখ্যা আমরা করেছি। উনিশ শতকের ধর্মীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ১৮৬৭ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত যে অধ্যায় তা এক গভীর অনিশ্চয়তারই সাক্ষ্য দেয়। রামমোহনের সমসাময়িককালে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অনাচারের বিরুদ্ধে নিছক একটি বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের চেয়ে এ যুগের অশান্ত অন্বেষা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। অশান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার এই পর্যায়ে প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ১৮৬৬ সালেই ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ডি ছিন্ন করে কেশবচন্দ্র বেরিয়ে এসেছিলেন। স্পষ্টতঃ সামাজিক সংস্কারের কয়েকটি প্রশ্নে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মদের চেয়ে অনেক বেশী পরিবর্তন প্রয়াসী কেশবচন্দ্রের প্রস্তাব নিয়েই বিরোধ বেঁধেছিল। ১৮৬৭ সাল শেষ হবার আগেই কেশবচন্দ্র পূর্বতন ব্রাহ্মমুখ্যদের বেদান্তীয় একেশ্বরবাদ নিয়ে মাতামাতির জন্য বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং ধর্মের যে গভীর উপলব্ধি ব্যক্তি মানসকে আলোকিত করে তোলে তাকে নিদারুণভাবে অবহেলা করা হচ্ছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই কলকাতার এই সময়ের ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রীয় পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন কেশবচন্দ্র; এই পর্যায়টিকেই আমরা ১৮৭০ এর বছরগুলোর 'আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার' অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছি। ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দের একটি অংশের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রতি একধরণের দ্বিধা-বিজড়িত অনুরাগ দেখা দেয়, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন কেশবচন্দ্র স্বয়ং। এই সময়ের অশান্ত ব্যাকুলতার অন্য দিকটি ছিল ধর্মীয় ব্যাপারে একধরণের উৎকট স্বাদেশিকতা। শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর অনুরাগীদের মধ্যেই তা সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে। আর্যসমাজ ও থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ছিল ঐ একই পথের পথিক।

তারপর আমরা দেখি ১৮৭০-এর দশক থেকেই বাংলাদেশে জন্ম নেয় এক নতুন দিব্যদর্শন এবং সেই দিব্য দর্শনই ভবিষ্যতকালের চিন্তায় উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ভারতের সভ্যতাকে নতুন করে মূল্যায়নের অভিযান। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে (১৮১৭) বাংলার ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায় যেভাবে ভারতীয় সভ্যতাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিতে শুরু করেন, এ ছিল তার তীব্র, তীক্ষ্ণ, সরব প্রতিবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের উদার সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকসম্পাতে ইউরোপীয় সভ্যতাকে নস্যাৎ করার কোন প্রশ্নই ছিল না। আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার উপর অসংখ্য নিবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে আচ্ছন্নতার ঘোর সৃষ্টি হয় তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

নব্যহিন্দু আন্দোলনের জন্ম হয় রেভারেণ্ড ডব্লু ডব্লু হেষ্টি (Hastie) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেকার বিতর্ক থেকে। তাই আমরা এ বিতর্ক ও

তার গুরুত্ব সবিশেষ আলোচনা করেছি। এর সূত্র ধরে আমরা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান-ধারণার ওপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি। ১৮৮২ থেকে ১৮৯৪ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ব্রাহ্ম যুক্তিবিচারের ধারা শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের প্রচারিত স্বজ্ঞা (intuitionism) ও দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয় বিষয়ক তত্ত্ব কথায় অবনিত হয়। অভিজ্ঞতাবাদের ভিত্তি থেকে বঙ্কিম তাঁর অন্বেষণ শুরু করেন, ব্রাহ্মদের মতো ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। তিনি আচরণের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন এবং আচরণের সর্বোৎকৃষ্ট কোন পথ অনুসরণ করলে নিরন্তন ও চিরন্তন সুখের সন্ধান মিলবে ও কেমন করে 'মানব রহস্যের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠার ফলে মানব মনের সুস্থিত সাযুজ্য স্থাপন সম্ভব হবে'—এই-ই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মানুষের বৃত্তিসমূহের স্ফূরণ ও 'সামঞ্জস্যকেই' তিনি মানবাত্মার পূর্ণতা হিসেবে চিহ্নিত করেন, কারণ এর ফলেই অভিজ্ঞতার আলোতেও 'স্থায়ী সুখের' সন্ধান মিলবে বলে তিনি মনে করতেন। মানুষের বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য বিধানের ভিত্তি হিসেবে গীতায় বর্ণিত ভক্তিকেই তিনি গ্রহণ করেন। এইভাবে সর্বভূতে বিরাজমান সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মানুষের কর্ম, প্রেম ও আত্মনিবেদনকেই তিনি ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের 'অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবাদের ঐশ্বরীয় ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে', সামনে তুলে ধরেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঈশ্বর ভাবনা যুক্তিবাদীর পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারে না—তাদের মনে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এইটুকু স্বীকার করে নিয়েই আমরা বলতে পারি, বঙ্কিম হিন্দু নীতিশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলোকে অনেক সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন। সূত্রগুলো এইরূপ : (১) নিষ্কাম কর্ম; (২) সর্বভূতের প্রতি ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ এবং সর্বজীবে দয়া; (৩) সর্বভূতে বিরাজমান ঈশ্বরের রূপ-কল্পনা। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিতর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ সূত্রগুলির অবদান নিঃসন্দেহে অসামান্য। এই তিনটি মূল ধর্ম-ভাবনাই পরবর্তী বছরগুলোতে বারে বারে আলোচিত হয়েছে। বেদান্তীয় একেশ্বরবাদ তথা নিরাকার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে ব্রাহ্মদের মগ্নতা এতে করে কেটে গেছে বলা চলে না, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের ফলে ব্রাহ্মদের বেদান্তীয় একেশ্বরবাদ তথা নিরাকার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরতত্ত্বকে অস্বীকার করা হয় নি, কিন্তু আলোচনার ধারা বদলে যায়। হ্যাস্টি-বঙ্কিম বিতর্ক (১৮৮২) নিয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, বঙ্কিমের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মদের যে আক্রমণ (১৮৮৪) পরিচালিত হয়, রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গদের মধ্যে বঙ্কিমের পুস্তক ও প্রবন্ধাদি নিয়ে যে আলোচনা চলে,—তা থেকে বঙ্কিমের চিন্তাধারা যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতার কর্মবাদের যে নতুন ব্যাখ্যা সাধারণভাবে হিন্দু নীতিশাস্ত্রের

মূলনীতি বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং তিলক, অরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে যা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে, তার উৎস শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

আলোচনার ধারা বজায় রাখতে আমরা বঙ্কিমের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম আক্রমণ ও তার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিমাণ নিয়েও একটা বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরে আমরা আলোচনা করেছি বিবেকানন্দের অন্তরজীবন নিয়ে। বঙ্কিমের বিচারধারা ছিল বুদ্ধিবাদী। কিন্তু ১৮৭০-এর দশকে যে আধ্যাত্মিক অনিশ্চয়তা কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে বিবেকানন্দ তার সঙ্গে যোগ করেন ধর্মের মধ্যে দিয়ে আত্মার জাগরণের ভাবনা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আত্মার জাগরণের জন্যে আকুলতাকেই ধর্মজীবনে একমাত্র লক্ষ্য বলে গণ্য করতেন। আত্মার জাগরণের এই আকুলতাই একটা চরম বিয়োগাত্মক তীব্রতা নিয়ে বিবেকানন্দের জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে। একদিকে মানুষকে সেবা করার সুতীব্র বাসনা এবং ভারতের সাধারণ মানুষ ও নারীজাতির উন্নতি সাধনের প্রয়াস ; অন্যদিকে ব্যক্তিগত মুক্তি-পিপাসার অদম্য আকুলতা এই দুইয়ের মিশ্রণের ফলে তাঁকে বিশ্ব-পরিব্রাজক হিসেবে অক্লান্ত বিশ্ব পরিভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, উপনিষদের বাণী প্রচার করে নরনারীকে প্রভাবিত করার অভিযানে ব্রতী হয়ে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই নিজেকে একান্তভাবে তিলে তিলে নিঃশেষ করে ফেলেন। বিবেকানন্দের প্রচারিত বাণীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারার পার্থক্য তেমন কিছু নেই, শুধু ভিন্ন মাধ্যমে তা ব্যক্ত হয়েছে মাত্র। বিবেকানন্দের যুক্তিধারা অনেকটা এরকম : (১) নিগূঢ় উপলব্ধি থেকে ব্যক্তিগত মুক্তি পিপাসার মূলে রয়েছে আত্মার ব্রহ্মময়তার ভাবনা এবং আত্মার এই ব্রহ্ম-ময়তার ভাবনা সর্বভূতে সমন্বিত নিগু'ণ ব্রহ্মস্বরূপেরই প্রকাশ, সগুণ ব্রহ্মকে আরা-ধনার মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে নিগু'ণ ব্রহ্মোপলব্ধিতে উপনীত হওয়া যাবে; (২) এই ঈশ্বরীয় ভাবনা থেকে সর্বজীবের প্রতি প্রীতির নৈতিক ধারনার উদ্ভব ঘটে এবং (৩) নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে অন্তর অনাবিল শুচিতায় পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং তাহলেই আত্মার জাগরণ সম্ভব হবে।

এরপরে আমরা আলোচনা করেছি সমাজ সংস্কার সম্পর্কে নব্যহিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা থেকে সমাজ সংস্কারের যে সামাজিক কর্মসূচীর দেখা মেলে তাতে আমরা পাচ্ছি, ভারতের (১) শূদ্র ও (২) নারী সমাজের উন্নতির ভাবনা। সমসাময়িক সংস্কারকগণ যারা আইনের আশ্রয় নিয়ে শাস্ত্রের বিধান মেনে বিধবা বিবাহের মত সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, তাদের পাশাপাশি বিবেকানন্দ তাঁর এই কর্মসূচী তুলে ধরেন। বি. মালাবারি এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের সংস্কার পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন। এখানেও

দেখা যাবে বিবেকানন্দের ভাবধারা বঙ্কিমের ভাবনা থেকেই উৎসারিত হয়েছে; বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বেশী যুক্তিসহকারে এই দুইটি চিন্তাধারাকে বিচার করে দেখেছেন। বিদ্যাসাগরীয় ভাবনার বিরুদ্ধে বঙ্কিমের আপত্তি সংক্ষেপে এই যে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের অনুশাসন খুঁজতে গেলে কোন প্রগতি সম্ভব নয় বরং এর ফলে বহু প্রমাদপূর্ণ শাস্ত্রীয় অনুশাসনের পথ সুগম হয়ে উঠবে। অন্যদিকে মালাবারি ভাবধারার সংস্কারকেরা হিন্দুদের অধিকাংশকে 'ধর্ষণকামী' এবং 'শিশু-সংগমকারী' হিসেবে চিত্রিত করে হিন্দু সমাজের মূলেই আঘাত করেছিলেন, কেননা মালাবারি বাল্যবিবাহ অবসানের জন্য আসলে এ-কথাই বলে বেড়াচ্ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারের বদলে পুনরুজ্জীবন কথাটি ব্যবহার করেন, কেননা তাঁর মতে এতে করে হিন্দুধর্মের মর্মবাণীর উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে সংস্কারের ভাবনাটি অনেক গভীরভাবে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের মতোই সমুদ্রযাত্রাকে সমর্থন করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, তাতে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘিত হলেও হিন্দুধর্মের মর্মকথার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ হিন্দুধর্মে ধর্মকে সমাজ-ধারণের সহায়ক বলেই অভিহিত করা হয়েছে আর তারজন্যে প্রগতির অন্যতম বাহন হিসেবে তা সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূলাচারী হতে পারে না। হিন্দুধর্মের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে 'অভেদ' কে আশ্রয় করে তিনি নীতিগতভাবে অসবর্ণ বিবাহ ও সর্ববর্ণ পঙক্তি-ভোজনের মতো সংস্কারকে অনুমোদন করেছেন। কিন্তু যেহেতু এই ধরণের সংস্কার থেকে এক ধরণের উত্তেজক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, যেমনটি হয়েছিল পূর্ববর্তীকালে ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যে যারা মদ্যপানের অভ্যাসেই ভারতের মুক্তি সাধিত হবে বলে ভাবতেন—তাই তিনি এই ধরণের ব্যাপারকে সংস্কারের বিষয় করে তুলতে চাননি। একই চিন্তাধারা থেকে অগ্রসর হয়ে হিন্দুদের মধ্যে 'নারীত্বের' নতুন ধারনা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। সমসাময়িকদের মতো নারী-পুরুষের তথাকথিত সমতায় হুজুগে মেতে ওঠেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'পুনরুজ্জীবনের' ধারনাটি তাই শিক্ষামূলক—আইনানুগ ব্যাপার নয়— তা ছিল হিন্দুধর্মের মর্মকথার উদ্বোধন, 'অধিকার' আদায়ের জন্যে নিছক একটি আহ্বান তা ছিল না। বিবেকানন্দ যে 'বিকাশে'র কথা বলেছিলেন তা ছিল এর থেকে অভিন্ন, পার্থক্য ছিল শুধু এইটুকুই যে, হিন্দুধর্মের যে ব্যাখ্যা তিনি করেছিলেন তাতে যখন স্বেচ্ছায় কোন নারী বিবাহ থেকে বিরত থাকতে চান তার সেই অধিকার এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়ার অধিকার তিনি স্বীকার করে নিতে বলেছিলেন।

নব্যহিন্দু আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু সভ্যতা সম্পর্কে কৌতূহল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর প্রাথমিক প্রবন্ধে এই অন্বেষা শুরু করেন।

পরবর্তী ধাপে 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি হিন্দুসভ্যতার রূপরেখাটি তুলে ধরেন। পাশাপাশি ভারতের সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সভ্যতার একটা তুলনামূলক আলোচনার প্রয়াসে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভ্যতার সূত্র' উদ্ভাবন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার কৃষ্ণচরিত্রে ভারতীয় সভ্যতার বৈদিক যুগ থেকে বৌদ্ধ যুগের অন্তর্বর্তী একটি গৌরবময় অধ্যায়কে উদ্‌ঘাটিত করেন। ঐ সভ্যতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনাধীনে রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস। ন্যায়ের জন্যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করে যাবার ক্ষাত্রবীরধর্মের আদর্শই ছিল ঐ সভ্যতার লক্ষ্য। এ ধরণের একটি সভ্যতা যে কবির কল্পনামাত্র নয়, বরং তা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে গুরুত্বপুর্ণ যুক্তি হাজির করেছেন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের প্রচারিত আদর্শকে খানিকটা পরিবর্তিত করেছেন এই অর্থে যে, বঙ্কিমের মতো একটি বিশেষ যুগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে তাঁরা সমগ্র ভারত ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। বিবেকানন্দের মতে ক্ষাত্র নয়, সন্ন্যাস ধর্মকেই ভারতের সভ্যতায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাস ও ক্ষাত্রধর্মের যে সুসামঞ্জস্যময় চিত্র মহাভারতের যুগে পাওয়া যায়, তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে ক্ষাত্র জীবন ধারার উপর জোর দেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। এই সুসামঞ্জস্য জীবনধারার কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, কিন্তু তাকে সন্ন্যাস ও ক্ষাত্রধর্মের সামঞ্জস্যরূপে না দেখিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত 'তপোবনের' আদর্শকেই তিনি ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ বলে গন্য করেছেন। তাঁর মতে নগরের ক্ষত্রিয় ও তপোবনের ব্রাহ্মণ—এই দুই জীবনধারার মিলনের মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার মর্মকথা বিধৃত।

ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা ভারতীয়দের সচেতন করে তোলে, যার রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এক্ষেত্রেও বরেণ্য অগ্রপথিক ছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, কারণ প্রাচীন সভ্যতা প্রসঙ্গে তাঁর নিবন্ধাবলীতে 'রাষ্ট্রনৈতিক নবচেতনাকে'ই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঈপ্সিত লক্ষ্য বলে উপস্থাপিত করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কৃষ্ণচরিত্রে তিনি সমকালীন সমাজ সংস্কারকদের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেদের ব্যাপৃত রাখার প্রয়াসকে খোলাখুলি সমালোচনা করেছেন। ন্যায়যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে 'ধর্মরাজ্য' সংস্থাপনের কর্মসূচীর কথা তিনি এইসব সমাজ সংস্কারের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন। 'স্বদেশী আন্দোলনের' সময় এই কর্মসূচীকেই সমকালীন রাজনৈতিক 'ক্রীড' (creed) হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীতে সে যুগের অনুগত দেশপ্রেম (Loyal Patriotism) ও আবেদন নিবেদনের রাজনীতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে চরমপন্থী রাজনীতির অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করে তোলেন।

অরবিন্দ প্রমুখ নেতারাও চরমপন্থাকেই তাঁদের রাজনৈতিক ক্রীড হিসাবে গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ভারত-পুনর্গঠন বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে দেশপ্রেম একটি ধর্মীয় কর্তব্য কর্মরূপে ও ধর্মের অঙ্গ হিসাবে উপস্থিত হয়। অরবিন্দ তাকে যথার্থ ধর্ম বলেই অবিহিত করেছেন। বঙ্কিচন্দ্রের 'ধর্মযুদ্ধের' মর্মবাণী বিকৃত হয়ে রূপ নেয় 'সন্ত্রাসবাদের' কর্মপ্রয়াসে। 'স্বরাজে'র মূলকথা বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মরাজ্য' সংক্রান্ত ভাবনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে বিজড়িত। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করে এই ধারণাকে আরো বিকশিত করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও নিবন্ধাবলীতে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনার আলোকেই 'স্বদেশীয়' চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা অনুসরণ করেই 'জাতীয় শিক্ষার' ভাবনা রূপ পায়। 'বয়কটের' ভাবনা মিশে যায় সন্ত্রাসবাদের কর্মধারার সঙ্গে। তাই সমগ্র স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) বহুলাংশে নব্যহিন্দু আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। দেশে নবচেতনার প্রসারে তা বেশ খানিকটা সাফল্যই লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তার চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ লাভ যা হয়েছিল তা হল রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের বাসনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং মহাত্মা গান্ধীর আগমনের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদীরা বেপরোয়া দুঃসাহসের আদর্শ স্থাপন করেছিল এবং 'ভীরুতার' যে অপবাদ হিন্দুদের সঙ্গে জড়িত ছিল তা নিঃসন্দেহে দুরীভূত হয়। ধর্মরাজ্য কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় নি; জাতীয় শিক্ষার প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়; স্বদেশী শেষ পর্যন্ত কয়েকটি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়; 'বয়কট' রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের রূপ নেয়। যে ধর্মীয় আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের বান ডেকে এনেছিল তা নিজেই নিষ্প্রাণ হয়ে যায়।

বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন আংশিক সাফল্যই অর্জন করেছিল। নব্যহিন্দু চিন্তাবিদেরা অতীতের ভারতীয় সভ্যতার নতুন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েএক ধরণের ইতিহাস চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। হিন্দুধর্মের সারকথাটিও তাঁরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এই আন্দোলনের সূত্র ধরে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মধারাও একটি আদর্শগত ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল। তাছাড়া বঙ্গসংস্কৃতির কয়েকটি দিককে এই আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণে আলোকিত করে তুলেছিল। একটি নতুন সাহিত্যধারা বঙ্গভাষায় নবজীবনের প্রাণস্পন্দন নিয়ে আসে। শিল্পক্ষেত্রে নবজাগরণ দেখা দেয় এবং নতুন ভাবনায় শিল্পীর মানসলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। নব্যহিন্দু সংগঠন হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন মানবতার আদর্শকে পবিত্রতায় মহিমামণ্ডিত করে তুলতে থাকে।

॥ ৯ ॥

এই বিষয়টি নিয়ে একটি বই লেখার পরামর্শ আমাকে প্রথম দেন আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক বিনয় ভূষণ চৌধুরী। তাই, প্রথমেই তাঁর কথা স্মরণ করি। আরো স্মরণ করি ডঃ নিখিল সুর, ডঃ বলাই বাড়ুই, ডঃ রমেন্দ্র নারায়ণ নাগ ও অধ্যাপক মানসকুমার ভট্টাচার্যকে—তাদের পরামর্শ ও উৎসাহের জন্য। অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকার পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে বইটি ছাপানোর জন্য উৎসাহিত করেছেন। অনেক অনেক পড়তে হবে, বুঝতে হবে ও সম্ভব হলে লিখতে হবে—এই প্রেরণা সবসময় আমাকে দিয়ে থাকেন বন্ধুবর সুহাস মজুমদার। আমি এদের কৃতজ্ঞতা জানাই। কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটির পাণ্ডু-লিপি তৈরি করতে সাহায্য করেছেন আমার ছাত্র শ্রীমান সেখ বাসারত হোসেন ও ছাত্রী শ্রীমতী স্বপ্না সরকার। ওদের সাহায্য ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। ওরা আমার আপনজন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাই অবকাশ নেই।

রাখাল চন্দ্র নাথ

'নাথ ভবন', সেণ্ট্রাল 'ই' রোড,
আনন্দ পুরী, বারাকপুর, পোঃ নোনা চন্দন পুকুর,
২৪-পরগণা (উত্তর), পিন-৭৪৩১০১

বিষয় সূচী

১

আধ্যাত্মিক অস্থিরতা

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাঙলাদেশে একটি নতুন ধর্ম-উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল; শতাব্দীর সূচনায় যে ধর্ম-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার সঙ্গে এর রূপ ও প্রকৃতির প্রভেদ ছিল বিরাট। একদিকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম, এবং অপরদিকে রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারের প্রভাবে হিন্দু সমাজে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পরবর্তী যুগের ধর্মীয় ব্যাকুলতা থেকে ছিল ভিন্ন ধরনের। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্যের নতুন আলোর দীপ্তিতে এমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের অনেক কাজে আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক রীতিনীতি ও শিক্ষার মতো ধর্মের ক্ষেত্রেও যা কিছু সংস্কার ও পরিহারের প্রয়োজন তা অনুভূত ও প্রস্তাবিত হয়েছিল হিন্দু সমাজের ইউরোপীয় সমালোচকদের পক্ষ থেকে, যদিও একমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্র নবরূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছিলেন হিন্দুগণই। ধর্মের ক্ষেত্রে মূর্তিপূজা আর সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য ও বহুবিবাহ প্রথার মতো কুপ্রথাগুলি সমসাময়িক ইউরোপীয় ধ্যানধারণাকে আহত করেছিল। তাই তাঁরা এই প্রথাগুলিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। ধর্মে বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ, সামাজিক রীতিনীতিতে জাতিভেদের বিরোধিতা ও এক বিবাহ প্রথা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী শিক্ষা ছিল এই সব প্রস্তাবিত সংস্কারের বিষয়বস্তু। নীচে আমরা রামমোহন রায়ের লেখা থেকে দুটি অংশ তুলে ধরছি; এর মধ্যে শতাব্দীর প্রথমার্ধের ধর্ম-আন্দোলনের মূল স্বরূপ ধরা পড়বে।

"হিন্দু পৌত্তলিকতার অদ্ভুত ক্রিয়াকর্মের দ্বারা প্রবর্তিত অসুবিধাজনক ও ক্ষতিকর রীতিনীতিগুলিকে নিয়ে আমি নিরন্তর চিন্তা করেছি। এই রীতি-

নীতিগুলি অন্য যে কোন 'পেগান' (Pagan) রীতিনীতি অপেক্ষা সামাজিক কাঠামোকে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে দুর্বল করে,...এই চিন্তার ফলে আমি আমার সমস্ত প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে বাধ্য হয়েছি, যাতে দেশবাসীকে ভুল স্বপ্ন থেকে জাগাতে পারি।"[১]

"আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, হিন্দুগণ কর্তৃক অনুসৃত বর্তমান ধর্মীয় প্রথাগুলি তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়। জাতিভেদ, জাতির মধ্যে অসংখ্য ভাগ ও উপরিভাগ তাঁদেরকে দেশভক্তির উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত করেছে। বহু সংখ্যক ধর্মীয় রীতিনীতি, অনুষ্ঠান ও বিশুদ্ধতার নিয়মাবলী তাঁদেরকে যে কোন কঠিন উদ্যম গ্রহণের ব্যাপারে অনুপযুক্ত করে তুলেছে। অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা এবং সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁদের ধর্মে কিছু পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক।"[২]

এই উদ্ধৃতি দুটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, রামমোহনের ধর্মীয় সংস্কার ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের হাতিয়ার। আপাতদৃষ্টিতে এই উদ্ধৃতি দুটি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি কিংবা নাস্তিকের কাছে আন্তরিকভাবেই সমর্থিত হতে পারে, কারণ এগুলি বিশেষ কোন ধর্মীয় মতবাদকে সমর্থন করে না। প্রথম উদ্ধৃতিতে পৌত্তলিকতা থেকে মুক্তি কোন বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বলা হয়নি বরং এর উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার, এই উদ্ধৃতি রামমোহন রচিত সংক্ষিপ্ত বেদান্তের (Abridgement of the Vedanta) প্রস্তাবনার অংশ বিশেষ, যেখানে তিনি বৈদান্তিক একেশ্বরবাদকে সমর্থন করেছেন। বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ, কিন্তু এই মত প্রচারের ক্ষেত্রেও তিনি দেশবাসীকে তাঁদের 'ভ্রান্তিবিলাস' থেকে মুক্ত করার ব্যাপারকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। রামমোহনের মতে ভ্রান্তিগুলি হল—পৌত্তলিকতার প্রতি আকর্ষণ, পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম ও শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁদের সমর্থন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম বিভাজন পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস আলোচনা করে একথা বলা খুব ভুল হবে না যে ঐ কালপর্যায়ে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় আলোচনা, ধর্মের প্রকৃত অর্থ ও ধর্মীয় জীবন অন্বেষণের চেয়ে ইউরোপীয় সমালোচনার উত্তর দেওয়াই যেন বেশী গুরুত্ব পেয়েছিল। তবু একথা মানতেই হবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) মতো ব্যক্তিও এই সময় শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ছিলেন, যিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিক আলোর সন্ধানে বৈদান্তিক একেশ্বরবাদী হিসাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।[৩] কিন্তু এই উদাহরণ এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করে না যে, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে যে ধর্মীয় অসন্তোষ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সামা-

জিক, ধর্মীয় নয়। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজে বিভাজন গভীরতর অন্বেষার দ্যোতক। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মীয় উন্মাদনা বাঙলার ইতিহাসে বিশেষভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

(ক) কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)

এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে মত-পার্থক্যের সূচনা হয়েছিল সামাজিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে, কিন্তু তার কেন্দ্রে ছিল ধর্ম। কেশবচন্দ্র ছিলেন অসবর্ণ বিবাহের সমর্থক; কিন্তু সাবধানী দেবেন্দ্রনাথ মনে করতেন অসবর্ণ বিবাহকে ব্রাহ্ম সমাজের সামাজিক সংস্কারের পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করার সময় তখনও আসেনি। উপরন্তু কেশবচন্দ্র সমাজের আচার্যগণের উপবীত ধারণের প্রথাও দূর করতে চেয়েছিলেন। মত-পার্থক্যের পরিণতিতে কেশবচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের নিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৬৬)।

কিন্তু শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে গেল যে সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের প্রকৃত কারণ নয়। কেশবচন্দ্রের মধ্যে ছিল অস্থির ধর্মীয় অন্বেষা। এই অস্থিরতার জন্যই অতি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে যান। নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার পরের বছরই মূল ব্রাহ্ম সমাজের চেয়ে আরো বেশী মৌলিক সংস্কারের পরিকল্পনা অনুসরণের জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। ফলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে যে বিচ্ছিন্নতা দেবেন্দ্রনাথ চান নি, তাই অনিবার্য হয়ে উঠল। আদি ব্রাহ্মদের কাছে কেশবচন্দ্রের ধর্মীয় উন্মাদনা পীড়াদায়ক মনে হল। ব্যাপারটা আরও বেশী জটিল হয়ে উঠল কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের অত্যুচ্ছ্বাসের ফলে, যা ছিল প্রায় শ্রীচৈতন্যের অনুসরণ। কেশবচন্দ্রের জীবন রচয়িতার[৪] মতে শ্রীখোল ও নৃত্য-সহযোগে পথ পরিক্রমার প্রবর্তন ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা। কেশবচন্দ্রের হৃদয় যখন ভক্তিভাবাবিষ্ট হয়ে উঠত তখন শ্রীখোল সহযোগে সংকীর্তনের জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠতেন।

কেশবচন্দ্র পরবর্তী জীবনে তাঁর এই হৃদয়াবেগকে 'ভক্তির প্রবহন' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এই ভক্তির প্রবহনের প্রকাশ ঘটে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের একটি ঘটনায়। এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কেশবচন্দ্র ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজের শিক্ষা সে সময় যে শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রচণ্ড ইউরোপীয় যুক্তিবাদে প্রভাবিত ছিল তা নয়, হিন্দুনামের সঙ্গে জড়িত সবকিছুর প্রতি বিদ্বেষভাবে পূর্ণ ছিল। কেশব-চন্দ্র অবশ্য ডিরোজীয়ান ছিলেন না, এবং ডিরোজীয়ানদের মতো হিন্দু আচার পদ্ধতিকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে কোন একজন ডিরোজিয়ানের মতো বলেননি

যে, 'হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করি'।[৫] কেশবচন্দ্রের শিক্ষা বা তাঁর সহযোগীবৃন্দ অথবা পুরোনো ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব কোন কিছুই তাঁকে হিন্দুধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার সুযোগ দেয়নি। বরং ঐ যুগের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর কাছে হিন্দুধর্মের রীতিনীতি হাস্যকর বলেই মনে হোত।

কেশবচন্দ্রের মানসিকতার এই পটভূমি মনে রেখে আমাদের ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের ঘটনার গুরুত্ব পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেদিন কলকাতার নাগরিকগণ বিস্মিত হলেন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে তাঁর অনুগামী-দের এক বিশাল ধর্মীয় মিছিল দেখে, মিছিলের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা ছিলেন নৃত্যরত, তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল ঈশ্বরের জয়ধ্বনি, উত্থিত হচ্ছিল পাপী-তাপীদের প্রতি এই অভয়বাণী যে, তাদের মতো ক্রিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ হলে তাঁদেরও মুক্তি অনিবার্য। মিছিলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গলায় দোলায়-মান শ্রীখোল, তার শব্দ এবং শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুগামীদের অনুকরণে কেশব-চন্দ্রের নেতৃত্বে নগর সংকীর্তনের উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা।

তাহলে কি কেশবচন্দ্র আবার হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার কেশবচন্দ্রের অনুগামীগণ ঘটনাটিকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। এমন কি অনেককে বহুকষ্টে মিছিলে যোগ দিতে সম্মত করানো হয়। শ্রীখোলের প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে কেশবচন্দ্রের জীবনীকার লিখলেন, "শ্রীখোল এল, কিন্তু কেশবের অনুগামীগণ তখনও শ্রীখোলের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।"[৬]

কেশবচন্দ্রের জনৈক অন্তরঙ্গ অনুরাগীর নিন্দাসূচক বিবৃতি শুধু এই সত্যকেই গোপন করতে চায় যে, তাঁর ইংরেজী শিক্ষিত বন্ধুগণ তাঁদের নেতাকে প্রগতিশীল ব্রাহ্মধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে হিন্দুধর্মের অসভ্যতায় নিমগ্ন হতে দেখে হতাশ হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী দেবেন্দ্রনাথের থেকে অনেক বেশী প্রগতিশীল বলে মনে করা হোত। তিনি অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছেন এবং ব্রাহ্ম পুরোহিতগণ কর্তৃক উপবীত ধারণের প্রথার বিরোধীতা করেই দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করেছেন। অথচ এই কেশবচন্দ্রই নগর সংকীর্তনে অংশ গ্রহণ করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুললেন। কেশবচন্দ্রের এই আচরণে এমন কি অনেক হিন্দুর মনেও খট্‌কা লেগেছিল। কারণ শ্রীচৈতন্যের নগর সংকীর্তন ছিল অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য। কিন্তু কেশবচন্দ্রের আন্তরিকতা ও বিশ্বাস তাঁর নিজের মনে এই ধারণাকে দৃঢ় করেছিল যে, নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্ম জগতের উচ্চস্তরে উপনীত হতে পারবেন। সেইদিন থেকেই ব্রাহ্ম শিবিরে দ্বিতীয় বিভাজনের বীজ রোপিত হয়।

আমরা ঘটনাটিকে এত বিস্তারিত আলোচনা করেছি শুধু এইটুকু দেখানোর জন্য যে, হিন্দুধর্মের সংস্কার কামনায় রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ যে ধর্মমত গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্যে কেশবচন্দ্র আধ্যাত্মিক শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।[৭] খুব স্বাভাবিকভাবেই রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব কেশবচন্দ্রের উপর পড়তে পারে নি। শ্রীহরি এবং শ্রীমার আরাধনা থেকে হিন্দুধর্মকে মুক্ত করার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা যে কেবল ব্যর্থ হয়েছিল তা নয়, বরং শ্রীহরি ও শ্রীমার চরণেই তাঁদের বিশিষ্ট শিষ্য কেশবচন্দ্র আত্মনিবেদন করলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেশবচন্দ্র তাঁর এই আচার আচরণকে ব্রাহ্ম ধর্মের নিরাকার ব্রাহ্মতত্ত্বের বিরোধী বলে মনে করতেন না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন, তিনি শ্রীহরি ও মাতৃপূজার পুনঃপ্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন নি, তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, তিনি শুধুমাত্র প্রচলিত ভক্তিবাদী পৌত্তলিকতাকে গ্রহণ করেছেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস, ধর্মের অন্বেষার মূলে ভক্তিই প্রধান। কিন্তু তাঁর এই ধারণা তাঁর নিজের দল বা দেবেন্দ্রনাথের অনুগামীদের মনে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে নি।

কেশবচন্দ্রের জীবনের পরবর্তী কার্যকলাপগুলোকে এই নগর সংকীর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই তাঁর মনের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার এক নতুন বিতর্কের ঝড় তুললেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল, তিনি হিন্দুদের অবতারতত্ত্ব গ্রহণ করে নিজেকেই অবতার বলে প্রচার করতে শুরু করেছেন। অবতারগণ যেরকম সাষ্টাঙ্গে প্রণাম গ্রহণ করেন, কেশবচন্দ্রকেও দেখা গেল সেরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করতে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামীরা এমনকি কেশবচন্দ্রের দলের অনেকেই কেশবচন্দ্রের এই মনোভাবকে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে শুরু করলেন। উত্তরে কেশবচন্দ্র বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে, তিনি কখনও নিজেকে অবতার বলে দাবী করেন না, বরং মনে করেন এই ধরনের বিনয়সূচক ক্রিয়াকলাপ উন্নততর আধ্যাত্মিকতার সহায়ক। কেশবচন্দ্রের এই যুক্তিতে তাঁর অনুগামীরা নীরব হয়ে গেলেন বটে, কিন্তু একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ভারতবর্ষে প্রগতিশীলতা কেশবচন্দ্রের উপর আর নির্ভর করতে পারছে না।

কেশবচন্দ্রের পরবর্তী দুটি কাজ পূর্বের কাজগুলির মতোই অচিন্ত্যনীয়। যীশু-খ্রীষ্ট সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাস অনেক ইংরেজ অনুরাগীদের আকর্ষণ করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ইংলণ্ডে গমন এবং রাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক তাঁর অভ্যর্থনা এই ঘটনারই সাক্ষ্য। কিন্তু তাঁর এই খ্রীষ্টান বন্ধুগণ যখন বুঝতে পারলেন যে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান বিশ্বাসমতো যীশুকে ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ বলে স্বীকার করতেও তিনি প্রস্তুত নন, তখন থেকেই তাঁর খ্রীষ্টান বন্ধুগণ কেশবচন্দ্রকে পরিহার করতে শুরু

করেন। এমনকি গোঁড়া খ্রীষ্টান মতানুসারে 'ত্রিত্বে'র অন্যতম সদস্যরূপেও যীশুকে স্বীকার করতেন না। সংক্ষেপে, তিনি একেশ্বরবাদী ও ত্রিত্ব মতবাদী উভয়েরই বিরাগভাজন হন।

কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সকলকে অবাক করে দেন। ঐ বছর ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পাশ হয়। ঐ আইন অনুসারে বিবাহ ইচ্ছুদের ঘোষণা করতে হোত যে, তাঁরা হিন্দু নন এবং এই আইন অনুসারে বিবাহের সঙ্গে হিন্দু বিবাহের আচার আচরণের কোন সংশ্রব নেই। এই আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়ে কেশবচন্দ্র হিন্দুধর্মকে একটা বিরাট ধাক্কা দিলেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা যে হিন্দুধর্মের আওতার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন কেশবচন্দ্রের তা অভিপ্রেত নয়।

কেশবচন্দ্রের দলের প্রগতিশীলরাও বস্তুতঃ এক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়লেন। এই আইন কি কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীলতার চূড়ান্ত পরিচয় নয়? তিনি অন্যায়ভাবে হিন্দুধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন; তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে মিথ্যা এই কাজের দ্বারা তিনি তা প্রমাণ করেছেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর দলের উগ্রপন্থীরাও হয়তো পিছিয়ে আসতেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায় তিনি কি তাঁর মনোভাবে অটল থাকবেন? এ অবস্থায় কেশবচন্দ্রের দলের প্রগতিশীলেরাও বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। দক্ষিণেশ্বরের এই ঋষির জীবনে ইংরেজী শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। তিনি ছিলেন ভগবানেরই মানুষ। তিনি সকল ধর্মের সত্য প্রচার করতেন। ধর্ম নিয়ে আলোচনা ও কিভাবে ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জীবন যাপন করা যায় এইই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তিনি কোন অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন নি, বরং সে ব্যাপারে নিজের অক্ষমতাই প্রকাশ করতেন। সুমধুর বাংলা ভাষায় তিনি ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেন, ইচ্ছামত সমাধিস্থ হতেন। সমাধি কিংবা জাগরণ সব অবস্থাতেই তিনি ভগবৎ প্রেমে বিভোর হয়ে নৃত্য করে, গান গেয়ে, ভগবান ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি ছিলেন শিশুর মতো সরল, জাত বোহেমিয়ানের মতো সদাহাস্যময়, সন্তানতুল্য শিষ্যদের প্রতি মায়ের মতোই স্নেহশীলা এবং পার্থিব ভোগ বিলাস থেকে ঊর্ধ্বে-ওঠা এক অনাসক্ত প্রজ্ঞা। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে একবার ব্রাহ্ম উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু পাছে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বল্প-বসন অভিজাত অতিথিদের বিরক্তির কারণ ঘটায়, তাই তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন। কেশবচন্দ্র এই আশ্চর্য মানুষটিকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেন।[৮] তাঁদের মধ্যে যে সখ্যতা গড়ে ওঠে তা

কেশবচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। কেশবচন্দ্রই তাঁর ইংরেজী পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণকে কলকাতার ইংরেজী শিক্ষিত মানুষদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন।[৯]

কেশবচন্দ্রের অনুগামীরা সেই মুহূর্তে এই সখ্যতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের কাছ থেকে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং রামকৃষ্ণের প্রচার কেশবচন্দ্রের প্রভাবে কতদূর সম্ভব হয়েছিল, এ প্রশ্ন নিয়ে আজও বিতর্ক চলে। এও সম্ভব যে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সম্পর্ক না থাকলে হয়তো বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ হত না। এই সম্পর্কই হয়তো মহেন্দ্রলাল গুপ্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এসেছিল, যিনি পরবর্তীকালে 'কথামৃত' রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত যে, কেশবচন্দ্র নিজেকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্রমশঃ ধর্ম সাধনায় নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনা যেমন একদিকে ব্রাহ্ম সমাজে দ্বিতীয়বার ভাঙ্গন সৃষ্টি করল তেমনি প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারক হিসেবে কেশবচন্দ্রের খ্যাতি চির-কালের জন্য বিনষ্ট হল। ঐ বছর তিনি কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে তাঁর এক কন্যার বিবাহ দেন। মেয়েটি ছিল অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং এই বিবাহও ছিল ব্রাহ্ম সমাজের নীতিবিরুদ্ধ। ঐ বিবাহের ফলে কেশবচন্দ্র যে শুধু নিজের নীতি থেকেই ভ্রষ্ট হলেন তা নয়, হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের আচার আচরণের সংমিশ্রণের সুযোগ দেওয়ার অপরাধেও অভিযুক্ত হলেন। অভিযোগটি পুরোপুরি সত্য নয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে রাজপরিবারের লোকেরা বিবাহের সময় প্রায় জোর করেই কিছু হিন্দু আচার অনুষ্ঠিত করে। কিন্তু তাহলেও এই ঘটনা কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে অবরুদ্ধ ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটাতে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী ছিল। তাঁরা প্রচার করলেন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থের বেদীতে তিনি তাঁর নীতিকে উৎসর্গ করেছেন। কেশবচন্দ্র প্রত্যুত্তরে জোর দিয়ে বললেন যে, শুধুমাত্র তাঁর মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে নয়, তাঁর প্রতিটি চিন্তা ও কর্মে তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশই গ্রহণ করেন এবং 'অন্তর নির্দেশ' (inner voice) অনুসারেই তিনি কাজ করেন। প্রগতিবাদীরা এতে সন্তুষ্ট হলেন না, তাঁরা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আরো গণতান্ত্রিক সংবিধানের ভিত্তিতে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গড়ে তুললেন।

এরপর জীবনের শেষ কয়েকটি বছর কেশবচন্দ্র সমাজ সংস্কার থেকে সরে এসে অতীন্দ্রিয় সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করে নতুন ধর্মমত 'নববিধান' প্রচারে প্রবৃত্ত হন। নিঃসঙ্গ এই ধর্মপ্রচারক কঠোর পরিশ্রমের ফলে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে অকাল প্রয়াত হন।

কেশবচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপসংহারে সে যুগের ধর্মীয় আন্দোলনের

পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবন ও কর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৮৭০ এর দশকে বাঙলার ধর্মীয় জীবনে যে আধ্যাত্মিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল কেশবচন্দ্র ছিলেন তাঁর প্রতীক। রক্ষণশীল সমাজ সংস্কারকরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হলেও পরবর্তীকালে তিনি রক্ষণশীল এবং প্রগতিপন্থী সকল মানুষ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন। কেশবচন্দ্রের মন ছিল অশান্ত।[১০] তাঁর নববিধান ছিল অসংলগ্ন কতিপয় ধারণার প্রতিমূর্তি।[১১] নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার সঙ্গে বৈষ্ণবীয় পদ্ধতির অনুসরণে ধর্মোচ্ছ্বাসের সংমিশ্রণ এবং সেই সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টে দেবত্ব আরোপ অনেকের মনেই বিশ্বাস উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় সূত্র থেকে ধর্মমত গ্রহণ করে তিনি সেগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ তাঁর অশান্ত মন ধর্ম অন্বেষায় ছিল অতৃপ্ত। এই জন্যই সমসাময়িক যুগে তিনি ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি দুর্বার বেগে আকর্ষণ করেছেন এবং একই কারণে মৃত্যুর পর সহজেই বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

(খ) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯)

কেশবচন্দ্রের জীবনব্যাপী নিরন্তর ধর্মীয় চিন্তার উপসংহার যদি সত্তরের দশকের ধর্মীয় অনিশ্চয়তার পরিচয় হয়, তাহলে বলা যায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে বিধৃত হয়েছিল সনাতন ধর্মের আন্তরিক শক্তি। কেশবচন্দ্রের কার্যধারা ছিল গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—শুধুমাত্র সুপ্রাচীন গোঁড়ামীর বিরুদ্ধেই নয়, রামমোহন নির্দেশিত ধর্ম, এমনকি তাঁর নিজের ধর্মীয় জীবনের সাময়িক গোঁড়ামীর বিরুদ্ধেও ছিল এই প্রতিবাদ। বিজয়কৃষ্ণের ধর্মীয় অন্বেষা আপাতদৃষ্টিতে কেশবচন্দ্রের মতো হলেও তিনি ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। কেশবের মতো তিনিও ঘন ঘন ধর্মীয় আচরণ ও পদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু কেশবের মতো তাঁর এই পরিবর্তন বিভিন্ন ধর্মের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হয়নি, পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্খাই ছিল সেই পরিবর্তনের মূল কারণ। শ্রীচৈতন্যদেবের বিখ্যাত শিষ্য অদ্বৈতাচার্যের বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি গোঁড়া বৈষ্ণব আবহাওয়ায় বড় হয়ে ওঠেন। কিন্তু শংকরাচার্যের বৈদান্তিক দর্শন পাঠ করার ফলে তাঁর মন থেকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর পুরোনো বিশ্বাস বিদূরিত হয়, এমন কি প্রচলিত হিন্দুদেবদেবীর উপাসনাও তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। আবার পরমাত্মার সঙ্গে মিলনাকাঙ্খায় তাঁর অশান্ত মনে শংকর দর্শন সান্ত্বনা যোগাতে পারে না। কয়েকজন পরিচিতের পরামর্শে এই সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসেন। সমাজের ভক্তদের ভক্তিগীতি, স্তোত্রপাঠ ও ধর্মীয় পরিবেশ তাকে খুবই মুগ্ধ করে। দেবেন্দ্রনাথের বাণী শুনে প্রায় নতুন মানুষ হয়ে তিনি ঘরে ফিরে যান।[১২]

কিন্তু তাঁর এই নতুন বিশ্বাসের সঙ্গে পারিবারিক গোঁড়া রীতিনীতির সংঘর্ষ বাধে। ব্রাহ্মরীতি অনুসারে তিনি উপবীত বিসর্জন দেন যার শাস্তিস্বরূপ তিনি সমাজচ্যুত হন। তাঁকে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগও করতে হয় তবু তিনি স্থির চিত্তে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করেন, কোনরকম উষ্মা প্রকাশ করেননি।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজয়কৃষ্ণের কর্মজীবন একজন প্রগতিশীল, সমাজ সংস্কারের প্রতিচ্ছবি, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে সেই ছবি উজ্জ্বল। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ব্রাহ্ম যিনি উপবীত ত্যাগ করেন। তিনিই নিশ্চিতরূপে প্রথম ব্যক্তি যিনি উপবীত ত্যাগ করতে অসম্মত ব্রাহ্ম পুরোহিতদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের আপোষ করার প্রবণতাকে দৃঢ়ভাবে সমালোচনা করেন। কেশবের সহযোগীদের মধ্যে তিনিই প্রথম তাঁদের নেতার অবতারবাদের প্রতি আসক্তির প্রতিবাদ করেন। সম্ভবতঃ তাঁর উদ্যোগেই কেশবের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের বালিকা কন্যা বিবাহের সময় কেশবের বাল্যবিবাহ সমর্থন করার যুক্তিকে তিনি উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করেন। কিন্তু এইসব সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও বিজয়কৃষ্ণের অন্তর পরমেশ্বরে একীভূত হওয়ার আকাঙ্খায় সর্বদা উদগ্রীব ছিল। তাঁর বৈষ্ণবীয় আর্তি অনেক সময় প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ বেদনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর বক্তৃতাবলী। বিজয়কৃষ্ণের প্রকৃত সংকল্প ও অভিলাষ যা এতদিন সমাজ সংস্কারের অন্তরাগ্রহে আচ্ছন্ন ছিল তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী থেকে তিনি যে বাণী বিতরণ করলেন তাতে সৃষ্টি হল অভূতপূর্ব ধর্মীয় উন্মাদনা। বাণী বিতরণের অন্তিমে বিজয়কৃষ্ণ যখন বিশ্বমাতাকে উদ্দেশ্য করে উচ্চ কণ্ঠে 'হে মাতা' 'হে মাতা' বলে উঠতেন তখন শ্রোতাদের হৃদয় আশ্চর্য অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু এই সময় জনৈক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিজয়কৃষ্ণের ধর্মীয় জীবন এক নতুন দিকে মোড় নেয়। সেই সন্ন্যাসীকে গুরুরূপে বরণ করে নেবার জন্য তিনি অধীর হয়ে ওঠেন।

সন্ন্যাসী কিন্তু তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করতে রাজী হলেন না, রহস্যজনক কণ্ঠে বললেন "পূর্বে নির্ধারিত হয়ে আছে যে তুমি অন্য কোথাও তোমার গুরুকে লাভ করবে।" বহুস্থানে গুরুর সন্ধানে ভ্রমণ করে বিজয়কৃষ্ণ অবশেষে আকাশগঙ্গা পর্বতে 'বাবাজী'র সন্ধান পেলেন। ইনিও বিজয়কৃষ্ণের পূর্ব নির্ধারিত গুরু নন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁর প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন। ঈশ্বরের খোঁজে অধীর হয়ে বিজয়কৃষ্ণ যখন একদিন প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি হঠাৎ এক অপরিচিতের স্পর্শে জেগে ওঠেন। সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিই তাঁকে এমন আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিলেন, যা তাঁকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। মনে হয় এই অজ্ঞাত

ব্যক্তিই সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে তিব্বত থেকে বিজয়ের কাছে এসেছিলেন তাঁর অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করতে। ইনিই বিজয়কৃষ্ণের সেই পূর্ব নির্ধারিত গুরু।

তখন থেকেই বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। উপরোক্ত অলৌকিকতার সূত্র ধরে বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে, যার ব্যাখ্যা দেওয়া ঐতিহাসিকদের পক্ষে দুরূহ। এরপর তাঁকে ঘিরে একদল শিষ্য-মণ্ডলী গড়ে ওঠে, এঁদের বেশীর ভাগই হিন্দু, অল্প কয়েকজন মাত্র ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে বহিষ্কৃত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভি-যোগগুলি হল : (এক) তিনি আধ্যাত্ম সাধনায় গুরুর উপর গুরুত্ব আরোপ করে-ছেন; (দুই) মূর্তি এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করাকে সমর্থন করেছেন; (তিন) ঈশ্বর ভক্তির চরম নিদর্শনরূপে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের উল্লেখ করেছেন; (চার) মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দীক্ষা দানের প্রবণতা দেখিয়েছেন এবং (পাঁচ) দ্বিধাহীন চিত্তে বেশ কিছু আচার আচরণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিজয়কৃষ্ণ তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে তাঁর আচরণকে সমর্থন করলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজে পদত্যাগ পত্র দাখিল করে স্বাধীন ধর্মীয় জীবন শুরু করেন। বিজয়কৃষ্ণের পরবর্তী জীবনকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যায়—তিনি পুরোপুরি চৈতন্য ভাবাবলম্বী না হয়েও ধর্মীয় সাধনায় 'মধুরভাব' অবলম্বন করে শিষ্যদের মুক্তি সাধনায় অব-শিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।[১৩]

বিজয়কৃষ্ণের জীবন ও কার্যাবলীর আলোচনার উপসংহারে বলা যায় যে, তিনিও ছিলেন ঐ শতাব্দীর সত্তর দশকের আধ্যাত্মিক অস্থিরতার প্রতিনিধি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে তিনি ইংরেজী শিক্ষা পাননি। গোঁড়াপন্থা থেকে তাঁর সম্পর্কহীনতা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিশেষ অর্থবহ এই কারণে যে, অন্যান্য ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের মনে পৈত্রিক ধর্মের প্রতি যে অনীহা দেখা দিয়েছিল তার মূলে ছিল ইংরেজ প্রভুদের সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক অন্বেষা তেমন ছিল না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, জীবনের শেষ দিনটিতে পর্যন্ত বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছেন। ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর আত্মার তৃষ্ণাকে মেটাতে পারে নি, এ তাঁর নিজেরই কথা। তাঁর পরবর্তী জীবনের পরিবর্তনকে ঘিরে হিন্দু ও ব্রাহ্ম শিষ্যগণ পরস্পর বিরোধী দাবি করে থাকেন এই প্রসঙ্গে যে, তিনি কি প্রকৃতই হিন্দু ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন ? তাঁর হিন্দুয়ানী ছিল বস্তুতঃ একটি উচ্চতর সমন্বয়ের পূর্বাভাস, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে বিবর্তিত হচ্ছিল।

(গ) ধর্মের নামে উৎকট স্বাদেশীকতা : শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮)

১৮৭০-এর দশকে শশধর তর্কচূড়ামণি এবং তাঁর অনুগামীদের হিন্দুয়ানিও গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রবর্তন প্রচেষ্টা একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর অনুগামীদের ধর্মীয় আন্দোলন ছিল নকলধর্ম ও ইতিহাসের আবরণে হিন্দু গোঁড়ামির পক্ষে ওকালতি করা। তাঁদের বক্তব্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমরা যা কিছু প্রগতিশীল বলি তার সব কিছুই আছে সনাতন হিন্দুধর্মে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা থেকে শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর শিষ্যদের মনোভাব বোঝা যায়। "সামরিক বিদ্যাতে প্রাচীন ভারতবর্ষ বর্তমান সভ্যতাভিমানী সকল জাতি অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী ও হস্তিপৃষ্ঠে যোদ্ধবর্গ যথা নিয়মে অপূর্ব যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করিতেন। তখনকার ব্যূহ রচনার সংকেত বর্তমান ব্যূহ নির্মাণ কৌশল অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট ছিল। অনেকের সংস্কার এই যে, প্রাচীন ভারতীয় বীরবর্গ শরশরাসন মাত্র অথবা অসি চর্ম খড়্গ গদা আদি লইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, কিন্তু এখনকার ন্যায় তোপ ও বন্দুকের নিকট তাঁহাদিগের যুদ্ধবিদ্যা লজ্জা পাইয়া থাকে। যাঁহারা রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এরূপ ভ্রমে পতিত হয়েন না।"[১৪] বস্তুতঃ এখানে আমরা এমন এক মানসিকতার সম্মুখীন হই যা ধর্মের সঙ্গে জাতীয় গৌরবকে একাকার করে ফেলেছিল, ইতিহাসের থেকে বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল নিছক আবেগের উপর।

শশধরের জন্ম হয়েছিল এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে, এবং তাঁর শিক্ষায় পাশ্চাত্যের কোনরকম প্রভাব ছিল না। তেইশ বছর বয়সে তিনি কাশিমবাজারের জমিদার অন্নদাপ্রসাদ রায়ের আনুকূল্যে পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এই জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মের প্রচারকরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। বলা হয় যে, সামান্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর ধর্ম ও সমাজকে লাঞ্ছিত হতে দেখে তিনি ব্যথিত হন। ১৮৭০-এর দশকের শেষদিকে শশধর মুঙ্গেরে পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর মনেও শশধরের মতো একই কারণে ক্ষোভ ও বেদনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল। ইনি পরে শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামীরূপে পরিচিত হন। এঁরা কলকাতা ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন এবং লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে মুঙ্গেরে 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে গ্রামে, গঞ্জে, জেলায় ও মহকুমায় বস্তুতঃ সম্ভাব্য সকল স্থানে এ জাতীয় আরো অনেক সভার প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫]

উত্তরপুরুষগণ শশধর ও কৃষ্ণপ্রসন্ন বা তাঁদের আন্দোলনকে আর স্মরণ করেন নি। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে নবধর্ম চেতনার পাশাপাশি তাঁদের অতি সাধারণ ধ্যান-ধারণাকে বিচার করলে এই বিস্মরণ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। শশধর অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনও তাঁর জীবনীতে একটি অধ্যায় জুড়ে শশধরের প্রচার কর্মের বিবরণ দিয়েছেন। তবে কলকাতায় শশধরের কর্মজীবনকে আমরা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, এই দশ বৎসর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখি।

শশধর ও তাঁর অনুগামীদের আন্দোলন যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত আদি ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন সভাপতি রাজনারায়ণ বসু, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতিকে লিখেছিলেন, "আপনারা শীঘ্রই হিন্দুর আদর্শে ধর্মপ্রচার না করিলে মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ সর্বত্রই আর্য সভা সমূহ ব্রাহ্ম সমাজকে অতিক্রম করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবে।"[১৬] তদুপরি সমকালীন ইংরেজী শিক্ষিত মহলে শশধরের কদরও বেড়ে যায়। এই ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্র চন্দ্র বোস, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শুধু তাই নয়, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।[১৭] শশধরের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার। বঙ্কিমের মাধ্যমেই ইংরেজী শিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।[১৮] শশধর অনুরাগীদের অনেকে এমন কথাও বলেন যে, বঙ্কিম নাকি তাঁর ধর্মীয় আদর্শ গঠনে শশধর কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৯] কথাটা কতদূর সত্য বলা শক্ত, কিন্তু এই গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত বঙ্কিমের সখ্যতা স্থায়ী হয়েছিল খুব অল্প সময়ের জন্যই। বঙ্কিম সম্পাদিত 'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যায় (১৮৮৪) বঙ্কিম তাঁর ধর্মীয় মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে যে পাদটীকা ব্যবহার করেছেন, তা থেকে স্পষ্ট যে শশধরের ধর্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে বঙ্কিমের মতের আদৌ মিল ছিল না। বঙ্কিম এ আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন যে, শশধরের ব্যাখ্যায় কোন স্থায়ী ফল না থাকাই স্বাভাবিক।[২০] বঙ্কিমের এই আশঙ্কা সত্য হয়েছিল। আমরা জানি শশধর প্রণীত 'ধর্মব্যাখ্যা'র প্রথম খণ্ড ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয় কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ড কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি।

শশধরের জীবনের আরো দুটি ঘটনা আমরা উল্লেখ করব। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদ অনুবাদকালে একটি সাময়িক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌দের সমর্থনে বলেন যে, ভারতীয় আদিম সাহিত্য মানুষেরই কীর্তি এবং তাতে সভ্যতার আদিপর্বের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধ

শশধরের গোঁড়া বিবেকে আঘাত হানে এবং তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে লেখনী ধারন করেন। কিন্তু শশধরের লেখা প্রচারিত হওয়ার পর রমেশচন্দ্রের কোনরূপ প্ররোচনা ছাড়াই শশধর যখন সংস্কৃত কলেজে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন বেশ কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল ছাত্র শশধরকে লাঞ্ছিত করেন। এই ঘটনার পর শশধরের ধর্মীয় উত্তেজনা কমে যায় এবং তাঁর আন্দোলন মন্দীভূত হতে শুরু করে। শশধরের জীবনের আর একটি প্রধান ঘটনা সহবাস সম্মতি আইন (Age of Consent Act, 1891) এর বিরুদ্ধে তাঁর দেশজোড়া আন্দোলন। কিন্তু সেই আন্দোলন তাঁর স্বপক্ষে দেশে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি, বরং তাঁর আন্দোলনের ক্রটির দিকটাই প্রকট হয়ে ওঠে। শশধর আরো অনেক বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু এই সময় থেকে জনজীবনে তাঁর প্রভাব ক্ষীয়মান হয়ে আসে।

এখন প্রশ্ন ওঠে শশধরের ধর্মব্যাখ্যা পদ্ধতির কোন্ অভিনবত্বের জন্য অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও তিনি ইংরেজী শিক্ষিত মহলে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন? শশধরের কোন এক শিষ্য তাঁর পদ্ধতিকে হিন্দু ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। শশধরের এই অনুরাগী বঙ্কিম কর্তৃক শশধরের পদ্ধতির সমালোচনাকে ক্রটিপূর্ণ মনে করেছেন, কারণ তাঁর মতে বঙ্কিম নিজেই শশধরের পদ্ধতি অনুকরণ করে ধর্ম ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমরা যথাস্থানে বঙ্কিমের পদ্ধতির আলোচনা করব। কিন্তু শশধর সম্পর্কে একথা বলা প্রাসঙ্গিক যে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। আমরা বড়োজোর বলতে পারি শশধর যুক্তিবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন; বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর পদ্ধতি ছিল ভুল যুক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু শশধরের অনুরাগীদের মনে হোত যে তিনি অলৌকিক আবেদন না-করে যুক্তি দিয়েই সনাতন হিন্দুধর্মের আচার পদ্ধতির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন; যেমন তিনি স্বাস্থ্যের অনুরোধেই একাদশীকে সমর্থন করতেন। কিন্তু যে কারণে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুরাও তাঁর অনুরাগী হয়েছিলেন, তার কারণ হল, ধর্মকে তিনি মানবতাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যেমন, তিনি বলতেন, জলের ধর্ম হল তরলতা, আগুনের ধর্ম হল দহন করা, তেমনি মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। মনে হয় শশধরের এই মানবিক আবেদনই যুক্তিবাদী বঙ্কিমকে তাঁর কাছে টেনে এনেছিল।

কৃষ্ণপ্রসন্ন যেমন তাঁর অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতায় রামায়ণের যুগের হিন্দুদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা দেখাতে চেয়েছিলেন, তেমনি শশধরও পতঞ্জলী সূত্রের মধ্যে ডারউইন তত্ত্বের আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। স্পষ্টতঃই এই মনোভাব উগ্র স্বাদেশীকতার পরিচায়ক। কিন্তু শশধর তাঁর যুক্তিকে এমনভাবে খাড়া করতেন, মনে হোত তাঁর বক্তব্য যুক্তির উপর নির্ভরশীল। শশধরের

ভুলযুক্তির একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন পূর্ণ মানুষ একমাত্র ভারতবর্ষেই জন্মায়। তাঁর এই বক্তব্য প্রতিপন্ন করতে তিনি ভৌগোলিক যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাহ্য প্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির ধাত্রী। স্থানীয় জলবায়ু তাপাদির বিশেষ বিশেষ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি সংগঠন করে দেয়। জাতির আকৃতিগত বিভিন্নতা, ভাবগত বিভিন্নতা এসব কিছুই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন প্রকৃতি সম্ভূত, এটা স্বভাবসিদ্ধ ও অনিবার্য। আফ্রিকাতে যেমন ফুটফুটে গৌরবর্ণ একটি মানুষ জন্মান কঠিন, পৃথিবীর উত্তর-খণ্ডে তেমনি একজন কৃষ্ণকায় মানুষ জন্মানও অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের বিচিত্র বিহারভূমি ভারতবর্ষে সেরূপ দেখা যায় না। অন্যান্য দেশের কোথাও কেবল কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও বা কেবল গৌরবর্ণ, কপিলবর্ণ আদির মেলা বসেছে, কিন্তু ভারতে কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, অতি গৌরবর্ণ অথবা পৃথিবীর কোষে যত বর্ণমালা আছে, সব বর্ণেরই ঢেউ খেলে ভারত মহিমাকে অবর্ণনীয় করে তুলেছে। ভারত যেমন সৃষ্টি বৈচিত্র্যের পূর্ণ লীলাভূমি, এমন আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় দেখতে পাওয়া যায় না। আবার ভারতের বিচিত্র প্রকৃতিতে সব ঋতুই—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত সখ্যভাবে সকলে হাত ধরাধরি করে নিয়ম করে যথাসময়ে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। এ দেশ সকল দেশের আদর্শভূমি, ইউরোপের কোন দেশে এমন ঋতু বৈচিত্র্য নেই। এমন অবস্থায় ঐ দেশে পূর্ণ মানুষ জন্মান কিভাবে সম্ভব ?

তিনি আরও বলেছেন, ঋতু বৈচিত্র্য মানব প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত করে ভারতের মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে, অন্য কোন দেশের মানুষের পক্ষে ঋতু বৈচিত্র্যের অভাবের ফলে তা সম্ভব নয়। শশধর এখানেই থেমে যান নি, তিনি আরও বলেছেন, ভারতের প্রকৃতি প্রথম থেকেই ভারতে মহাকবি, ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানবিজ্ঞানবেত্তা, যোগী ও মননশীল মহাপুরুষদেরকে প্রসব করেছে। সকল বিষয়েরই আদিম তত্ত্বের মূল বীজ ভারতেই বিস্ফুরিত হয়েছে। ভারতবাসীই আদিম মানুষ, আদিম শিক্ষিত, আদিম সভ্য, আদিম কবি, আদিম বিজ্ঞানবৎ, আদিম ধার্মিক, আদিম জ্ঞানী, আদিম যোগী, আদিম মননশীল এবং আদিম ভগবৎ ভক্ত। আদিম শাস্ত্র, আদিম ভাষা ভারত-বর্ষেই প্রথম সুপ্রচারিত হয়।

তবু হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী রক্ষার আন্দোলনে শশধর গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থনও সবসময় লাভ করতে পারেন নি। কালীবর বেদান্তবাগীশ গোঁড়া হিন্দুপন্থী পণ্ডিত হয়েও শশধরের যুক্তি ও পদ্ধতিকে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি শশধরের ধর্মব্যাখ্যার অসাধারণ প্রমাণ করতে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় শশধরের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা বা একাদশীর বিশ্লেষণ সবকিছুই তিনি নস্যাৎ

করেছেন। তবুও বলতে হয়, কালীবর বেদান্ত বাগীশের পুস্তিকায় পাণ্ডিত্য থাকলেও যুগের যুক্তিবাদী মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৭০-এর দশকের বাংলার ধর্মীয় চেতনার দুটি পরিষ্কার বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। প্রথমত, একটি আধ্যাত্মিক অস্থিরতা যা যুগের কতিপয় মননশীল ব্যক্তিকেও গ্রাস করে। গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রতি অসন্তোষের সূত্র ধরে তার উদ্ভব ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা ব্রাহ্মদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি কেশবচন্দ্র সেনের মত ধর্ম অন্বেষকও ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাই সত্তর দশকের শেষে ধর্ম অনুসন্ধিৎসুদের কাছে সমাজ সংস্কারের প্রশ্নটি গৌণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর অনুগামীগণ। তাঁদের কর্মপন্থা ছিল উৎকট স্বাদেশীকতায় পূর্ণ। একটা ভ্রান্ত ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক আচরণে এই আন্দোলন আবৃত ছিল। এমন কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেও হিন্দুদের পরিচিত বলে দাবী করা হোত।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর্য সমাজ ও থিওসফিস্টরা সেই সময়ের ধর্মীয় বায়ুপ্রবাহের মুখে ছিল একখণ্ড খড়ের মতোই। কিন্তু পশ্চিমভারতে, যেখানে আর্যসমাজের রীতিমত প্রভাব ছিল, বাংলায় সেখানে তার প্রভাব ছিল নগণ্য। থিওসফি বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে শুধু স্বল্প সময়ের জন্যই আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাঙলার নব্যহিন্দু জাগরণে এদের প্রভাব ছিল নামমাত্র।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. Preface to the translation of an Abridgement of the Vedant, 1816, English Works, Vol. 1.
২. Letter to James Silk--Buckingham 1818.
৩. হিন্দু কলেজের মাধ্যমে পশ্চিমী যুক্তিবাদ এদেশে প্রসার লাভ করে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধানে তা ছিল অপারগ, ফলে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বেদনা ও অস্থিরতা তীব্র হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে স্পষ্টরূপেই এই 'আত্মিক মোক্ষলাভের' অন্বেষা প্রধান জায়গা নিয়েছে।
৪. Upadhyaya Gour Gobinda Roy : *Acharya Keshub Chandra:* Keshub Centenary, Allahabad Series, p. 400.
৫. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, চতুর্থ অধ্যায়।
৬. Upadhyaya Gour Gobinda Roy : *Acharya Keshub Chandra* : Keshub Centenary, Allahabad Series, p. 400.
৭. কেশবচন্দ্র সেন : জীবনবেদ : 'ভক্তির প্রবহন', সপ্তম অধ্যায়।
৮. শ্রীরামকৃষ্ণ একটা উপমা দিয়েছিলেন। তিনি ধর্মাকাঙ্খীকে গাঁজাভাঙের নেশাগ্রস্তের সঙ্গে তুলনা করতেন।

৯. 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় ২৮শে মার্চ ১৮৭৫ তারিখে কেশবচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, (Life and works of Brahmananda Keshub গ্রন্থে ডঃ প্রেম সুন্দর বসু উদ্ধৃতি দিয়েছেন) "We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being as gentle, tender and contemplative as the latter is sturdy masculine and Polemical". "Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these."

১০. স্যার হেনরি মেইন বলেছেন ব্রাহ্মদের মতাদর্শের কোন স্থিরতা ছিল না। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে। P. C. Majumdar: Life and Teachings of Keshub Chandra Sen, p. 157.

১১. সোফিয়া ডবসন্ কলেট্ (Sophia Dobson Collet)-কে লেখা পত্রে (মে ৩১, ১৮৮১) রাজনারায়ণ বোস কেশবচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন এইভাবে : 'Keshub Baboo prides himself on his New Dispensation. There is not however, the least originality in the idea as the name implies. The New Dispensation consists in merely jumbling up the doctrines and dogmas, the forms and ceremonies of different religions explaining the fancied alegorical meaning contained in those doctrines and worshipping saints and great men. The idea is not a new one in our country.

১২. Pal, Bipin Chandra: Saint Bijoy Krishna Goswami, First edition, Calcutta, p. 23.

১৩. Pal, Bipin Chandra: Saint Bijoy Krishna Goswami, First edition, Calcutta.

১৪. পরিব্রাজকের বক্তৃতা। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর বক্তৃতাবলী।

১৫. 'সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা' ইত্যাদি।

১৬. পরিব্রাজকের পত্রিকায় উদ্ধৃত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৬ শকাব্দে (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

১৭. শ্রীমঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম খণ্ড, উনবিংশ অধ্যায়।

১৮. নবীনচন্দ্র সেনঃ আমার জীবন।

১৯. ব্রাহ্ম সমাজঃ ফাল্গুন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ; পঞ্চানন তর্করত্নের প্রবন্ধ।

২০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ 'হিন্দুধর্ম'; প্রচার।

২

দিব্য-দর্শনের জন্ম

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা দেশে ধর্মজিজ্ঞাসার একটি ধারা প্রকাশ পেয়েছিল আধ্যাত্মিক অস্থিরতায় ও ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের অন্বেষায়। একই সময়ে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অনুসন্ধানের প্রতিও শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। নব্যহিন্দু আন্দোলন এই যৌথ অন্বেষার ফলশ্রুতি। এই অধ্যায়ে আমরা জনমানসে সুপ্রাচীন ভারতের গৌরবময় সভ্যতা অনুসন্ধানের প্রভাব আলোচনা করব।

ভারতের সভ্যতা : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত

ভারতের উপর পশ্চিমের প্রভাব ছিল মৌলিক। হিন্দু মানসিকতার উপর ধর্মীয় বিশ্বাসের বিজয়লাভের দ্বন্দ্বের চেয়ে বরং তা ছিল সভ্যতারই সংঘর্ষ। এ-কথা সত্য যে, পাশ্চাত্যের প্রভাবের ফলে হিন্দু মানসিকতায় যে আত্মসমালোচনার ঝড় ওঠে তা তাঁদের নিজের ধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি গভীরভাবে সচেতন করে তোলে। এই সচেতনতাই রামমোহনকে ধর্মীয় সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু সভ্যতার সংঘর্ষের একটি গভীরতর দিকও ছিল। এটি সভ্যতাকে সংস্কারেরও প্রশ্ন তোলে, এবং যেখানে সভ্যতা সংস্কারের প্রশ্ন, শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের কাছে যদি তা আদৌ চিন্তনীয় হয়ে থাকে তাহলে তার একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল মেকলের বিখ্যাত পরিকল্পনায়—অর্থাৎ ভারতীয় মাটিতে একটি নতুন বৃক্ষরোপণ, দেশীয় মাটিতে মৃতপ্রায় বৃক্ষে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষন নয়। অবশ্য মেকলের পূর্বে একদল প্রাচ্যবিদ্ ভারতীয় সভ্যতার অনুকূলে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, যেমন উইলিয়ম জোন্স এবং এইচ. টি. কোলব্রুক। কিন্তু ভারতীয়রা এঁদের গবেষণায় বস্তুত প্রভাবিত হননি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই ভারত সম্পর্কে ইউরোপীয়গণ আলোচনা শুরু

করেন। হিন্দু ধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা দুটি পথে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রথমত ব্রিটিশ সরকারের ধারণার ভিত্তি ছিল তিনটি ব্রিটিশ রাজনৈতিক মতাদর্শ—উপযোগবাদ, খ্রীষ্টীয় প্রচারবাদ এবং হুইগ উদার-পন্থাবাদ। এই সবগুলিই ছিল হিন্দু বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিরুদ্ধবাদী এবং এদের অনুসরণকারীগণ হিন্দু বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে বন্ধ্যা ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করতেন।

উপযোগবাদীদের মতে প্রাচীন হিন্দু রাজনীতি ছিল বর্বর সভ্যতার প্রতিরূপ। চার্লস গ্রাণ্ট, পেরী এবং উইলবার ফোর্সের মতো প্রধান প্রধান ধর্মপ্রচারকদের রচনায় ভারতীয় সভ্যতা উপস্থাপিত হয়েছিল সভ্যতা বিবর্জিত বলে, হিন্দু ধর্ম ছিল অধঃপতিত, যার মূল পর্যন্ত পচে গেছে এবং যা সংস্কারেরও অযোগ্য। হুইগ উদারনীতিবাদও বস্তুতঃ একই পথে পরিচালিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয়লাভের আগ্রহাতিশয্যে মেকলে মন্তব্য করেছেন : ভারত ও আরবের সমগ্র সাহিত্য রচনাবলীর চেয়েও ইউরোপের একটি ভাল গ্রন্থাগারের একটি তাক বেশী মূল্যবান। সুতরাং মেকলের নিজস্ব প্রস্তাব ছিল ভারতীয়দের উচিত সম্পূর্ণরূপে ইংরেজী সংস্কৃতিতে আত্মবিলোপ করা; প্রগতির পথে অগ্রসর হওযার এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

দ্বিতীয় ধারণার অনুসরণকারী ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্‌দের মতে ভারতের স্বর্ণযুগ রয়েছে অতীত সংস্কৃতিতে, বিশ্ব ইতিহাসের অজ্ঞাত যুগে। এই শ্রেণীর প্রাচ্যবিদ্‌রা দুটি পথে ভারতবিদ্যা অধ্যয়নে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা, হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসের ভাণ্ডার বিবেচিত হওয়ায় তাঁরা প্রথমে সংস্কৃত চর্চা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন। দ্বিতীয়ত নতুনভাবে হিন্দু ইতিহাস রচনায় তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন।

প্রথমদিকে কোম্পানীর কর্মচারীরা—যেমন আলেকজাণ্ডার ডও (Dow) এবং জে. জেড হলওয়েল বিচ্ছিন্নভাবে ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ভারতীয় সভ্যতার বুদ্ধিদীপ্ত মূল্যায়ন করেছিলেন; কিন্তু এসব মূল্যায়ন ছিল বিচ্ছিন্ন, যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ সেখানে ছিল না। ওয়ারেন হেষ্টিংসই প্রথম শাসক যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের চিন্তাধারার সমন্বয়ে এমন একটি সাংস্কৃতিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন যা প্রাচ্যবিদ্যা আন্দোলনকে প্রকৃতই সহায়তা করেছিল। আগ্রহের এই পুষ্টির ফলেই এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইন্দো-ইউরোপীয়ান জনগোষ্ঠীর ভাষার একটি সাধারণ উৎস আবিষ্কার করে উইলিয়ম জোন্‌স একটি মহান কার্য সমাধা করেন। তিনি সংস্কৃতের সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের যোগ-সূত্র স্থাপন করেন এবং উল্লেখ করেন যে, সংস্কৃত অন্যান্য ভাষার উৎস। জোন্‌স বলেন : "সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই-ই হোক, এর গঠন বিস্ময়কর,

এটি গ্রীক ভাষার চেয়েও নিখুঁত, ল্যাটিন ভাষার চেয়েও এর প্রাচুর্যতা এবং উভয়ভাষার চেয়ে আরো সুন্দরভাবে পরিশীলিত···। ধারণা করার এমন যুক্তি আছে, যদিও তা শক্তিশালী নয়, যে গথিক এবং কেল্টিক· ·ভাষার ও সংস্কৃতের উৎস একই। এবং পুরোনো পারসী ভাষাও এই একই পরিবারভুক্ত।"[১]

প্রাচ্যবিদ্‌গণ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদেও আকৃষ্ট হন। উইল্‌কিন্‌স ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভগবতগীতা'র ইংরেজী অনুবাদ করেন, 'হিতোপদেশ' ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদ করেন ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। জোন্‌স অনুবাদ করেন 'শকুন্তলা' (১৭৮৯), 'গীতগোবিন্দ' (১৭৮৯), 'মনুসংহিতা' (১৭৯৪), 'হিতোপদেশ' (তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ঋতুসংহার' সম্পাদনা করেন। জাষ্টিনিয়ান কোডের অনুকরণে জোন্‌স হিন্দু ও মুসলমান আইনের একটি সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা করেন, এই পরিকল্পনায় লর্ড কর্ণওয়ালিসের অনুমোদনও ছিল, কিন্তু জোন্‌সের জীবিতাবস্থায় তা প্রকাশ হয় নি। উইল্‌কিন্‌স এবং জোন্‌সের ইচ্ছাকে পরবর্তীকালে রূপ দিতে থাকেন যথাক্রমে থমাস কোলব্রুক এবং ডঃ হোরেস হেমান উইলসন। জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের হিন্দু আইনের উপর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিবদভঙ্গার্ণবের' অনুবাদ করেন কোলব্রুক। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ' প্রকাশ করেন। উইলসন 'মেঘদূত' অনুবাদ করেন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান সংকলন করেন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এছাড়াও কয়েকজন পণ্ডিতের সহযোগিতায় উইলসন আঠারোটি অন্যতম 'পুরাণে'র ইংরেজী অনুবাদ করেন।

একই সঙ্গে এই প্রাচ্যবিদ্‌গণ ভারতবিদ্যারও চর্চা শুরু করেন। জোন্‌স[২] মনে করতেন প্রাচীনকালের হিন্দুরা ছিলেন অত্যন্ত উন্নত, উদ্ভাবনী প্রতিভায় অন্যতম। হিন্দুদের সম্পর্কে আলোচনায় জোন্‌স অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই বলেছেন, "বর্ত্তমানে হিন্দুদেরকে যতই অধঃপতিত ও হীন বলে দেখা যাক না কেন, প্রাচীনকালে তাঁদের সাহিত্য ছিল অতি উৎকৃষ্ট, তাঁদের সরকার ছিলেন সুখদায়ী, তাঁদের আইন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং অন্যান্য বিষয়েও তারা ছিলেন পণ্ডিত।"[৩] প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার চারটি বিষয় উল্লেখে তিনি তাঁর মন্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন, সেই চারটি বিষয় হল,—প্রাচীন ভারতের ভাষা, হিন্দু দর্শন ও ধর্ম, মূর্তি ও স্থাপত্য এবং বিজ্ঞান ও কলা সম্পর্কে স্মৃতিকথার বিবরণী। কিন্তু জোন্‌সের আক্ষেপ এই যে, হিন্দুদের নাগরিক ও সামাজিক ইতিহাস রূপকথার ফানুসে মোড়া; তাছাড়া আজকের হিন্দুরা প্রাচীনকালের হিন্দুদের থেকেও ভিন্নতর।

প্রাচীন ভারত সম্পর্কে জোন্‌সের বিশ্লেষণ আরো পুষ্ট হয়েছিল পরবর্তীকালে এইচ. টি. কোলব্রুকের গবেষণায়। কোলব্রুকের গবেষণার ক্ষেত্র ছিল বৈদিক যুগ; একেশ্বরবাদ ও বিধবা-বিবাহ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলো তারই আবিষ্কার। তিনি

ইন্দো-আর্যযুগকে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে হিন্দুধর্মের অধোগতির কারণ আধুনিক যুগের হিন্দুগণ কর্তৃক শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা।

কোলব্রুকের উত্তরাধিকারী এইচ. এইচ. উইল্‌সন্‌, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রামকমল সেনের সহযোগিতায় পুরাণাদির বিশ্লেষণ করেন। উইল্‌সনের গবেষণার ক্ষেত্র ছিল বৈদিকোত্তর যুগের ভারতের ইতিহাস। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসবের ভাণ্ডার হয়ে ওঠে। তিনি নবীন ইংরেজ প্রাচ্যবিদ্‌দেরকে অনার্য ও অ-বৈদিক সংস্কৃতি অধ্যয়ন করতে এবং প্রাক্‌-মধ্যযুগে হিন্দুদের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা করতে উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে লিপি ও লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করে নেপাল, উড়িষ্যা, রাজপুতানা এবং কাশ্মীরের ইতিহাস লেখা হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম ভারতে এলে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকর্ম পুরোদমে শুরু হয়। এর ছ'বছর পরে এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক জেমস্‌ প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করেন; ফলে অশোকের অনুশাসনাবলীর অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়।

সম্ভবতঃ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে গবেষণায় সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল ম্যাক্স-মূলারের ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ ছাড়াও বৈদিক যুগ সম্পর্কে ম্যাক্স-মূলারের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে, জোন্‌স, কোলব্রুক, উইল্‌সন্‌, প্রিন্সেপ এবং ম্যাক্স-মূলারের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মিল, গ্রাণ্ট বা মেকলের রচনায় অতীতে ভারতের যে বিষাদময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা মোটেই সত্য নয়। বরং ভারতের প্রাচীন যুগ, গ্রীসের প্রাচীন যুগের সঙ্গে তুলনীয়, এমনকি সমসাময়িক ইউরোপের সঙ্গেও।

এখন প্রশ্ন হল, ভারতীয়দের উপর এইসব আবিষ্কার কিরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এর উত্তরে বলা যায়, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা ছিল ইউরোপীয়গণেরই বিচার্য বিষয়, ভারতীয়গণ এতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এ-রকম উত্তর নিশ্চয়ই সর্বৈব যথাযথ নয়। কারণ রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রামকমল সেন, রাজা রাধাকান্তদেব এবং তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখেরা তাঁদের সংস্কারের কাজে প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানকে যথেষ্টভাবে ব্যবহার করেছিলেন। ডেভিড কফ্‌ দাবী করেছেন যে, রামমোহন তাঁর বৈদান্তিক একেশ্বরবাদকে যে ভারতের স্বর্ণযুগের ধর্ম মনে করতেন তাতে জোন্‌স এবং কোলব্রুকের প্রভাব ছিল। কিন্তু এই মন্তব্য যথাযথ নয়। বস্তুতঃ প্রথমযুগের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেই বেশী মগ্ন ছিলেন। তাঁরা প্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরবজনক ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন

ছিলেন। যেকলের যুক্তিপথে চালিত ডিরোজিয়ানরা ভারতের সমস্ত কিছুকেই ঘৃণা করতেন। এমন কি বিদ্যাসাগরও তার সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন ইংরেজী পাঠ্য পুস্তকের অনুবাদ করে। অতএব, এই সমস্ত বিবেচনা করে এই কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, ভারতীয়দের কাছে প্রাচ্যবিদ্যার গুরুত্ব প্রায় ছিলই না।

প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের আগ্রহ বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এবং এই শ্রেণী হিন্দু ঐতিহ্যকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। অবশ্য একথা সত্যি যে, কেবলমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে গবেষণায় অগ্রাধিকার ছিল, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে প্রাচীন ভারতের প্রতি ভালোবাসা জাগানো সহজ কাজ ছিল না। ঠাকুর পরিবারের ব্রাহ্মরাই ছিলেন একমাত্র প্রাচীন গৌরবের ধারক ও বাহক। কেশবচন্দ্র সেন ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ছিল পাশ্চাত্যের অনুগামী।

ঠাকুর পরিবারকে বাদ দিলে, ব্রাহ্ম সমাজের মনোভাবের একটি সাধারণ চিত্র আমরা দেখতে পাব শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে, যেখানে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং 'ঋগ্বেদ সংহিতার' অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্তর মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিদের অনুল্লেখ করেছেন। বাঙলার নবজাগরণ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য, শিবনাথের মূল উদ্দেশ্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত বাঙালীদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী-চিত্র রচনা করা এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও স্বল্পখ্যাত ব্যবহারজীবিকেও এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন, কিন্তু ভারতীয় কিংবা পাশ্চাত্য কোন প্রাচ্যবিদের উল্লেখ করেন নি; যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার মেধার ইতিহাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যারিষ্টার কৃষ্ণমোহন ঘোষের চেয়েও বড় মাপের মানুষ ছিলেন। এঁদের অনুল্লেখ থেকে এটিই প্রমাণিত হয় যে, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ব্রাহ্মনেতাও প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি বিরূপ মনোভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রাচ্যবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার ভারতবিদ্যা সম্পর্কিত রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন। বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ আরম্ভ করেন এবং 'শকুন্তলা'র মতো কাহিনীকে তাঁর নিজস্ব সৌষ্ঠবপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করে সংস্কৃতকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মহাভারতের অনুবাদ করেন কালিপ্রসন্ন সিংহ। এছাড়া সংস্কৃত গ্রন্থের প্রকাশ ও অনুবাদ হতে থাকে। এভাবে একটি নতুন পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধা নিয়ে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ফিরে তাকাতে উদ্বুদ্ধ হন।

ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এই নতুন উৎসাহ কেবলমাত্র ভারতের অতীত সভ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগের ভারতেও অভিযান শুরু করেছিলেন। রাজপুত কাহিনী ও মারাঠা বীরত্ব ইংরেজী-শিক্ষিত জনসাধারণকে উদ্দীপিত করে তোলে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে টডের রচনা 'Annals and antiquities of Rajasthan' কালজয়ী ও জনপ্রিয় গ্রন্থ হয়ে ওঠে। সত্তরের দর্শকের শুরু থেকেই বাঙালী হিন্দুদের কাছে ভারতের একটি ঐতিহাসিক ছবি ফুটে উঠতে শুরু করে, কল্পনার সেই ছবি ছিল একটা মহান ভারতের, যে ভারত ছিল যুদ্ধ এবং শান্তিতে, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানে, ধর্ম ও অনন্য নিরপেক্ষ সভ্যতায়, সংক্ষেপে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের 'সবরকম সৃষ্টিশীলতায়' শ্রেষ্ঠতম।

দিব্য-দর্শন

প্রাচ্যবিদ্‌গণের আলোচনা এবং মধ্যযুগের ইতিহাসের গবেষণা থেকে প্রাচীন ভারতের যে রূপটি ফুটে ওঠে সেটি সামগ্রিক ছিল কি না এটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। আরো বিতর্কিত প্রশ্ন এই যে, ১৮৭০-এর দশক থেকে ভারতীয়গণ ভারতের যে গৌরবময় অতীতের কথা বলে আসছিলেন তা প্রকৃত গৌরবময় ছিল কি না। এই কারণে আমরা এই পরিচ্ছদের নাম দিয়েছি 'দিব্য-দর্শন'। ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌গণ কেবলমাত্র ভারত-দর্শনের ভূমিকাটুকু করেছিলেন। ভূদেব বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো চিন্তাবিদ্ যে দিব্য-দর্শন উপস্থাপিত করেছিলেন, তা প্রাচ্যবিদ্‌দের গবেষণালব্ধ চিন্তার আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মাত্র নয়। এই দিব্য-দর্শন খাঁটি ছিল এই অর্থে যে, এটি নতুন প্রজন্মের মানসিকতা আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল। ১৮৭০ থেকে ১৯২০ এই দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী জুড়ে বাংলার শিক্ষিত হিন্দুগণ প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার এক অপূর্ব চমৎকারিত্বে অভিভূত হয়ে পড়ে, এবং সেই প্রাচীন সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ উল্লেখ করা অতিরঞ্জন হবে না যে, অন্ততঃ কিছুটা সময় বাঙালীরা বাইবেলে উল্লেখিত ইস্রায়েলের সন্তানদের মতো গেয়ে উঠেছিলেন, "I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your old men shall see vision, and your young men shall dream dreams."

প্রকৃতপক্ষে বাঙালীরাও সেই অর্ধশতাব্দী ধরে ভবিষ্যতবাণী করেছে, বৃদ্ধদের ছিল নতুন দৃষ্টি, আর যুবকরাও দেখেছে স্বপ্ন। কবি গেয়েছেন,

"বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে

নব-দিন মণি উদিবে আবার
পুরাতন এ পূরবে।"[৪]

মাতৃভূমির গৌরবের এমন এক বিশেষত্বে কবি শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিলেন যে এই গৌরব অন্য কোন জাতির ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ হয়নি,

"সেথা আমি কী গাহিব গান ?
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান" ?[৫]

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে যদি বাঙলায় এই চেতনা কেবলমাত্র দিব্য-দর্শনও হয়, প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃত পুনরাবিষ্কার সেখানে নাও থাকে, তবু অর্ধ-শতাব্দী জুড়ে বাঙালী মানসকে আচ্ছন্ন করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালীই ছিল এই দিব্য-দর্শন। এই দিব্য-দর্শনের জন্ম হয়েছিল ভূদেব ও বঙ্কিমের চিন্তা-প্রবাহ থেকে।

ভূদেবের দিব্য-দর্শন

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'স্বপ্ন লব্ধ ভারতের ইতিহাস' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।[৬] তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের কাল্পনিক বিজয় ও তৎ-পরবর্তী ভারত ইতিহাসের গতি সম্পর্কে বর্ণনা করা ছিল এই রচনার বিষয় বস্তু। মারাঠাদের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ভূদেবের ধারণা অবাস্তব সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের কার্যাবলীর বিবরণ ভূদেব যেভাবে দিয়েছেন সেভাবে না ঘটলেও ভূদেব সেভাবে ঘটানোর জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন। ভূদেবের আঁকা ছবি নিঃসন্দেহে, ভাববাদী; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় পূর্ণ উনবিংশ শতাব্দীর একজন ঐতিহ্যবাদী হিন্দুর ভাবনা রাজ্যে হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের দর্শন বস্তুতঃ ভাববাদকেই সমর্থন করে।

দশটি অধ্যায়ে ভূদেব একটা উদীয়মান সভ্যতার খসড়া-চিত্র এঁকেছেন। শিবাজীর উত্তরপুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু রাজ্য হয়ে উঠেছে রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চরম ও শ্রেষ্ঠ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সেখানে রয়েছে কঠোর ধর্ম নিরপেক্ষনীতি। চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীভূত সার্বভৌম রাজতন্ত্র, অথচ বিভিন্ন বিষয়ে বিকেন্দ্রীকরণের উদার সুযোগ এতে রয়েছে, বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে স্বায়ত্বশাসিত গ্রাম সমাজ সম্পর্কে। এই নতুন যুগে সৃষ্টির আগ্রহে হিন্দুরা সমুদ্রপাড়ি দিচ্ছেন, যথেচ্ছাচার নয়, কেবলমাত্র সুস্থ সবল ও মেধাসম্পন্ন যুবকেরাই সমুদ্র সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে যাত্রা করছেন তাঁদের মাতৃভূমির সেবায় জ্ঞান ও কৌশল উৎসর্গ করার জন্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা করে তাঁরা নিজেদের দেশে প্রচার করছেন। এই নতুন যুগে হয়েছে একটা খাঁটি

হিন্দু নবজাগরণ (renaissance)—এই জাগরণ কেবলমাত্র অতীতের জ্ঞানে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির সমস্ত রকম বিষয়ে প্রস্ফুটিত হওয়া। কনৌজ ও বারাণসী জ্ঞান চর্চার দুটি প্রধান কেন্দ্রস্থান হয়ে উঠেছে—কনৌজে যেখানে প্রাচীন জ্ঞানের আলোচনা, বারাণসী সেখানে আধুনিক জ্ঞানের। কনৌজে কালজয়ী ভাষাগুলির মধ্যে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ও আরবীর চর্চা হয়, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এবং সংস্কৃত পণ্ডিতেরা নিমগ্ন হন ভারত পুনরুত্থান নিয়ে মহাকাব্য লেখায়। আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালিত হয় বারাণসীতে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে আশ্চর্য আবিষ্কার পরিলক্ষিত হয়, পদার্থ বিদ্যায় অদ্ভুত উন্নতি হয়, যুদ্ধবিদ্যাতেও বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়। তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। বিদেশী পর্যটকদের দিয়েও ভূদেব এই নব্য ভারতের প্রচুর প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন।

ভূদেবের রচনার গুরুত্ব এই যে, এ ধরণের রচনা এই প্রথম। এখানে আমরা দেখতে পাই কঠোরভাবে হিন্দু সমাজ নিয়ে গঠিত একটা সভ্যতার বিকশিত হওয়ার পর্যায় বর্ণনা। পুরোনো বৈদিক যুগে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্খা এখানে নেই, নেই রামরাজ্যের ছায়া। ভূদেব বর্ণভেদ বা বাল্যবিবাহের নিন্দা করেন নি কিংবা বিধবা বিবাহের কথাও বলেন নি। এমন কি তিনি আনন্দোচ্ছলে সমুদ্রযাত্রাও সমর্থন করেন নি। সংক্ষেপে ভূদেবের দিব্য-দর্শনে এমন কিছু ছিল না যাতে গোঁড়া হিন্দুধর্মের প্রচারকও প্রতিবাদ করতে পারেন।

এসবই আংশিক দৃষ্টিপাত মাত্র। আরো গভীরে তাকালে দেখা যাবে যে, ভূদেব ছিলেন প্রকৃতই দার্শনিক. তাঁর হিন্দু পুর্ণজাগরণ ধারণার তিনটি বৈশিষ্ট্যই তা প্রমাণ করে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হল : হিন্দু সাহিত্যের নবজাগরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা, হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের প্রসার সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা। এই সমস্ত ধারণাগুলো রূপালী ধারার মতো ভূদেবের যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং তাঁর রচনাটিকেও গোঁড়ামি থেকে যুগপোযোগী মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

মাসিক 'বঙ্গদর্শনে'র সূচনা হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে; ১৮৭২ (এপ্রিল-মে) থেকে ১৮৭৬ (মার্চ-এপ্রিল) পর্যন্ত এর সম্পাদনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গদর্শন খাঁটি সাহিত্য কিংবা ধারণা (idea)-মূলক পত্রিকা ছিল না, জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত কিছুর সমাহারই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। প্রথম সংখ্যা থেকেই এই পত্রিকায় হিন্দু সভ্যতা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যেগুলো লেখেন নি সেগুলোতেও তাঁর নির্দেশ কাজ করত; যার ফলে বঙ্কিম নির্দেশিত

পথে নতুন প্রাণের সঞ্চারে সেই রচনাগুলো প্রত্নতত্ত্বকে ছাড়িয়েও আরো শ্রেষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই[৭] হিন্দু নামের উপর যে দীর্ঘকালীন অপবাদ চালু ছিল তার অপনোদনের চেষ্টা হয়। ব্রিটিশ লেখকেরা হিন্দুদের কাপুরুষ ও ভীরু জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে আসছিলেন; এর সত্যতা কতখানি, কিংবা ব্রিটিশদের রটানো দুর্নামে হিন্দুদের শেখানো হচ্ছিল যে তাঁদের এই পরাধীনতা আকস্মিক নয় বরং ইতিহাসের নির্ধারিত পথেই এ-দাসত্ব পাওয়া গেছে, তা ছিল যতখানি অগৌরবের ততখানিই বৈচিত্রহীন। বঙ্গদর্শনের লেখক ভারততত্ত্ববিদ্‌দের উল্লেখে বলেছেন তাঁরা কেবলমাত্র অতীতের শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের কৃতিত্বের কথাই স্বীকার করেছেন, ভারতীয়দের যুদ্ধবিদ্যায় রণকুশলতার উদাহরণ পাননি এবং কাপুরুষতাই ভারতীয়দের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করে লেখক বলেছেন, হিন্দু কর্তৃক লিখিত ইতিহাসের অভাবে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে বৈরীভাবাপন্ন গ্রীক ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের ত্রুটিপূর্ণ বিবরণের উপরে। তা সত্ত্বেও ঐ ত্রুটি-পূর্ণ ও বিদ্বেষে ভরা বিবরণ যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করলে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র বেরিয়ে আসে। লেখক মুসলমানদের অভিযান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে পাঠকদের অন্যত্র আরব অভিযানের সঙ্গে ভারত অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা তুলনা করতে বলেছেন। পয়গম্বর মহম্মদের মৃত্যুর মাত্র পঁচিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যেই আরবগণ এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে; মিশর কিংবা সিরিয়া, আফ্রিকা কিংবা স্পেন, পারস্য কিংবা তুর্কীস্থান সর্বত্রই আরবীয় বাহিনী অপরাজিত ও অপ্রতিহত রূপে প্রতিভাত হয়। একটা সাধারণ বিশ্বাস ছিল এই যে, চার্লস মার্টেলের (Charles Martel) বীরত্বেই আরবীয়রা পশ্চিমে প্রতিহত হন। কিন্তু আর-বীয়দের ভারত অভিযানের ফল কি? সিন্ধু প্রদেশে আরবীয়রা সামান্য জায়গাই দখল করতে সক্ষম হয় এবং সেই জায়গাটুকুও রাজপুতরা পরে পুনরুদ্ধার করে নেয়। অপ্রতিরোধ্য আরব শক্তি হিন্দুস্থানেই বারবার পরীক্ষিত হয়েছে, প্রায় পাঁচশ বছর পর আরবীয়ান মহম্মদ বিন্ কাসিম থেকে আফগান সাহাবুদ্দিন ঘুরী পর্যন্ত বারবার মুসলমান আক্রমণের চাপে পড়েই হিন্দুর প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। তাছাড়া এই প্রতিরোধ মিলিত ভারতের প্রতিরোধ ছিল না, ছিল বিছিন্ন ও খণ্ডিত। বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডার যে ভারত থেকে নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং নিকোতোর সেলুকাসকে যে ভারতে পরাজয় বরণ করতে হয়ে-ছিল, হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালের ভারত কোন অংশেই সেরকম ছিল না। সে ভারতের বীরত্বের ছবি ভারতীয় ঐতিহাসিকরা লেখেননি, প্রবন্ধকারের সুপ্ত ইচ্ছা যে, ভাবীযুগের ভারতীয়রা নতুন করে তাদের ইতিহাস লিখবে—সে ইতিহাস

পাঠে পরাধীনতার দৈন্য কাটিয়ে নব-উন্মাদনায় ভারতবাসী সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

বঙ্গদর্শনের সূচনা এইভাবে গৌরবময় অতীতে অপরাজেয় হিন্দু শক্তির প্রতি আশ্বস্ততায়। এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সংকীর্ণতা-হীনতা। প্রথম রচনাটিতেও এর বৈশিষ্ট্য বর্তমান; হিন্দু সামরিক শৌর্যের বর্ণনা দিতে গিয়েও সাময়িক কালের অবনতির দায়িত্বে লেখক অতীতকে নিরপরাধ রাখেন নি। লেখকের মতে হিন্দুদের কখনই জাতীয় ঐক্যবোধ ছিল না এবং সাধারণ স্বাধীনতাবোধও ছিল না—এর পরিণামেই তাঁদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ব্রিটিশদের বিজয় ও পশ্চিমী শিক্ষার মাধ্যমেই হিন্দুরা এ বিষয়ে ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠছে। গৌরবময় হিন্দু অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবনমনের মূল শিরায় বঙ্গদর্শনের এই বিস্ময়কর অভিযান। আরো গভীরভাবে দেখলে, বঙ্গদর্শনকে 'নতুন জ্ঞানের' বাহকরূপে পরিচালিত করার যে উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে বঙ্গদর্শনে ভারততত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার সূত্রটি বের হয়ে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র ভারততত্ত্বকে নতুন জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে মনে করতেন; বস্তুত ভারততত্ত্ব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পরীক্ষাগার বিশেষ।

বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামের প্রখ্যাত রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বাঙলাদেশের কৃষকদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। ভারতবিদ্যা সংযোজনের অবকাশ এখানে ছিল না, তবু লেখক নতুন জ্ঞানের যুক্তিবাদী প্রাবল্যে সমসাময়িক কৃষকদের দুরাবস্থার কারণ অনুসন্ধান করেছেন অতীতের প্রেক্ষাপটে; যেখানে সভ্যতা সৃষ্টির আবশ্যক দুটি দিক শীতোষ্ণ আবহাওয়া ও ভূমির উর্বরতা বর্তমান ছিল এবং যে যে নিয়মের ফলে ভারতবর্ষে প্রথমযুগে সভ্যতার উদয় হয়েছিল, ঠিক সেই নিয়মের কারণেই এর অবনতি ঘটে। এর প্রথম কারণ ছিল শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি; শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধিরোধের উপায় হিসেবে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমজীবীরা শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যবহৃত হয়, কঠোর অস্তিত্বরক্ষার প্রতিযোগিতায় তাঁদের অবকাশ মূহূর্তকে নিঃশেষ করে মানসিক উৎকর্ষের উপায় থেকে বঞ্চিত করে ফেলা হয়। এইভাবে নিম্নশ্রেণী মানসিক উৎকর্ষ হারায়, ব্রাহ্মণ হারায় তার ধর্ম। ব্রাহ্মণরা পরিণত হলেন উপ-ধর্মের যাজকে, বিস্তৃত শাস্ত্রজাল বিস্তারে তাঁরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে জড়িয়ে ফেললেন। নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে যেন 'মক্ষিকাগণ' ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। বঞ্চকদের পরিণাম আত্মবঞ্চনা; সুতরাং ব্রাহ্মণরা নিজেদের বিছানো জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়লেন; তাদের আত্মা, তাদের বুদ্ধি স্ফূর্তি আবদ্ধ হয়ে পড়ল, পরিণত হল মরুভূমিতে।[৮] আমরা আবার এখানে দেখি হিন্দুসভ্যতার অবনতির চুলচেরা বিশ্লেষণ।

বঙ্গদর্শনের আলোচনা থেকে মনযোগী পাঠকের কাছে দুটি বৈশিষ্ট্য বের হয়ে আসে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর সার্বজনীনতা এবং অন্যান্য সভ্যতার অতীত ও বর্তমানের আলোকে পতনশীল হিন্দু-সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করার প্রবণতা থেকে হিন্দু-সভ্যতার আপেক্ষিক স্থান নির্ণয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য থেকে বঙ্গদর্শনের লেখকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে এবং এর ফলেই তাঁরা বিশেষ করে অতীতের ভারতীয় সভ্যতার গুণাগুণ বিষয়ে জোর দেন। এই বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হিসেবে আমরা বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত দুটি সংখ্যায় 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধ উল্লেখ করতে পারি। লেখকের মতে 'বাগ্মিতা'ই জাতিকে ঐতিহাসিক কর্মে লিপ্ত করে, তার মহত্বকে তুলে ধরে; বাগ্মিতার স্মরণীয় যুগেই ভারত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক ভারত বাক্-পটুহীন জাতি, একাকীত্ব ও চিন্তাশীলতার বিশেষ অনুরাগী। লেখকের মতে এই চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্যই বাঙালী চরিত্রকে কাব্যকীর্তিতে উৎসাহিত করেছে, ভাল বা মন্দ কোন সার্বজনীন কাজে চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার মতো বাক্-পটুতা তাঁদের পরিচালিত করেনি। লেখক ক্লাশিক্যাল যুগের সঙ্গে মহাকাব্যিক যুগের তুলনা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে মহাকাব্যের নায়ক ও নায়িকাদের চরিত্র[৯] ক্লাশিক্যাল সাহিত্যে আবেগপ্রবণ ও চিন্তাশীলতায় অবনমিত হয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সার্বজনীন বিশেষত্বগুলো অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদর্শনের লেখকগণ সভ্যতা সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনাও শুরু করেছিলেন। "মনুষ্যজাতির মাহাত্ম্য কীসে হয়?"[১০] প্রবন্ধ এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লেখক এ প্রবন্ধে বলেছেন, যে সব জাতি অতীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে কিংবা অল্প দিন পূর্বে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, সে সব জাতির ইতিহাসে একটা সাধারণ সূত্র বা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতাকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করেই জাতি অগ্রসর হয়! যদিও যুগ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং দেশগতভাবে এই প্রবণতা ভিন্ন ধরনের হয় তবু একটা সাধারণ প্রবণতা সেখানে থাকবেই। উদাহরণ দিয়ে লেখক এই মতটিকে বিস্তৃত করেছেন; মানবিক সমস্ত বিষয়ে গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার জলন্ত আকাঙ্খা এবং সামরিক দিকে রোমানদের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বাসনা তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে। লেখক মহম্মদের পূর্বে আরবীয়দের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের বীরত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি তীব্র আকাঙ্খা সত্ত্বেও তাঁরা কেমন ম্রিয়মান। অথচ মহম্মদের কাছ থেকে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত হয়েই তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছে।[১১] তিনি ইংলণ্ডকে উল্লেখ করেছেন, কেবলমাত্র বাণিজ্যিক নেশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুষ্টিমেয় ইংরেজ জাতি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সমুদ্রজয়ী হয়ে উঠেছে এবং বড় বড় জাতির ভাগ্য নিয়ন্তায় পরিণত হয়েছে। লেখক নিজের দেশের

কথাও বিস্মৃত হন নি। তিনি প্রাচীন ভারতের গৌরব বর্ণনা করেছেন, জ্ঞানের জন্য অদম্য আকাঙ্খায় ব্রাহ্মণদের জীবনচর্চায় যা মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং যাঁরা সেই জ্ঞান অর্জনের জন্য জীবনের সবকিছু এমনকি সুখকে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ছিল 'ভারতের নারী'।[১১] স্পষ্টতঃ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য ও ধর্মের ক্ষেত্রে কয়েকজন নারীর মহিমা প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় নারীত্বের জয়গান করা। কিন্তু এ ধরনের প্রবন্ধের সচরাচর আঙ্গিক এড়িয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখক অস্বাভাবিক ও অচিন্ত্যনীয় স্বীকারোক্তি করে বসেছেন, "ভারতীয় নারীর স্বাধীনতা ছিল না, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় নারীত্বে মানসিক বিকাশের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা অনুপস্থিত।" এই অভিযোগকে অনুসরণ করে লেখক বলেছেন, "স্বাধীনতা থেকে যে মানসিক বৃত্তির বিকাশ ও পূর্তি হয় ভারতীয় নারীর মধ্যে তা উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত।" এটি যথেষ্ট অপমানজনক; কিন্তু লেখক বলেছেন, স্বাধীনতার অভাবের ফলে ভারতীয় নারীর মধ্যে যে কর্তব্যনিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেই কর্তব্যনিষ্ঠাই ইউরোপের নারীদেরকে বিখ্যাত হতে সাহায্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও ভারতীয় নারী মিসেস্ জন হোওয়ার্ডের মতো জীবনযাপন করতে পারেনি। মিসেস্ হোওয়ার্ড দূরদেশে স্বামীর সঙ্গিনী না হয়ে সারাজীবন অপরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ লেখকদের মৌলিক রচনায় এমন সন্দেহ থাকতে পারে, তাঁরা ইউরোপীয় ভারত তত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণাকে অতিক্রম করেছিলেন কি না। কিছু প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে রচিত হয়েছিল শুধুমাত্র ইউরোপীয় গবেষণাকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে, ইউরোপীয়ানদের বিস্তৃত গবেষণার তা খণ্ডিত অংশ মাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল একটা বেদী যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙলার পাঠকদের কাছে দেশের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে গবেষণার ফল পৌঁছে দেওয়া। এই ব্যক্তি সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধে অসুস্থ ছিলেন না, তবু যে কোন মূল্যে পূর্বপুরুষদের গৌরবান্বিত করতে চাইতেন। যদিও তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষিতদের মতো সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করতেন, শুধু প্রতিবাদ করতেন এই যে, তাঁর নিজের দেশের অবনতি কোন পূর্বনির্ধারিত ও চিরস্থায়ী নয় বরং প্রাচীনকালের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব থেকে স্খলন মাত্র। বাঙলার বিকাশশীল সাহিত্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করা ছাড়া বঙ্গদর্শনের যদি আর কোন যুগজয়ী কৃতিত্ব থাকে সেটা হল, নিজেদের সভ্যতা সম্পর্কে হিন্দুদেরকে সচেতন করে তোলার মতো পর্যায় পর্যন্ত এটি ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে বর্তমানের আলোয় টেনে তুলেছিল। একটা অনুকরণযোগ্য ধারা সৃষ্টি করেছিল; ভারতীয় সভ্যতা যতই প্রাচীন হোক না কেন এবং

পশ্চিমী সভ্যতা যতই উন্নত হোক, ভারতের প্রাচীনত্বকে অত্যন্ত নিকটবর্তী করে এনেছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন সভ্যতার এই সান্নিধ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; ঠিক পশ্চিমী সমসাময়িক সভ্যতার গ্রীক সান্নিধ্য যতখানি গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকে বাঙলার জাগরণ পঞ্চদশ শতকে পাশ্চাত্যের নবজাগরণের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'নবজাগরণ' শব্দটি অত্যন্ত শিথিলভাবে পুনঃজাগরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যাত —পশ্চিমের দ্বারা প্রাচীন জগৎকে আবিষ্কার করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ভুলভাবে বাঙলার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে।

কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এমন একটা নতুন যুগে পদার্পণ করি যেখানে 'নবজাগরণ' শব্দটি একটা নতুন তাৎপর্য প্রাপ্ত হয়, পশ্চিমের ঐতিহাসিকরা যেভাবে এটি প্রয়োগ করেছেন তার থেকে অনেক দূরের ও ভিন্ন জাতের।

আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, নবজাগরণে পশ্চিমের অবদানকে অস্বীকার করা; বস্তুতঃ বঙ্গদর্শনের লেখকরাও সর্বত্র এমত সমর্থন করতেন না। গৌরবময় হিন্দু অতীতে অস্তিত্ব অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় তাঁরা বরং 'ইংরেজ প্রেমী'র পরিবর্তে 'ভারতপ্রেমী' ছিলেন; যেখানে ভারতপ্রেমীর অর্থ হল ভারতের সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করা ও অভারতীয়কে পরিত্যাগ করা। সংক্ষেপে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল : কোনভাবেই পাশ্চাত্যের বিন্দুমাত্র মূল্য হ্রাস না করে অতল গহ্বর থেকে নিমজ্জিত হিন্দু সভ্যতাকে উত্থিত করা।

বঙ্গদর্শনের প্রবর্তিত ধারা আরো কয়েকটি দশক অব্যাহত থাকে। এবং তখন থেকে বাঙলা সাহিত্যের সাময়িক পত্রিকাগুলোতে ভারতবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বঙ্গদর্শনের এই অবদান যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা মেকলের সময়ে 'প্রাচ্যবাদী-পাশ্চাত্যবাদী' বিতর্ক স্মরণ করলে স্পষ্ট হবে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শিক্ষা-প্রণালী দেশীয় ধারার অনুসরণে প্রচলিত হওয়ার প্রাচ্যবাদী দাবীকে যখন মেকলে অগ্রাহ্য করেছিলেন তখন প্রতিবাদ করেছিলেন কয়েকজন মুষ্টিমেয় ইংরেজ পণ্ডিত মাত্র, ভারতীয়দের ভূমিকা ছিল আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। ভারত সম্পর্কে ভারতীয়দের অজ্ঞতা এতই বিস্ময়কর ছিল যে, তাঁদের নীরবতাকে প্রাচ্য ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায় না —কারণ তাঁরা সাধারণভাবে বিতর্কের তাৎপর্যই উপলব্ধি করতে পারেন নি। সে বিতর্ক আজ ইতিহাস মাত্র। শতাব্দীর শেষাংশে জাতীয় শিক্ষা বিতর্কটি (আমরা পরে আলোচনা করেছি) কিন্তু এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশীয় বিষয় পরিত্যাগে পশ্চিমী শিক্ষা কি ভারতীয়দের জন্য উপযুক্ত? জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার প্রবক্তারা এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। বঙ্গদর্শন এবিতর্ক শুরু করেনি সত্য, কিন্তু যুক্তিসমূহের সঠিক গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার প্রগতিশীল পণ্ডিতদের অনেকাংশে প্রতিনিধিত্ব করেছিল এই বঙ্গদর্শন এবং প্রত্যাশা করা গিয়েছিল যুগ-সংস্কারের উদ্দীপনা প্রতিফলিত হবে এই পত্রিকায়। একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্গদর্শন সেই প্রত্যাশাকে ভূলুণ্ঠিত করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'সাম্যে' (১২৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা বিধবা-বিবাহ ও নারীমুক্তি প্রচেষ্টার প্রভূত প্রশংসা করেছেন। অবশ্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধ সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম-পদ্ধতির প্রতিবাদ করে। আধুনিক সমালোচকগণ ভ্রান্তভাবে বঙ্কিমকে অভিযুক্ত করেন যে তিনি ঐ নোংরা প্রথা প্রচলিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আমাদের কাছে এ-সম্পর্কে বঙ্কিমের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে 'স্মৃতিশাস্ত্রে' আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে সম্ভাব্য বিপদ রয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে, এটি শাঁখের করাতের মতো; ভাল-মন্দ সমস্ত প্রথা স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত হলে সংস্কারকের উপরই তা প্রতিক্ষিপ্ত হবে। বঙ্কিমের যুক্তির এই ছিল সারকথা। এখানে শুধুমাত্র এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, নব্যহিন্দুরা ব্রাহ্মদের পথে সমাজ সংস্কার অনুমোদন করেন নি, হিন্দুসমাজে সংস্কারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে তারা নিম্নশ্রেণীর জন্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সংস্কারকেই উপযুক্ত মনে করতেন। বঙ্গদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল মূলতঃ এরকম।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. P. J. Marshall (edited) The British Discovery of Hinduism in the 18th century : William Jones "On the Hindus", pp. 252-253.
২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য :---S. Mukherjee : Sir William Jones : A study in 18th century British Attitude to India, Cambridge, 1968.
৩. P. J. Marshall, p. 251.
৪. অতুল প্রসাদ সেনের লেখা কবিতা।
৫. রজনীকান্ত সেনের লেখা কবিতা।
৬. ঐ বছরের 'Education Gazette'-এ এটি প্রকাশিত হয়।
৭. বঙ্গদর্শন : বৈশাখ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, (ভারত কলঙ্ক)।
৮. বঙ্গদর্শন : ফাল্গুন, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
৯. লেখক মূল মহাভারতের সঙ্গে কালিদাসীয় শকুন্তলার তুলনা করে দেখিয়েছেন। মহাকাব্যের বীরাঙ্গনা চরিত্র কালিদাসের হাতে সভ্য ও পুতুল-পুতুল স্বভাব-লাজুকতায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে।
১০. বঙ্গদর্শন : জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ (মনুষ্যজাতির মাহাত্ম্য কীসে হয়)
১১. বঙ্গদর্শন : মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

৩

আন্দোলনের সূত্রপাত

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় রেভারেণ্ড ডব্‌ল্যু ডব্‌ল্যু হেষ্টি (Reverend W. W. Hastie) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রোত্তর বিতর্ক নব্য-হিন্দু আন্দোলনের ধারণার বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর শোভাবাজার রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের বিবরণ ২০শে সেপ্টেম্বর স্টেটস্‌ম্যানে প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের কলকাতায় শোভাবাজারের রাজপরিবার ছিল অন্যতম ধনী ও প্রভাবশালী পরিবার। এই পরিবার যেমন হিন্দু ধর্মের স্তম্ভ বিশেষ ছিল, তেমনই প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টেরও সমর্থক ছিল; অবশ্য তাঁদের এই সমর্থন প্রাচীন বিশ্বাসের মূলে আঘাত করার মতো দূরাগামী ছিল না। তাহলেও দেওয়ান রামকমল সেন এবং রাজা রাধাকান্তদেবের মতো প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণের পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তি প্রসারের ভূমিকা কোন অংশে ন্যূন নয়। ডেভিড্ কফ্[১] এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিকদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তি প্রসারে ঐ প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণের অবদান ছিল অত্যন্তই ফলদায়ী। এঁদের গবেষণায় প্রচলিত এ ধারণাও অযথার্থ প্রমাণিত হয়েছে যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তি প্রসারের সমস্ত প্রশংসা প্রাচীন বিশ্বাস বিরোধীদেরই প্রাপ্য। পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তির সমর্থক প্রাচীনপন্থীগণের ত্রুটি ছিল যে, প্রাচীন বিশ্বাসের স্বপক্ষে তাঁরা কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করতে পারেন নি।

শোভাবাজার রাজপরিবারের রাধাকান্তদেব (১৭৯৪-১৮৬৭) হিন্দু পৌত্তলিকতাকে সমর্থন করতেন। তাঁর যুক্তি ছিল শিশুদের নিকট পুতুলখেলা যতখানি উদ্দেশ্যপূর্ণ ভারতবাসীর কাছে পৌত্তলিকতাও ততখানি উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং এর গুরুত্ব এই যে, এর মাধ্যমে ভারতীয় জনসাধারণ অনৈতিক অভ্যাসে পতিত

হবার দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে। যুক্তিটি দুর্বল। তবু এর মাধ্যমেই প্রাচীনপন্থীগণ তাঁদের পৌত্তলিকতা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তিকে সমর্থন করে প্রাচীন বিশ্বাসকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার এই বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়েই তাঁরা ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন। শোভাবাজার রাজবাড়ীর শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে উদার ও সংস্কারমুক্ত মতামতের জন্যও বিখ্যাত ছিলেন; এঁদের উপস্থিতির কারণেই ঐ শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল, নতুবা তা অনুল্লেখিতই রয়ে যেত। রেভারেণ্ড হেষ্টির কাছে তাই এ শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান হিন্দু গোঁড়ামী ও পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তির এক অনভিপ্রেত ও কষ্টকর সংমিশ্রণের উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছিল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে পারিবারিক দেবতা গোপীনাথজীর বিগ্রহ প্রদর্শন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তি প্রসারে উৎসাহী ইংরেজী-শিক্ষিত উপস্থিত হিন্দুগণ কর্তৃক ঐ বিগ্রহ প্রদর্শনের অনুমোদন হেষ্টিকে অসন্তুষ্ট করেছিল। জেনারেল এসেমব্লিস ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষরূপে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আলেকজাণ্ডার ডাফের উত্তরাধিকার তাঁর উপর বর্তেছে, সুতরাং বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি আক্রমণ শুরু করেন। এই আক্রমণ ছিল প্রতিমা পূজা, অনুন্নত ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যে অপরিসীম সহানুভূতি এবং পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত হিন্দুগণের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টীয় ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের এক অপূর্ব মিশ্রণ। এবং ঐ অনুষ্ঠানে শিক্ষিত হিন্দুগণের উপস্থিতি মিশনারী দৃষ্টিভঙ্গীতে পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। রেভারেণ্ড হেষ্টি একের পর এক তাঁর পত্র প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর প্রতিটি পত্রে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রতিমা-পূজা ও হিন্দুধর্ম-দর্শনকে হেয় প্রতিপন্ন করা। হেষ্টি তাঁর তৃতীয়পত্রে এই ইঙ্গিত দিয়ে সিদ্ধান্তে আসেন যে, হিন্দুদের একমাত্র আশা নিহিত রয়েছে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের মধ্যে।[২] বঙ্কিমচন্দ্র সেই মুহূর্তে তাঁর মতামত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র হেষ্টিকে "ভারতীয় সেণ্টপল" নামে অভিহিত করে রামচন্দ্র ছদ্মনামে স্টেটস্‌ম্যানে পত্র প্রকাশ করেন। সেই পত্রে তিনি ভারতীয় সেণ্টপল হেষ্টিকে প্রস্তাব দেন যে, হিন্দুধর্মের নীতিগুলিকে খাটো করার পূর্বে তিনি যেন সেইগুলির সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হন। স্টেটস্‌ম্যানে মূর্তিপূজা বিরোধী ওরকম জঞ্জাল রচনা প্রকাশের চেয়ে দুর্গাপূজার ছুটিতে জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া অনেক ভাল। কারণ, যে লোক বেদান্তকে হিন্দু ধর্ম মনে করেন তাঁর জন্য এর চেয়ে মোলায়েম ভাষা ব্যবহার করা যায় না। তিনি হেষ্টিকে 'ভগবৎ গীতা' ও সাণ্ডিল্যের 'ভক্তিসূত্রকে'র মতো সংস্কৃত শাস্ত্র পড়তে উপদেশ দেন। এবং তিনি

যেন ঐ সব শাস্ত্র কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের কাছে না পড়েন। অন্ধ যেমন কোন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না, তেমনি তাঁরা যা বোঝেন না তা অপরকে শিক্ষা দিতেও পারেন না। হিন্দুর কাছে পাঠাভ্যাস করাই বিধেয়। তারপরও যদি তিনি তাঁর এখনকার বিশ্বাসে অটল থাকেন তাহলে আমরা তাঁর মতকে গ্রহণ করার জন্য যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নাও হতে পারি, তবুও আশ্বাস দিতে পারি যে, তাঁর প্রতি উপহাস করা হবে না। যে বিষয় সম্পর্কে একপক্ষ অজ্ঞ সে বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা প্রচণ্ড মূর্খতার পর্যায়েই পড়ে।

বঙ্কিমের প্রস্তাবে হেস্টি অত্যন্ত বিরক্ত হন। বঙ্কিমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, বর্তমানে ইউরোপ এবং আমেরিকার পণ্ডিতেরা ভারতীয়দের চেয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে ভালো বোঝেন।[৩] ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ছোট করে দেখার জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা করেন, কারণ বিষয়টি হল 'ইউরোপের মেধাগত শ্রেষ্ঠত্ব'কেই অপমান করা। বঙ্কিম তাঁর দুটি বিস্তৃত পত্রে, কেবলমাত্র মিশনারী নয়, হিন্দুধর্মের সমস্ত ইউরোপীয় সমালোচকদেরও অসংলগ্নতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, এবং তাঁর নিজস্ব ধারণায় 'যুক্তিবাদী হিন্দু-ধর্মে'র একটি খসড়া চিত্র অঙ্কন করেন। বিষয়টিকে আক্ষরিক গুরুত্ব না দিয়েও তিনি সেদিন প্রকৃতপক্ষে 'নব্যহিন্দু আন্দোলনের'ই জন্মলগ্ন ঘোষণা করলেন। ইউরোপীয়দের মেধাগত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও বললেন যে, শুধুমাত্র মেধাগত শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায় না।[৪] তিনি উল্লেখ করলেন যে, ন্যায় ও বৈষ্ণব দর্শনের মতো সমৃদ্ধ ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের যথেষ্ট ধারণা নেই। তাঁর মতে 'ইউরোপের মেধাগত শ্রেষ্ঠত্ব' কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের আবরণের উপরেই আক্রমণ চালাতে পারে, হিন্দুধর্মের মর্মভাগের কাছে পৌছাতে পারবে না।

পরবর্তী অধ্যায়ে বঙ্কিম 'যুক্তিবাদী হিন্দুধর্মে'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অন্যান্য পরিপূর্ণ ধর্মের মতোই হিন্দুধর্ম একটি পূর্ণ ধর্মীয় পদ্ধতি; এর গঠনে রয়েছে: প্রথমতঃ একটি নীতিগত ভিত্তি বা ধর্মীয় বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ পূজা বা আচার-অনুষ্ঠান, এবং সর্বশেষে কমবেশী নীতি-নির্ভর কতকগুলি নৈতিক আচরণের নিয়মাবলী।[৫] 'অধ্যয়নের বিস্তৃত ক্ষেত্র এই সবই, প্রতিমাপূজা এর উপর নির্ভর-শীল একটি অংশ মাত্র'। দর্শনের গভীরেই আধুনিক হিন্দুধর্মের ভিত্তি সমাহিত। তিনি উল্লেখ করেন, প্রকৃতি এবং আত্মার দার্শনিক দ্বৈতবাদই পূজার ভিত্তি এবং এদের উভয়ের মিলনের ফলে—"সৃষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি প্রেম"—নিয়েই হিন্দুধর্ম গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণ সম্পর্কে বঙ্কিম বলেন, কৃষ্ণ আত্মা, রাধা হলেন প্রকৃতি, এঁদের মিলনকে মহিমান্বিত করেই হিন্দুধর্ম গঠিত হয়েছে; কারণ এই মিলনই হল "সমস্ত ভালোবাসা, সত্য ও সৌন্দর্যের উৎস"।

প্রতিমা পূজা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য, সৌন্দর্যের আদর্শ যেমন মানুষের শিল্পকলার মধ্যে মূর্ত, সেরকম মানুষের মধ্যেকার স্বর্গীয় ধারণা গড়ে ওঠে প্রতিমা থেকে।[৬] বঙ্কিমের মূর্তিপূজার বৌদ্ধিক ভিত্তি হল এই-ই। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও নিরঞ্জনের অনুষ্ঠান হিন্দুমূর্তিপূজাকে পাথর পূজা থেকে পৃথক করেছে। সর্বোপরি, "সকল ভক্তের জন্য মূর্তিপূজা অপরিহার্য নয়।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "একজন মানুষ মন্দিরে প্রবেশ না-করেই খাঁটি হিন্দু থাকতে পারে।" হিন্দুধর্মের নৈতিকতা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য, এই নৈতিক বিধির লক্ষ্য হল, ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান দ্বন্দ্ব ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মীয় নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। রামমোহনের উপর শ্রীরামপুর মিশনারীদের আক্রমণ বা কেশবচন্দ্রের উপর রেভারেণ্ড ডাইসনের (Rev. Dyson) আক্রমণ প্রভৃতি মিশনারী কার্যকলাপ ছিল গৌণ ব্যাপার। ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান বিরোধ প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-খ্রীষ্টান বিরোধের উপাঙ্গ মাত্র। এগুলির প্রতি খ্রীষ্টান মিশনারীদের গুরুত্ব আরোপের কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। হিন্দু কলেজে লৌকিক শিক্ষাদান এবং মেকলের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার কর্তৃক এর অনুমোদন এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে একটি অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্ট হয়, যা খ্রীষ্টান পৃষ্ঠপোষকগণ সম্পূর্ণ অনুমান করতে পারেন নি। মেকলে দুঃখজনকভাবে হতাশ হয়েছিলেন এই আশা পোষণ করে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণকারীদের মনের ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপ থেকে খ্রীষ্টানধর্মের নবোন্মেষ হবে এবং তা ধীরে ধীরে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের ধ্বংসের পরিণামে শিক্ষিত হিন্দুরা খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা নেয়নি, বরং ব্রাহ্মধর্মে তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে। ব্রাহ্মধর্মের উপর মিশনারী আক্রমণের এই ছিল পটভূমিকা। বঙ্কিম-হেস্টি বিতর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে। আবার এই বিতর্কের মূল বিষয় এই যে, কলকাতার ইংরেজী শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে মিশনারীদের এই প্রথম আক্রমণ, যেখানে ব্রাহ্মদের উপেক্ষা করা হয়েছে।

বঙ্কিমের মধ্যেও একই ধরনের উপলব্ধি ছিল। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তাঁর নীরবতাও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, অবশ্য মিশনারী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর বক্তব্য ছিল পৃথক। মিশনারীরা যেখানে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান বিরোধকে উপেক্ষা করেছিলেন, বঙ্কিম সেখানে উপেক্ষা করেছিলেন হিন্দু-ব্রাহ্ম বিরোধকে। অপ্রীতিকর সাম্প্রদায়িক বিতর্ক থেকে এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্য যে তাঁর এই নীরবতা নয়, হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর নতুন ব্যাখ্যা আলোচনা করলেই আমরা তা বুঝতে পারব।

খোসাকে বাদ দিয়ে হিন্দুবিশ্বাসের সারবস্তুর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যা সুনিশ্চিতভাবে হিন্দুচিন্তার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এই নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গী ব্রাহ্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন বৈরীভাব ব্যক্ত করেনি, আঘাত করেছিল পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিবেশে সৃষ্ট এর আতিশয্যকে। এ-প্রসঙ্গে আমরা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রতিমা পূজার পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তির সঙ্গে বঙ্কিমের যুক্তির তুলনা করতে পারি। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় রাম-মোহনের বৈদান্তিক একেশ্বরবাদকে ধরাশায়ী করতে চেয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে, বৈদান্তিক পূজা সন্ন্যাসীদের জন্য, গৃহীদের জন্য হল প্রতিমানির্ভর পূজা-পদ্ধতি। বঙ্কিমের যুক্তি সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর মতে প্রতিমা পূজা হিন্দুধর্মের মূল-কথা নয়। মূলকথা হল আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির মিলন তত্ত্ব। এবং এর নৈতিক তত্ত্ব হল, "সৃষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি প্রেম"।

ধর্মের সারবস্তু আবিষ্কারের পদ্ধতি যুক্তিবাদী বলে বঙ্কিমের 'যুক্তিবাদী হিন্দু-ধর্ম' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিতর্কে এই যুক্তিবাদী পদ্ধতিই বঙ্কিমের মুখ্য অবদান। কিন্তু বঙ্কিমের যুক্তিবাদী পদ্ধতি ইউরোপের যুক্তিবাদীদের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তাঁর বক্তব্য, ধর্মের প্রাথমিক বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবাদী পদ্ধতি সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। বঙ্কিম এ-বিষয়ে বিশেষ জোর দেন যে, ইউরোপে যুক্তিবাদের বিস্তার মূলতঃ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিতকে আল্‌গা করে দিয়েছে। বাঙলাদেশেও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর থেকে মনে করা হয়েছিল যে ইউরোপের মতোই এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ নাস্তিক হয়ে উঠবে। ইউরোপীয় যুক্তিবাদের চ্যালেঞ্জে ব্রাহ্ম প্রত্যুত্তর সেই চ্যালেঞ্জের একটি অংশ প্রতিমাপূজায় সীমাবদ্ধ ছিল, যুক্তিগ্রাহ্য নাস্তিকতাবাদের কোন সদুত্তর ধর্ম দিতে পারে কি না—এমন বিরাট প্রশ্নের তাঁরা সম্মুখীন হয়নি। বঙ্কিমই প্রথম এই প্রশ্নটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। হেস্টিকে তাঁর তৃতীয় পত্রে তিনি লেখেন; "Hinduism does not consider itself placed on its defence...And on the bar of christianity, which itself[7] has to maintain a hard struggle for existence in its own house. Hinduism also pleads wants of jurisdiction."

বিবৃতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমের যুক্তিবাদ পরিচালিত হয়েছিল ধর্মকে (শুধুমাত্র হিন্দু কিংবা ইউরোপের ধর্ম নয়, যে কোনো এবং প্রত্যেকটি ধর্মকে) অস্ত্রে সুসজ্জিত করতে, যাতে যুক্তিবাদের সঙ্গে বিরোধে ধর্ম বিজয়ী হয়। যুক্তি-বাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যুক্তিবাদের অস্ত্রভাণ্ডার থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমের ধর্মচিন্তা প্রবাহিত হয়েছিল।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. **Kopf, David : British Orientalism and the Bengal Renaissance.**

২. "And as I may yet endeavour to show, a truer and profounder philosophy is demonstrating the all important fact, that it is only christianity, with its revelation of the Divine Personality in all the fulness of His Self-existent thought and eternal purpose, that can rationally take the place of the falling Brahmanism, so as to reconcile the soul of India in a pure and blessed life, to the universe around them and to ourselves."

৩. Letter dated October 7, 1882.

৪. Letter dated October 28, 1882.

৫. Bankim's letter : The Statesman, October 28, 1882. The Intellectual Superiority of Europe.

৬. ঐ।

৭. জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত।

৪

ধর্ম এবং যুক্তিবাদ

(ক) উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের যুক্তিবাদী মত

তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে 'যুক্তিবাদী পদ্ধতি' নামে অভিহিত করেছি। ধর্মে, বিশেষত হিন্দুধর্মে, বঙ্কিমের এই প্রয়োগ পদ্ধতিটি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিতর্কে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী অবদান।

এই পদ্ধতিটি ছিল যুক্তিবাদ-নির্ভর, যা সকল ধর্ম সম্পর্কে যুক্তিবাদী প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবে,—যে প্রশ্ন শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে নয়, বলতে গেলে ধর্মের সাধারণ অবস্থার বিরুদ্ধেই পরিচালিত। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপের যুক্তিবাদের ইতিহাস দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত। প্রথমটি প্রাক্-ডারউইন ধারা, যেখানে যুক্তিবাদী প্রতিবাদের লক্ষ্য হল প্রচলিত ধর্মের দুটি প্রধান বিষয়—শাস্ত্রীয় প্রত্যাদেশ ও চার্চ। সাধারণভাবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ নাস্তিক্যবাদ ছিল না, বরং এর মধ্যে একধরনের আস্তিক্যবাদী প্রবণতা ছিল। তবু অস্বীকার করা যায় না যে, ফরাসী বিপ্লবের কয়েকজন দার্শনিক নাস্তিক ছিলেন; এবং আরো গুটিকতক দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume) ছিলেন যাদের অন্যতম, তাঁরাও নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের ইতিহাসে ধর্ম সম্পর্কে আস্তিক্যবাদী ধারণা বহুলাংশেই প্রবল ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীগণ চার্চের কর্তৃত্ব এবং শাস্ত্রীয় প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করতেন, অথচ 'কারণের অনিবার্যতা' (necessity of reason)-রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নিতেন।

কিন্তু ডারউইনের গ্রন্থ[১] প্রকাশিত হবার পর ধর্মীয় ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। বিবর্তনবাদের তত্ত্বে সৃষ্টি-রহস্য উন্মোচিত হলে ধর্মীয় মনন থেকে 'অলৌকিক অস্তিত্বের' শেষ খুঁটিটি হাতছাড়া হয়ে যায়, ফলে

চারিদিককার আক্রমণ থেকে বিপর্যস্ত হয়ে ধর্মকে নাস্তিকতাবাদের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হয়। সংক্ষেপে, এই হল ধর্মের ক্ষেত্রে ডারউইনোত্তর যুক্তিবাদী পরিস্থিতি।

চিন্তারাজ্যের এই বিপ্লব শুধুমাত্র ইউরোপে সীমাবদ্ধ রইল না। ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ফলে নব-প্রজন্মের ছাত্রদের দল এই নতুন চিন্তায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এর ব্যাপ্তি তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও ইয়ংবেঙ্গল গ্রুপের প্রখ্যাত ডিরোজীয়ানরা এর প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল ইউরোপীয় যুক্তিবাদের চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ; এবং চ্যালেঞ্জ ছিল খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মীয় বিশ্বাস ও হিন্দু সামাজিক রীতি-নীতির। আমরা প্রথম অধ্যায়ে কোনরকম সমালোচনা বা মন্তব্য না করে ব্রাহ্মধর্মের উৎস সন্ধানে এই তত্ত্বের উল্লেখ করেছি, বঙ্কিমের রচনার মূল্যায়ন করতে হলে ধর্ম সম্পর্কে ব্রাহ্মদের যুক্তিবাদী সমালোচনার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আমরা তাই সংক্ষেপে রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্রের যুক্তিবাদী ধারণার আলোচনা করছি।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Precepts of Jesus" গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন প্রাক্-ডারউইন যুক্তিবাদকেই সমর্থন করেছেন। এই ভূমিকাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য 'argument from design' ব্যবহারে রামমোহন পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু ঐতিহ্য (tradition) ও নির্দেশ (instruction)-এর প্রতি তাঁর ইঙ্গিত প্রমাণ করে যে, তিনি শাস্ত্রীয় প্রত্যাদেশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[২]

দেবেন্দ্রনাথই শাস্ত্রের 'অভ্রান্ততাকে' খণ্ডন করেছেন। অবশ্য একথা সত্য নয় যে, তিনি প্রাক্-ডারউইন যুগের যুক্তিবাদকে সমর্থন করেছিলেন। 'কারণের অনিবার্যতা' রূপে তিনি তাঁর বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করেন নি, বিশ্বাসের সমর্থন খুঁজেছেন 'জ্ঞানোজ্জ্বলীত বিশুদ্ধ হৃদয়ে'। এই বিষয়টিকেই কেশবচন্দ্র সেন 'স্বজ্ঞা' (intuition) বলে বর্ণনা করেছেন।

কেশবচন্দ্রের মতে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি প্রোথিত রয়েছে মানব প্রকৃতির গভীরে। স্বজ্ঞাই এর ভিত্তি।[৩] তিনি আরো বলেছেন, স্বজ্ঞা হল সেই বোধ যা আমাদের প্রকৃতি অত্যন্ত আড়াআড়ি আকর্ষণ করতে পারে। 'স্বজ্ঞাত সত্যকে' (intuitive truth) স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, সামনে-সামনে দেখা যায় তাকে।[৪] কেশবচন্দ্র স্বজ্ঞা তত্ত্বের সম্ভাব্য প্রতিবাদগুলি বিশ্লেষণ করেছেন, স্বজ্ঞার স্বপক্ষে মন্তব্যকারী দার্শনিকদের নামও উল্লেখ করেছেন এবং স্বজ্ঞা বিরোধী প্রতিবাদগুলিকে বাতিল করে দিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, এগুলি নিশ্চিতরূপে যুক্তিবাদের সমগোত্রীয়, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অগ্রগণ্য যুক্তিবাদী দার্শনিকদের ধর্মীয়

বিশ্বাসের সত্যতা সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই। কেশবচন্দ্রের 'স্বজ্ঞাবাদে'র সঙ্গে সে যুগের 'অভিজ্ঞতাবাদী প্রবণতা'র (empirical spirit) মিল ছিল না।

কেশবচন্দ্র বঙ্কিমের সমসাময়িক, তবু তাঁদের চিন্তারাজ্যের সামঞ্জস্য অল্পই। বঙ্কিম নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যুক্তিবাদী মতাদর্শের দিকে অগ্রগমনের পথে চলতে গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রথমে শাস্ত্রীয় প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করে ও পরে সার্বিক, বস্তুনিষ্ঠ অন্তর-নির্দেশের প্রতি আবেদন জানায় তবু ব্রাহ্মধর্ম ক্রমান্বয়ে কেশবচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের 'বিষয়ীগত অন্তর-নির্দেশের' (subjective intuition) পঙ্কিলতায় ডুবে যায়। বঙ্কিম ধর্মের ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে তাই সচেষ্ট ছিলেন অন্তর-নির্দেশকে পরিহার করতে: তাঁর বিবেচ্য বিষয় ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বঙ্কিমের রচনায় এটি স্পষ্ট।

বঙ্কিম ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, মুসলমান ও ইহুদিদের উল্লেখ করেছেন প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী বলে এবং তারপর একদল দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারদের কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম নিজেকে গণনা করেছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে। তিনি লিখেছেন, "দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্ম বা ধর্মপুস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোম্‌ত্, ব্রাহ্ম এবং নব্যহিন্দু ব্যাখ্যাকারেরা এই মতের উদাহরণস্বরূপ। ইহারা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম না স্বীকার করিলেন, তবে তাঁহাদিগকে ধর্মের নিকট একটা নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। নইলে ধর্মের কোন মূল থাকে না—কিসের উপর ধর্ম সংস্থাপিত হইবে ? ধর্মের এই নৈসর্গিক ভিত্তি কল্পিত অস্তিত্বশূন্য বস্তু নহে; যাঁহারা ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি স্বীকার করিতে পারেন।"

"উপস্থিত লেখক হিন্দুধর্মের অন্যান্য নতুন ব্যাখ্যাকারদিগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করি না। ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে ইহাই স্বীকার করি।"[৫]

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় যুক্তিবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসীর কলম থেকে উৎসারিত বিবৃতিটি ছিল এই। এখানে বঙ্কিম যদিও নিজেকে ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছেন, তাহলেও তাঁর নৈসর্গিক ভিত্তি, অন্তর-নির্দেশ তত্ত্বে বিশ্বাসীদের কাছ থেকে তাঁকে আলাদা করে চেনার পক্ষে যথেষ্ট। আবার তাঁর নৈসর্গিক ভিত্তিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর আস্তিক যুক্তিবাদীদের চিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্যত্র বঙ্কিম লিখেছেন, "মিলের মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সারবান। জগতের নির্মাণ-কৌশল হইতে তাঁহার মতে, নির্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি

প্রাচীন কথা এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মতো প্রচারের পূর্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ডার্বিন দেখাইয়াছেন যে, এই নির্মাণ কৌশল স্বতঃই ঘটে।"[৬]

একথা বঙ্কিম লিখেছিলেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ হেষ্টির সঙ্গে তাঁর বিতর্কের সাত বৎসর পূর্বে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্ম সম্পর্কে পুস্তক রচনার পূর্বেও বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গী ডারউইনোত্তর 'বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদে'র (scientific agnosticism) প্রতি আকৃষ্ট ছিল। বস্তুতঃ, তিনি দীর্ঘদিনই নাস্তিকতাবাদের মধ্যে অতিবাহিত করছিলেন, এবং যখন অবশেষে, ধর্মের সত্যিকার উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হলেন, হঠাৎ কোন অতীন্দ্রিয় পথে কিংবা সিদ্ধ গুরুর অঙ্গুলি স্পর্শে নয়, বরং মানুষের অস্তিত্বকে নিয়ে এক কঠোর পরিশ্রমী যুক্তিবিশ্লেষণের মাধ্যমে, সেদিন তিনি মানবীয় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত রকমের যুক্তিবিশ্লেষণের তুচ্ছতাকে পরিত্যাগ করলেন। তাঁর এই মানবীয় অন্তর্দৃষ্টি গড়ে উঠেছিল জীবনব্যাপী জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের অভ্যাস ও জীবনকে সম্পূর্ণরূপে দেখার মধ্য থেকেই।

(খ) মানব ধর্মবাদের দৃষ্টিতে ধর্মব্যাখ্যা

ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা কারণের অনিবার্যতারূপে একটি অতীন্দ্রিয় নিয়মের জন্য বঙ্কিম তাঁর ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তিকে গ্রহণ করেন নি, এর বাইরেও এমন কিছু আছে যার ফলে চিন্তাবিদ্ হিসাবে তিনি তাঁর নিজের যুগকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি ধর্মকে দেখেছেন মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এই মানবতাবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ, মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি নৈতিক পদ্ধতি, যাতে মানুষ তাঁর সমস্ত বৃত্তিগুলোকে (faculty) জাগ্রত করে শ্রেষ্ঠতম আনন্দে পৌছাতে পারে। কিন্তু গ্রীকরা তাদের দেবতামণ্ডলী এবং অন্যান্য জাতিরা তাঁদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়েও ধর্মের বিকল্প হিসাবে মানবতাবাদকে একটি পরিপূর্ণ মতবাদরূপে উপস্থাপিত করতে সাফল্য পায় নি। শুধুমাত্র আমাদের যুগেই—ধর্মের বিকল্পরূপে কেবলমাত্র মানবতাবাদই গৃহীত হয়েছে। বঙ্কিমই প্রথম চিন্তাবিদ্ যিনি এই মানবতাবাদকে স্বীকার করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি দেখিয়েছেন যে, প্রেম ও ভক্তির ধর্ম মানবতাবাদের বিরোধী নয়।

বঙ্কিম ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম।[৭]

বঙ্কিমের মতে ধর্মের ভিত্তি হল, সুখের অনুসরণ, যার মধ্যে মানবিক আচরণ প্রকাশিত হয়।" কিন্তু সুখ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটা কোন অকর্ষিত চেতনা নয়। যদিও সাধারণভাবে তা মনে করা হয়, বরং কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শারীরিক কিংবা মানসিক বৃত্তির প্রয়োগজনিত ফল; নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে

এই বৃত্তিগুলির স্ফুরণ ঘটে। সুতরাং মানুষের চরম সুখের জন্য শারীরিক (physical), জ্ঞানার্জনী (intellectual), কার্য্যকারিণী (active) এবং চিত্তরঞ্জিনী (aesthetic) এইসব বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন।[৮]

স্পষ্টতঃ এসব বিশুদ্ধ মানবতাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। Republica-য় প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের এই ধারণাই স্মরণ করিয়ে দেয়, সেখানে সূত্রাকারে এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'gymnasium for the body and music for the soul'. আরো উল্লেখযোগ্য বিষয়, অ্যারিস্টটলের সঙ্গে বঙ্কিমের মানবতাবাদের সামঞ্জস্য। অ্যারিস্টটলের 'Nicomachaen Ethics'-এ সৎলোকের (virtuous man) ধারণার সঙ্গে এটি প্রায়ই তুলনীয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল অ্যারিস্টটলের 'মধ্যবিন্দু' (mean) তত্ত্বের সঙ্গে এবং গ্রীক ধারণায় 'সামঞ্জস্যে'র (harmony) সঙ্গে বঙ্কিমের সামঞ্জস্য (balance) তত্ত্ব প্রায় এক। সংক্ষেপে, বঙ্কিমের সামঞ্জস্য তত্ত্ব হল 'আকাঙ্খা' ও 'ক্রোধে'র মত বৃত্তিগুলির নিবৃত্তি সাধন, যাতে 'দয়া' এবং প্রেমের মত বৃত্তিগুলি অবদমিত না হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমের এই তাত্ত্বিক ধারণার উৎস ছিল 'গীতা'।[৯]

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥"

"যিনি বিধেয়াত্মা (যাঁহার আত্মা বা অন্তকরণবশবর্তী) তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন।" বঙ্কিমের মতে এই-ই হল গ্রীক-ধারণার 'সামঞ্জস্য' তত্ত্বের হিন্দু রূপান্তর। সুতরাং, শাস্ত্র থেকে এর গ্রহণযোগ্যতা কতখানি প্রশ্ন তা নয়, প্রশ্ন হল ধর্ম-গঠনের ক্ষেত্রে এর অবদান কতখানি। এই নৈতিক পদ্ধতিটি কি মূলতঃ যুক্তিবাদী এবং নাস্তিবাদী নয়? বস্তুতঃ, এতে মানুষেরই জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

মানবতাবাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধে বঙ্কিম উপয়োক্ত প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হল, সুষম বিকাশ সম্ভব কেবলমাত্র সেগুলিকে ঈশ্বরের প্রতি চালিত করলে অথবা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে কেবলমাত্র ভক্তিবৃত্তির শাসনাধীনে এনে তা সম্ভব। তাঁর ভাষায়: "যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য-ই উপভোগ করে এবং শারীরিক বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকে ভক্তি বলি"।[১০] আবার "ভক্তিশাসিতাবস্থা-ই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য"।[১১]

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিম মানবতাবাদের নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে গেছেন এবং ধর্মে নিয়ে এসেছেন কিছু অতিমানবসুলভ উপাদান।

তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন এক সর্বশক্তিমান ব্যক্তিসত্তা রূপে, যিনি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত[১২] এবং সমস্ত মানবিক বৃত্তিগুলির কেন্দ্ররূপে কাজ করেছেন।[১৩] অবশ্য একথা মনে করা কখনই সঙ্গত হবে না যে, ঈশ্বরের অবতারণা করে বঙ্কিম মানবতাবাদকে পরিত্যাগ করেছেন, বরং এই অবতারণার ফলে এমন একটি যুক্তিবাদী নীতিশাস্ত্র উন্মুক্ত হয়েছে, যা সরলতায় পরিপূর্ণ অথচ ব্যাপকতায়ও অনবদ্য।

(গ) একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)

বঙ্কিম এ-বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন যে হিন্দু ধর্ম অনুসারে বিশ্বের আত্মারূপে আছেন ঈশ্বর এবং এই তত্ত্বের মূল কথা হল প্রীতি। তাই হিন্দুধর্মের মূল কথা মানবতাবাদ। এবং যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির অর্থ হল, সমস্ত সৃষ্ট অস্তিত্বের প্রতি প্রেম। বঙ্কিম এই সর্বেশ্বরবাদী ধারণার সঙ্গে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের একেশ্বরবাদী ধারণার তুলনা করেছেন, ব্রাহ্মদের নাম উল্লেখ না করেও, স্পষ্টতঃই তিনি ব্রাহ্ম ধারণার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন "খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জার্মানি বা রুশিয়ার রাজা সমস্ত জার্মান বা সমস্ত রুশ হইতে একটা পৃথক ব্যক্তি, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর তাই।... তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে পার্থিব রাজাকে ভালবাসিবার জন্য যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয়, তেমনই করিতে হয়।

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্বভূতময়।... আমাতে তিনি বিদ্যমান। আমাকে ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসিলাম। তাঁহাকে না-ভালবাসিলে আমাকেও ভালবাসিলাম না।...সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না।...অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে"।[১৪]

অবশ্য এর দ্বারা তিনি ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন মানবকল্যাণমূলক কাজকে হেয় জ্ঞান করেন নি! পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, বঙ্কিমের বক্তব্য ছিল, যুগ যুগ ধরে হিন্দুধর্মের মানবতাবাদ হিন্দুদেরই নিকট বিস্মৃত হয়ে গেছে, এবং ঐ মানবতাবাদের পুনরুজ্জীবনই হল 'নব্য হিন্দু আন্দোলনের' প্রধান লক্ষ্য।

বঙ্কিমের যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত সমালোচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি যে সমালোচনার মূল বিষয় ছিল খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ, যে একেশ্বরবাদ পূর্বেই একজন বাহ্যিক ঈশ্বরকে স্বীকার করে নেয়, এমন এক ঈশ্বর পৃথিবীর বাইরে যাঁর অবস্থিতি। এ ধরণের ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা বিজ্ঞানের অজ্ঞাত। শুধু তাই নয়, মানুষের নাগালের এত দূরে তাঁর অবস্থিতি যে স্বতঃস্ফূর্ত-

ভাবে তাঁর প্রতি প্রেম উৎসারিত হওয়া কঠিন। হিন্দুধর্মের সর্বেশ্বরবাদে এ ধরণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না।

এইভাবে বঙ্কিম উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ডারউইনোত্তর যুক্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধর্মের নৈসর্গিক ও ভৌত ভিত্তি খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর নৈসর্গিক ভিত্তির বিভিন্ন পর্যায়গুলি এরকম :

(১) সুখের প্রতি সার্বজনীন আগ্রহ থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেছেন, এবং দেখেছেন যে, সুখ কোন আকর্ষিত চেতনা নয় বরং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফুরণে সুখ পাওয়া যায়।

(২) এখান থেকেই তিনি পৌছেছেন বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ তত্ত্বে।

(৩) যেহেতু বৃত্তিগুলি পরস্পর বিরোধী, সেহেতু তিনি সামঞ্জস্য তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন।

(৪) এই সামঞ্জস্য অর্জন করা সম্ভব নয়, যদি না বৃত্তিগুলিকে কোন কেন্দ্রীয় বিন্দুতে, এক অতি-মানবিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চালিত করা হয়, যিনি কিছু বৃত্তিকে নিবৃত্ত করে এবং কিছু বৃত্তিকে প্রকাশিত করে বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করে তুলবেন।

(৫) এরকম ব্যক্তিসত্তাই হিন্দুধারণার ঈশ্বর, যিনি সমস্ত সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। ঈশ্বরের প্রতি বৃত্তিগুলিকে পরিচালিত করার অর্থ, সামঞ্জস্যের মাধ্যমে সেগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ। এর ফলে ব্যক্তি প্রেমের সঙ্গে মানব প্রেমের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।[১৮]

(৭) সুতরাং, সুখের মানবীয় অনুসরণকে ব্যাখ্যা করলে মানবতাবাদের তিনটি চূড়ান্ত দিক পরিলক্ষিত হয়; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, মানব প্রেম এবং হৃদয়ে প্রশান্তি। সামগ্রিকভাবে, এগুলিই 'সম্পূর্ণত সৎলোকের' মানবতাবাদী গঠন। এবং কেবলমাত্র এগুলিই স্থায়ী সুখদানে সক্ষম।[১৫]

বঙ্কিমের নৈসর্গিক ধর্মের এই-ই হল যুক্তিবাদী গঠন। এর বিশেষ পরিণামগুলি হল : প্রথমত, হিন্দুধর্মের উপাসনার নতুন মতবাদ নিঃস্বার্থকর্মে নিবদ্ধ, যার লক্ষ্য মানবসেবা। প্রতিমাপূজা অথবা নিরাকার উপাসনা নিয়ে বিতর্কের মীমাংসা হয়েছে উভয়কেই গৌণতায় পর্যবসিত করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ ধরণের নিঃস্বার্থ কর্ম প্রচারিত হয়েছিল গীতায়। অতএব যুক্তিবাদী ধারা অনুসরণ করেও বঙ্কিম 'নিঃস্কাম কর্মের' তত্ত্বে পৌছে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, মানবতাবাদ হিন্দুধর্মের মূলকথা বলে নির্ধারিত হয়েছে—যা অংশতঃ ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের পার্থক্য নির্দেশ করে।

তৃতীয়ত, বিচারবুদ্ধি ও ভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের 'ব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদের' তুলনা করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়েছে।

(ঘ) গীতার কর্মবাদ

ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি এবং যুক্তিবাদী গঠনের উপর জোর দিতে গিয়ে ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সংক্ষিপ্ত রূপকে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক মূল্যায়নও আমরা করিনি। বঙ্কিম তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' রাজনৈতিক কর্মের কতকগুলি তত্ত্ব সংযুক্ত করেছেন, এই রাজনৈতিক কর্ম তাঁর ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত কর্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের' গঠনে এই তত্ত্বের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বিরাট। জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি আলোচনার সময় আমরা এর ব্যাখ্যা করব। বর্তমানে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হল কর্ম সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব, গীতার কর্মবাদ—যা নব্যহিন্দু মতবাদের একটি প্রধান দিক। গুরুত্বের দিক থেকে এর ভূমিকা বিরাট, কারণ এটি যেন স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য তিলক এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত শিক্ষাদর্শের নির্যাস স্বরূপ। অবশ্য একথা বললে অতিরঞ্জিত হয় না যে, এই তত্ত্বের ফলেই হিন্দুধর্মীয় চিন্তা একটি স্থায়ী পরিবর্তনের পথে চালিত হয়েছিল। অতীত ইতিহাসে যে হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মুক্তি বলে বিবেচিত হত এবং যেখানে ছিল একগাদা অপ্রচলিত ও নিষিদ্ধ নিয়মের সামাজিক আচার আচরণ, সেই ধর্মকেই সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা গেল।

এই সামাজিক ভূমিকা ব্যাখ্যাত হয়েছিল গীতার কর্মতত্ত্বে। কিন্তু এ কর্মতত্ত্ব প্রচলিত কর্মতত্ত্ব নয়। প্রচলিত কর্মতত্ত্বের সমালোচনা করে বঙ্কিম কর্মের লৌকিক দিকের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে কর্মের এই লৌকিক দিকই গীতায় প্রাধান্য পেয়েছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭তম শ্লোক উদ্ধৃত করে, —যেখানে কর্ম প্রশংসিত হয়েছে এবং জোর দেওয়া হয়েছে কর্মফলের প্রতি আকাঙ্খা না করতে—বঙ্কিম বলেছেন, "কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকার বা হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এসকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি।... এর অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে, কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না"।[১৬]

বঙ্কিম অন্যত্র হিন্দু ইতিহাসে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন: "ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম নাই, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কর্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষই কর্মে অনুরাগ শূন্য, সুতরাং অকর্মা লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।"[১৭]

কর্মের প্রচলিত তত্ত্বের এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীই বঙ্কিমকে কর্মের লৌকিক তত্ত্বের উপর জোর দিতে প্ররোচিত করেছে। তিনি দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন

যে, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ও অষ্টম শ্লোক, যেখানে কর্মবিহীন ভাবে সময় অতিবাহিত করা অসম্ভব বলা হয়েছে, সেখানে বেদোক্ত যজ্ঞাদির প্রতি কর্ম-নির্দেশ ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং 'জীবনের নিয়ম' রূপেই তা উদ্দেশ্য-কৃত। বঙ্কিম এই কর্মতত্ত্বকেই জীবনের নিয়মরূপে বিস্তৃত করেছেন; ধর্মের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একে সংযুক্ত করে বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে, গীতায় প্রচারিত কর্মের লক্ষ্য হল ঈশ্বর, যিনি জগৎকে ছাড়িয়ে নন, সমস্ত সৃষ্টিতে তা পরিব্যাপ্ত।[১৮] অন্যভাবে বলতে গেলে গীতার কর্মবাদ হল সমস্ত সৃষ্টির প্রতি সেবা, উপাসনা পদ্ধতি গৌণ দিক।[১৯]

বঙ্কিমের কর্মতত্ত্বের এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দু চিন্তায় যে বিপ্লব এসেছিল, তা বুঝতে হলে বঙ্কিমের কর্মতত্ত্বের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কর্মতত্ত্বের আলোচনা করতে হয়। যেন বঙ্কিমকে অনুসরণ করেই মহাত্মা গান্ধী বলছেন, "আমি গীতার তৃতীয় অধ্যায়কে গীতা বুঝবার চাবিস্বরূপ বলে মনে করি। এই অধ্যায়ের সার কথা আমি বুঝি, জীবন সেবার জন্য, ভোগের জন্য নয়।"[২০]

আবার "সাধারণভাবে ভক্তের প্রচলিত ধারণা হচ্ছে তিনি একজন অলস ব্যক্তি, যিনি শুধু মালা জপেন...মাত্র খাদ্য গ্রহণের জন্যই তিনি জপমালা থেকে হাত তোলেন। তিনি কোন কাজ করতে কিংবা দরিদ্রকে সাহায্য করতে চান না। কিন্তু গীতা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছে, 'কর্মছাড়া সাফল্য (ধর্মে) লাভ হয় না।"[২১]

বঙ্কিমের কর্মতত্ত্বের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর তত্ত্বের মিল নিখুঁত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে মহাত্মা গান্ধী কোথা থেকে তাঁর গীতা তত্ত্ব আহরণ করেছিলেন? এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অবাস্তব নয় যে, বঙ্কিমের কাছ থেকেই মহাত্মা গান্ধী এই তত্ত্ব পেয়েছিলেন। হয়তো পেয়েছিলেন, কিন্তু এর কোন স্বাক্ষ্য প্রমাণ নেই। তিলকের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী তাঁর তত্ত্ব পেয়ে থাকতে পারেন। আর তিলক?

কেশবচন্দ্রের সময় থেকেই বাঙলার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভাবগত আদান-প্রদান চলছিল এবং সকলেই জানেন যে, বঙ্কিমের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হবার পর পরই বাঙলার ইংরেজী শিক্ষিত লোকেদের মনে গীতা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।[২২] বাঙলার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভাবগত আদান-প্রদানের ফল হিসাবেই মহারাষ্ট্র গীতা সম্পর্কে আগ্রহ এবং কর্ম সম্পর্কে মতবাদ প্রচারিত হয়ে থাকতে পারে।[২৩] কিন্তু এসব প্রমাণ শেষ কথা নয়। তিলক, অরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর মত বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারগণের উপর বঙ্কিমের প্রভাব যাই-ই পড়ে থাক না কেন, এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বঙ্কিমই প্রথম ব্যক্তি যিনি কর্মকে একটি গ্রহণযোগ্য ধারণায় ব্যাখ্যা করেছেন।

(ঙ) ভক্তি সম্পর্কে নতুন ধারণা

আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অন্যান্য সকল বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী বৃত্তি হিসাবে ভক্তিবৃত্তির নতুন মানবতাবাদী ধারণা যাকে বাঙলার ধর্মীয় চিন্তা জগতে বঙ্কিমের সবচেয়ে মৌলিক অবদান বলে মনে করা হয়—ভক্তির সেই নতুন ধারণার উৎস রয়েছে গীতার শ্লোকের মধ্যেই। বঙ্কিম সেই বিশেষ শ্লোককে (৩।৩০) উদ্ধৃত করেছেন; সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সমস্ত কর্ম নিবেদন করতে বলেছেন ঈশ্বরের কাছে। গীতা কেবলমাত্র পরকালের কাজকে নির্দেশ করেনি, বরং সমস্ত কাজকেই, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কর্মকেও নির্দেশ করেছে। অন্যত্র, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেবলমাত্র তার কর্ম উৎসর্গ করতে বলেন নি, খাদ্য গ্রহণ থেকে ভিক্ষাদান পর্যন্ত সমস্ত মানবিক প্রচেষ্টাকেও উৎসর্গ করতে বলেছেন।[২৪] এই ইঙ্গিত থেকেই বঙ্কিম তাঁর ভক্তি-তত্ত্বে পৌঁছে থাকবেন, যেখানে দেশসেবা উপাসনারই রূপভেদ মাত্র। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্কিমের এই তত্ত্বের প্রভাব ছিল অপরিসীম। স্বদেশী আন্দোলনে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যদিও যুবমানসে এর তাত্ত্বিক বিকৃতি এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যাতিরেকে ইংরেজ হত্যাও উপাসনা। আমরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই বিকৃতির কারণ আলোচনা করব, তবু প্রসঙ্গক্রমে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এ-তত্ত্ব সঠিকভাবে ফুটে উঠেছিল। বঙ্কিম এখানেও ছিলেন অগ্রদূত।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. Charls Robert Darwin : Origin of Species, 1859.
২. The Life and Letters of Raja Rammohun Roy : Sophia Dobson Collet, edited by D. K. Biswas, 1962, pp. 109-110.
৩. Prem Sunder Basu : Life and works of Brahmananda Keshav, p.16.
৪. ঐ, পৃষ্ঠা ১৬।
৫. বঙ্কিম রচনাবলীর সাহিত্য সংসদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯১-৯২ (কোন পথে যাইতেছি ?)
৬. ঐ, পৃ. ২৭৩ (ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে ?)।
৭. ঐ, (দেবতাতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম)।
৮. বঙ্কিমচন্দ্র : ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়।
৯. শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা, ২/৬৪ শ্লোক।
১০. বঙ্কিমচন্দ্র : ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায়।
১১. ঐ : ধর্মতত্ত্ব।
১২. ঐ, একবিংশতি অধ্যায়।
১৩. পঞ্চম অধ্যায়ে বঙ্কিমের উপর অগস্ত কোঁতের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

'কেন্দ্রীয় শক্তি' (rallying Point) কথাটি কোঁৎ ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব'র "ক্রোড়পত্র খ" ও দ্রষ্টব্য।

১৪. বঙ্কিমচন্দ্র : ধর্মতত্ত্ব, একবিংশতিতম অধ্যায়।

১৫. ঐ : ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায়।

১৬. শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা : বঙ্কিমের ব্যাখ্যা ২/৪৭।

১৭. ঐ, ব্যাখ্যা ৩/২১ শ্লোক

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

(যে যে কর্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেরাও তাহাই করে। তাঁহারা যা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়)

১৮. শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা : বঙ্কিমের ব্যাখ্যা ২/৪৭। ধর্মতত্ত্বের চতুর্দশ অধ্যায়েও আছে।

১৯. বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব, বিংশতিতম অধ্যায় :

গুরু : আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্মতৎপর হও।

শিষ্য : সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ -

গুরু : সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম নহে; এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কর্ম--সাধকের নিজের কার্য্য; ভক্তি বৃদ্ধির জন্যও যদি এ সকল কর, তথাপি তোমার নিজের জন্যই হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্মই কৃষ্ণোক্ত 'সৎকর্ম'।

২০. Gandhi, M. K. : Gitabodh, chapter 3.

২১. Gandhi, M. K. : Preface to Anasakti Yoga : commentary on the Gita, p. 21.

২২. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর বার বৎসর পরে (১৯০৬) লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যখন গীতার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন তখন ইংরেজী শিক্ষিত মহলে গীতার পাঠাভ্যাস ছিল না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা দানে গীতা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'চরিতকথা'।

২৩. নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে ('আমার জীবন') আশির দশকে কলকাতায় 'গীতা' সম্পর্কে ঔৎসুক্যের বিবরণ দিয়েছেন। বঙ্কিমের প্রভাবই কলকাতার গীতা সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করে। 'আমার জীবন'।

২৪. শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা : ৯।২৭-২৮।

৫

ব্রাহ্ম প্রতিক্রিয়া

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রচেষ্টায় বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের মনের উপর ব্রাহ্মবাদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়; নব্যহিন্দু আন্দোলনই যে ব্রাহ্মবাদের এই প্রতিপত্তি হ্রাসের অন্যতম কারণ তা জোর দিয়ে বলা দরকার কারণ ব্রাহ্ম ঐতিহাসিকেরা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী নাস্তিক দলভুক্ত ঐতিহাসিকেরাও ব্রাহ্মবাদের প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণ খুঁজেছেন পুনরুজ্জীবনবাদের উত্থানে। পুনরুজ্জীবনবাদ তাঁদের কাছে একই সঙ্গে বহুমুখী ধারণার বহিঃপ্রকাশ, যার মধ্যে তাঁরা অপ্রকৃত যুক্তিবাদী শশধর, থিওসোফিস্ট অ্যানি বেসান্ত, মানবতাবাদী যুক্তিবাদী বঙ্কিম, নব্য বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ ইত্যাদির মত বিপরীতমুখী বিশ্বাস ও আচরণের অনুসরণকারী গোষ্ঠীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বঙ্কিমের বিরুদ্ধে তাঁরা পুনরুজ্জীবনবাদের অভিযোগ তোলেন নি, বরং উল্টে বঙ্কিমকে বলেছেন অগষ্ট কোঁতের (Auguste Conte) দলভুক্ত নাস্তিক। বিবেকানন্দের তত্ত্বকে আক্রমণের সাহস তাঁরা পাননি, তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁর চরিত্রহনন করতে।[১] অবশ্য ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই এই অপপ্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের চরিত্রে যিনি সবচেয়ে অধিক কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করেছেন তিনি হলেন কেশবচন্দ্রের জীবনী রচয়িতা এবং কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম সংঘের প্রধান প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার। শিবনাথ শাস্ত্রীও বাঙলার নবজাগরণের উপর লেখা তাঁর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'-এ বলতে চেয়েছেন যে তাঁর পূর্বতন আধ্যাত্মিক গুরু কেশবচন্দ্র এবং তাঁর (শিবনাথ শাস্ত্রীর) আত্মীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চেয়ে চারিত্রিক উৎকর্ষে বঙ্কিম ন্যূন ছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বঙ্কিমের ন্যূনতার কোন প্রমাণ শিবনাথ উল্লেখ করেন নি। স্পষ্টতই, নব-

প্রজন্মের উপর নিজেদের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ হিসাবে ব্রাহ্মরা মরিয়া হয়ে এমন একটা কিছু খুঁজছিলেন যার উপর দোষটা চাপিয়ে দেওয়া যায়। একটি মত এই যে, কিছুটা অনৈতিক পথে, ব্রাহ্ম প্রভাব হ্রাসের জন্য বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দই দায়ী। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু এর বিপরীত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হবার পর থেকেই, অর্থাৎ হিন্দু সমাজ থেকে নিজেদেরকে পৃথক করার পর থেকেই ব্রাহ্মধর্ম স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ে। বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দের তত্ত্বগুলি ব্রাহ্মবাদের বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে নস্যাৎ করে দেয় এবং ব্রাহ্মবাদকে প্রচণ্ডভাবে দুর্বল করে ফেলে, অন্যদিকে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের উপর আক্রমণগুলো এক অর্থে ব্রাহ্মবাদকেই প্রত্যাঘাত করে এবং ব্রাহ্মবাদের পতনকেই ত্বরান্বিত করে দেয়। আমরা সংক্ষেপে বঙ্কিমের উপর কয়েকটি আক্রমণের বর্ণনা দিচ্ছি।

(ক) বঙ্কিমের উপর আক্রমণ

রামমোহনের সময় থেকেই ব্রাহ্মমত ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে গোঁড়া হিন্দু ধর্মমতের বিরোধ চলছিল। অন্যদিকে রামমোহন থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়কালে ব্রাহ্ম আন্দোলনেরও উত্তরোত্তর তাত্ত্বিক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল; এই পরিবর্তনের মূল বিষয় ছিল বেদ ও উপনিষদের একেশ্বরবাদ এবং পৌরাণিক ধর্ম ও প্রতিমা পূজার আচার অনুষ্ঠানের উপর আক্রমণ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ব্রাহ্মধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল কেশবচন্দ্র প্রচারিত 'স্বজ্ঞাবাদ' এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'। বঙ্কিম প্রচারিত ধর্মের 'নৈসর্গিক' ও 'ভৌত' ভিত্তিই ব্রাহ্মদের শঙ্কিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বঙ্কিমের মত প্রচারিত হতে থাকলে আদি ব্রাহ্ম-সমাজবাদীরা তৎক্ষণাৎ বঙ্কিমের প্রতিবাদ করেন। অন্যান্য ব্রাহ্ম গোষ্ঠীগুলোর তো কথাই নেই, এমনকি গোঁড়া হিন্দুরাও বঙ্কিমের ব্যাখ্যাকে স্বাগত জানাননি। জাতীয় মহিমা ফিরিয়ে আনা ও সংস্কার বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণের নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলছিল, তাঁদের সংস্কার পদ্ধতি উগ্র ছিল না। তাঁরা মনযোগী ছিলেন বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ প্রচারে ও পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটনে, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তাদের অনুসৃত ব্রাহ্মধর্মই প্রকৃত হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আলোকপ্রাপ্ত (enlightened) সমস্ত হিন্দুরই এই পথ অনুসরণ করা উচিত। তাঁদের মতে, নব্য সংস্কারবাদী এবং পুরানো রক্ষণশীল উভয়ই ভ্রান্ত। কোন অ-হিন্দু আচার অনুষ্ঠানে তাঁদের সমর্থন ছিল না। তাই, কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ বিবাহ প্রস্তাবে তাঁরা যেমন সমর্থন দেননি তেমনি বিদ্যা-

সাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকেও সমর্থন করেন নি। এসব সত্ত্বেও বঙ্কিমের মত নব্য-হিন্দু চিন্তাবিদ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সত্য হিন্দু ধর্ম-রক্ষক ও এর অনুসরণকারী হবার দাবিকে স্বীকার করেননি। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' শীর্ষক রচনা সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম গ্রন্থকারের অজস্র প্রশংসা করেছেন, কিন্তু রাজনারায়ণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। স্পষ্টতঃ ব্রাহ্মদের প্রচারিত বেদান্তের একেশ্বরবাদকে বঙ্কিম হিন্দুধর্মের সারবস্তু বলে মেনে নেন নি। ফলে স্বভাবতঃই নব্য-হিন্দু চিন্তাবিদ্‌দের সঙ্গে আদি ব্রাহ্ম-সমাজীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বঙ্কিম কর্তৃক রাজনারায়ণের রচনার মূল্যায়নের প্রায় বার বছর পরে এই সংঘাতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'নবজীবন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "ধর্মজিজ্ঞাসা" নামে বঙ্কিমের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম স্পষ্টভাবেই ধর্মের মানবতাবাদী সংজ্ঞার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং প্রত্যক্ষবাদের প্রতিষ্ঠাতা অগস্ত কোঁতের সংজ্ঞা[২] সমর্থন সহকারে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এইভাবেই 'প্রচার' পত্রিকায় "হিন্দুধর্ম" প্রবন্ধেও বঙ্কিম ধর্মের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে বলেছেন, একমাত্র সত্য ও সনাতন ধর্ম তাই-ই যা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছিলেন যা ব্রাহ্মদের উত্তেজিত করে—যদিও বাক্যটি আদৌ প্ররোচনামূলক ছিল না। বাক্যটি হল 'ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের একটি শাখা মাত্র, এবং এই ব্রাহ্মধর্ম এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ করছে না যাতে মনে হতে পারে যে ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম হিসেবে এই ধর্মমত গৃহীত হবে"।[৩]

এই বাক্যটি আদি ব্রাহ্মসমাজীদের এত ক্ষুব্ধ করে যে, তাঁরা বঙ্কিমের বিরুদ্ধে রীতিমত আক্রমণ শুরু করে দেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এতে অংশ নেন। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনা ছিল অত্যন্ত সংযত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্মের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সংশয় প্রকাশ করেন এবং যুক্তি দেখান যে, বঙ্কিমের মতানুযায়ী সুখের প্রসার ধর্মীয় সত্যের উপযুক্ত নির্ধারক নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বঙ্কিমকে নাস্তিক বলে অভিযুক্ত করেন এবং বলেন "বঙ্কিম বাবুর মতে ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বর ও পরলোকের কোন আবশ্যক সম্পর্ক নেই।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে নাস্তিকতার পরিচায়ক ভেবে ভুল করেছিলেন, এরজন্য অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ খুব বেশী দোষী ছিলেন না। 'নবজীবন' পত্রিকায় লেখা প্রথম কিস্তির উপর ভিত্তি করেই এটি তিনি লিখেছিলেন, ফলে বঙ্কিমের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ রূপটি তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ঐ একই সংখ্যায় (যে সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের

লেখা প্রকাশিত হয়) তৎকালীন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনা মোটেই সংযত ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাজনারায়ণ বসু সর্বান্তকরণে[৪] বঙ্কিম প্রস্তাবিত ধর্মের মানবতাবাদী নিত্তিক মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি দাবি করেছেন কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্মই এই পরীক্ষায় সফল হয়েছে। তিনি বঙ্কিমকে 'কোঁতের জঘন্য অনুসরণকারী' (এর বিকল্প একটি অর্থ কোঁতের জঘন্য মতগুলির অনুসরণকারী) বলে নিন্দা করেছেন এবং তাঁকে নাস্তিক বলেও অভিহিত করেছেন।

কিন্তু শীঘ্রই রাজনারায়ণ বসুর অনুসরণে 'নব্য ভারত' পত্রিকায় আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সহ-সম্পাদক কৈলাস চন্দ্র সিংহর লেখা প্রকাশিত হয়। কৈলাস চন্দ্র সিংহের প্রবন্ধটি কুৎসিত গালমন্দে ভরা। বঙ্কিমের ধর্মীয় মতকে তিনি সমালোচনা না করেও 'বঙ্গদর্শন', 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্কিমের রচনা উল্লেখে বঙ্কিমের ইতিহাস বিষয়ক রচনা 'বাঙলার কলঙ্ক'কে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। অবশ্য এই প্রবন্ধে বঙ্কিমের সঙ্গে কৈলাস চন্দ্রের ধর্মীয় শত্রুতার তীব্রতা চাপা থাকে নি। কৈলাস চন্দ্র সিংহের বিদ্বেষপূর্ণ রচনার তিক্ততা চরমে পৌঁছেছিল প্রবন্ধের উপসংহারে এসে, যেখানে তিনি বঙ্কিমকে সম্বোধন করে বলেছেন "হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর—কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেকস্মূলার, কানিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মুইর, ভাওদাজি, মেইর, মিত্র, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুম কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগিরি করিও না।"

কিন্তু সবচেয়ে তীব্রতম আক্রমণটি এসেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন তখনকার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। যে সব গোঁড়া হিন্দু শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেও প্রকৃত নৈতিকতার মানদণ্ডে নীতিজ্ঞান-শূন্য তাঁদের সঙ্গে যাঁরা শাস্ত্রীয় আচার ঠিকভাবে পালন না করেও নৈতিক দিক থেকে উৎকর্ষ তাঁদের তুলনা করতে গিয়ে বঙ্কিম 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'তিনি যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ, যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন'। স্পষ্টতঃ বঙ্কিমের এই উক্তিটি সত্য সম্পর্কে দ্ব্যর্থবোধক। রবীন্দ্র-নাথ বঙ্কিমের প্রস্তাবিত ধর্মকে আক্রমণ করার অজুহাত হিসেবে এই উক্তিকেই গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য-ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন কিন্তু অলক্ষ্যে

ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। আমদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন ?"

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা প্রকাশিত হবার পরই বঙ্কিম নীরবতা ভঙ্গ করে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করেন ;

(খ) বঙ্কিমের প্রত্যুত্তর

বঙ্কিম তাঁর চরিত্র ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপর সুতীব্র আক্রমণে এতটুকু ইন্ধন যোগান নি, স্বাভাবিকতা বশেই দুর্ভেদ্য মর্যাদায় শান্তি রক্ষা করছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি যখন প্রকাশ্যে বঙ্কিমকে ধর্মের ভিত্তি ধ্বংসকারী বলে আক্রমণ করলেন, তখন বঙ্কিম এর প্রত্যুত্তর দিতে মনস্থ করেন। বঙ্কিমের উত্তরটি ছিল আহত গর্ব, অকৃপণ স্নেহ ও উন্নতমনা উৎকণ্ঠার সংমিশ্রণ, যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে এড়ানো যায়। এতে ছিল কৈলাশচন্দ্র সিংহের মতো কুৎসাকারীর প্রতি অবজ্ঞা এবং রাজনারায়ণের মতো ধর্মোন্মাদের প্রতি পরিশীলিত ব্যঙ্গ। দ্বিজেন্দ্রনাথের সদয়চিত্ততা ও সংযমের জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানান, কিন্তু উল্লেখ করেন যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ যদি বঙ্কিমের চিন্তার পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন, তাহলে তাঁকে নাস্তিক বলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথকে তিনি জানান যে, সেই বাক্যটি কৃষ্ণের সঙ্গে সংপৃক্ত, যেখানে সত্যাচরণে প্রাণী হত্যার আশঙ্কা আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব এখানে নির্ভুলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন ;

"আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজকে বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এদেশে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষালাভ করিব এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই বা হইতে পারে না, যাহা

আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিবাদ বিসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে স্বতঃ বা পরতঃ প্রকাশ্যে বা পরোক্ষ বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহারা মন দেন না। আমি এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখনও এরূপ প্রতিবাদ করিব এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় অবশ্য করিবেন।"

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমের প্রত্যুত্তরে আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদের জবাব ছিল সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে অগ্রজ লেখকের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার কথা কৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করেছেন। একমাত্র বেসুরো ছিলেন কৈলাস চন্দ্র সিংহ। তিনি ক্রমান্বয়ে কুৎসাবর্ষনে মগ্ন ছিলেন। অবশ্য ধর্ম-চিন্তা ও সাহিত্যে কৈলাস চন্দ্র ছিলেন অখ্যাত ও অনুল্লেখ্যনীয় ব্যক্তি।

(গ) বঙ্কিমের উপর পশ্চিমী প্রভাবের সীমা

আমরা এস্থলে বঙ্কিমের ধর্মচিন্তায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কে একটি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি। রাজনারায়ণ বঙ্কিমকে 'কোঁতের জঘন্য অনুসরণকারী' বলে কটূক্তি করেছিলেন। রাজনারায়ণই সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি যিনি এরকম ভাষা ব্যবহার করে পরোক্ষ ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন যে, বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম 'প্রকৃত হিন্দুর' সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পাবার উপযুক্ত নয়। তাঁর মতে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম অনুসৃত মতবাদই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। পরবর্তীকালের বঙ্কিম নিন্দুকেরা রাজনারায়ণের চেয়েও কম অজুহাতে এই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) শিষ্য, কেউ কেউ বলেছেন না, মিল নন, অধুনা বিস্মৃত ব্রিটিশ প্রাবন্ধিক সিলীই (Seely) তার গুরু, অনেকে আবার তাঁর মানবতাবাদের বীজ খুঁজেছেন কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে। তাঁদের সমালোচনায় বঙ্কিম তাঁর হিন্দু পূর্বপুরুষদের শেষ চিহ্নটি ঝেড়ে ফেলার মতো উপযুক্ত পরিমাণে পশ্চিমী হয়ে উঠতে পারেন নি। এসব সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল এই সত্য দেখান যে বঙ্কিম কোন মৌলিক চিন্তাবিদ্ নন, তিনি তাঁর ইউরোপীয় প্রভুদের একজন অনুসরণকারী মাত্র।

বঙ্কিমের মানবতাবাদ যে গ্রীক আদর্শের কত কাছাকাছি আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে তা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু উপযোগবাদের কাছে বঙ্কিমের ঋণ কতখানি আমরা তা আলোচনা করিনি। সত্যের উপযোগবাদী পরীক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা বঙ্কিমকে বাধ্য করেছিল ঐ নীতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত

করতে; তাই ধর্ম উন্মোচনে তিনি উপযোগবাদের স্থান খুব পরিষ্কারভাবেই নির্দেশ করেছেন।

এই উপযোগবাদ আলোচনার পূর্বে বঙ্কিমের ধর্ম চিন্তায় কোঁতের প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

(১) প্রত্যক্ষবাদ ও বঙ্কিম

সম্ভবতঃ কোঁতই প্রথম দার্শনিক যিনি 'মানবতার ধর্ম' (Religion of Humanity) কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে একটি নাস্তিক্যবাদী নীতিকে বোঝানো যাতে খ্রীষ্ট অনুগামীদের পূজিত অতীন্দ্রিয় চেতনার বাহ্যিক ঈশ্বর (external God) এর জায়গায় মানবতা নামক বিমূর্ত্ত ধারণা উপাস্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মানবতাবাদ কখনোই ব্যক্তি সত্ত্বা নয়, এবং আমরা দেখেছি যে বঙ্কিমের ধর্মচিন্তার মূল কথা হল হিন্দুর কল্পিত ঈশ্বর অবশ্যই একটি ব্যক্তি সত্ত্বা, 'যিনি সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত'। এর ফলে তিনি একেশ্বরবাদের 'বাহ্যিক ঈশ্বর' তত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বকে আমরা 'ব্যক্তিগত সর্বেশ্বরবাদ' নামে অভিহিত করেছি, যা ব্যক্তি-ঈশ্বরের সমন্বয় ধারণা, অর্থাৎ যাকে প্রকৃত সর্বেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে— কোঁতের দর্শনে এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনটিই মেলে না। বঙ্কিম নিজেই প্রত্যক্ষবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন :

A Second answer (to the problem of religion) is that of Auguste Conte and his disciples. We know that the universe exists, and that it is governed by laws. Beyond these laws we know nothing and can know nothing; laws may be self-existent for ought we know. We do not know that they are otherwise··· This alone, strictly speaking, is atheism.

The Third answer seeks to reconcile the other two It grants that these may be a first cause, and it admits Nature and her laws, if not exactly to be self-existent, but what very nearly amounts to the same thing. Granted, there is a first cause, but why should we seek it beyond Nature ? It is impossible that the cause of the universe should be in itself ? God, it says, is in nature; and all phenomena his manifestations. This is pantheism."[৫]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে বঙ্কিমের

যদি কোন যোগাযোগ থাকে তবে তা সামান্যই।[৬] তাহলে প্রশ্ন জাগে বঙ্কিমের ধর্ম চিন্তায় কোঁতের প্রভাব কতটুকু? এবং রাজনারায়ণ বসুর ক্রুদ্ধ হবার কারণ কি? 'নবজীবন' পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধে যেখানে বঙ্কিম কোঁতের দেওয়া ধর্মের সংজ্ঞাকে সমর্থন করে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন আমরা যদি তা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে ধর্মীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে উভয় চিন্তাবিদের বৈশিষ্ট্য একই রকম। আলোচ্য সংজ্ঞাটি হল: "Religion, in itself, expresses the state of perfect 'unity' which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose." সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্য হল এটি যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী—এই দুই-ই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে যখন কোন আলোচনা শুরু হয় তখন তাকে বলে ধর্মমত (Theology), প্রকাশিত সত্য'র (revealed truth) উন্মোচনে এটি হলে তাকে বলে শাস্ত্রীয় (Scriptural)। বঙ্কিমের সঙ্গে এর কোনটিই মেলে না। তিনি কোঁতের মতো 'ব্যক্তি হিসাবে এবং সমাজে' মানুষের অস্তিত্বের যৌক্তিক ঐক্যের সন্ধানে আলোচনা শুরু করেছিলেন। সুখ সম্পর্কে তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাতেই এটি সুস্পষ্ট। তাঁর সুখের সংজ্ঞাতে আছে 'ব্যক্তিগত সুখ' ও 'মানুষের সেবা'। আবার কোঁতের মতো তিনি মানুষের স্বভাবের উপাদান, নৈতিক ও শারীরিক অংশগুলি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু কোঁতের মতো তিনি বিমূর্ত মানবতাবাদে এর ঝোঁক খোঁজেন নি, খুঁজেছিলেন এক 'ব্যক্তি, সর্বব্যাপী ঈশ্বরে'। অবশ্যই তাঁর এই মানুষের শারীরিক ও নৈতিক মিলনের ধারণা মোটেই কোঁতের অনুগামী নয়; একটি সামঞ্জস্যের মাধ্যমে মানবিক শক্তিগুলির পূর্ণবিকাশ মূলতঃ একটি গ্রীক তত্ত্ব।

ইতালীতে নবজাগরণের সময় থেকে ইউরোপের শিক্ষাচিন্তা প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে 'সংস্কৃতি' (culture) ধারণার মাধ্যমে, এবং এই সংস্কৃতির ধারণা হল একটি ভারসাম্যে মানবিক শক্তি সমূহের বিকাশশীলতার পরিণাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই 'সংস্কৃতি' তত্ত্বই ধর্মের পরিবর্তে সংস্থাপিত হচ্ছিল। ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold) এবং সিলীর মতো চিন্তাবিদের সম্মতি ছিল এতে। বঙ্কিম যেমন কোঁতের উল্লেখ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে আরনল্ড ও সিলী উভয়েরই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বঙ্কিম-নিন্দুকেরা লক্ষ্য করতে পারেননি যে ধর্মালোচনা প্রসঙ্গে এঁদের কাছে বঙ্কিমের ঋণের পরিমাণ গ্রীকদের কাছে তাঁর ঋণের অনুরূপ; গ্রীকদের নিকট তাঁর ঋণও 'বৃত্তিসমূহের বিকাশ' এবং 'সামঞ্জস্য' ধারণার বেশী সম্প্রসারিত হয়নি। এবং 'মানবিক বৃত্তির' শ্রেণীভাগ কিংবা এই বৃত্তিগুলির বিকাশ

সম্পর্কিত ধারণায় তিনি যে কোন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ, প্রাচীন কিংবা আধুনিক, কাউকেও অনুসরণ করেননি, বঙ্কিমের 'কার্যকারিণী বৃত্তি'র বর্ণনা, যার মধ্যে 'ভক্তি-বৃত্তিকে' বঙ্কিম প্রধান বলেছেন, সে বৃত্তি সম্পর্কে পশ্চিমী চিন্তাবিদেরা আদৌ আলোচনা করেন নি, এমন কি বিশুদ্ধ মানবিক আকারেও, যেমন 'পিতামাতার প্রতি ভক্তি' গুরুত্বপূর্ণভাবে এর আলোচনা করেন নি। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মানবতাবাদ বঙ্কিমের কাছে ধর্মের প্রবেশ পথ মাত্র। তাঁর পূর্বের পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ (এবং আজ অবধি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ)-দের কাছে এটা যেমন স্বয়ম্ভর নীতি ছিল, বঙ্কিমের কাছে তা নয়। বৃত্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশ বঙ্কিম চেয়েছিলেন একটা সামঞ্জস্যের অবস্থায় 'বক্তি সত্তা'র প্রতি 'ভক্তি'তে; যে ব্যক্তিসত্তা সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। বঙ্কিমের ধর্ম চিন্তার[৭] এই ছিল সারবস্তু এবং এর জন্য তিনি কোন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের কাছে ঋণী ছিলেন না।

(২) উপযোগবাদ

সুতরাং একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে প্রত্যক্ষবাদ এবং কোঁতের নিকট বঙ্কিমের ঋণ ছিল সামান্যই। কিন্তু উপযোগবাদের কাছে তাঁর ঋণ ছিল প্রচুর; হিন্দু চিন্তায় শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রকৃতপক্ষে তিনি এই নীতি ব্যবহার করেছেন। যে সামাজিক অনুশাসন দুর্দশাগ্রস্থ তস্করকে শাস্তি দেয় 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিম সেই সামাজিক অনুশাসনকে সমর্থন করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি সমালোচনাতীত প্রেমনীতি প্রয়োগের বিরোধীতা করেছেন। এই অনুশাসনের ভিত্তি 'সবচেয়ে বেশী সংখ্যার জন্য সবচেয়ে ভাল'[৮]-র নীতি। বঙ্কিমের মতানুযায়ী এই নীতি প্রেম বৃত্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন এবং এই নীতি সমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গলের প্রতি অবজ্ঞাকারী সমালোচনাতীত প্রেমবৃত্তিকে পরিহার করে। বস্তুতঃ এটি ভক্তিরই একটি অংশ, কারণ ব্যক্তি ও সমাজকে রক্ষা করে' এটি ঈশ্বরের সৃষ্টিকে রক্ষা করে বলে এর প্রয়োগ প্রয়োজনীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উপযোগবাদী পরীক্ষা ধর্মের একটি অংশ মাত্র, খুবই ক্ষুদ্র অংশ এবং কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ কর্মপন্থাটি ঠিক তা বেছে নেওয়ার জন্যই এটি নিরূপিত। বঙ্কিম নিজেই তাঁর ধর্ম-চিন্তায় উপযোগবাদের স্থান নির্ধারণ করেছেন : "Utilitarians make the mistake of supposing that the whole field of religion is included within their doctrine. Actually, it occupies only a very small part of that field. The place I assign to covers no more than the part of a corner in the whole field spanned by my discourse." বঙ্কিমের ধর্মচিন্তায় উপযোগবাদের স্থান নির্ণয়ে বঙ্কিমের নিজের কথাই সবচেয়ে বেশী প্রামাণ্য।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. Basu, Sankari Prasad (edited), Vivekananda in Indian Newspapers (1893-1902) : pp. 30-1, 274-55 (The Indian Mirror), 355-6 (The Indian Nation).
২. পরবর্তী অধ্যায়ে সংজ্ঞাটির বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
৩. হিন্দুধর্ম (প্রচার)।
৪. 'নবজীবন' পত্রিকার অনুসারী 'প্রচারে' একজন লেখক লিখেছেন, 'একজন মানুষের প্রকৃত বিকাশ—তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশের সহায়তা যা করে তাই-ই ধর্ম। আমরা সর্বান্তকরণে একে সমর্থন করি। বঙ্কিম জীবনীতে উক্ত : সচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৫. বঙ্কিম রচনাবলী : Letters on Hinduism : সংসদ, পৃঃ ৬৭।
৬. R. S. Sharma (edited), Indian Society : Historical Probings (in memory of D. D. Kosambi). Sabyasachi Bhattacharya : Positivism in 19th C. Bengal. এই প্রবন্ধে বঙ্কিমের প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে তাঁর ধর্ম দর্শনের পার্থক্য সূচিত করা হয়নি।
৭. ঐ, Chapter IV।
৮. ধর্মতত্ত্ব : অধ্যায় ২২।

৬

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও নব্য সমন্বয়

আমরা এই অধ্যায়ে নব্য হিন্দু আন্দোলনের একটি অন্যতম ধারা, ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ বিষয়ে আলোচনা করব। বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়েই এই ধারার সূত্রপাত।

কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভাকাঙ্ক্ষার প্রয়াস সুস্পষ্ট। বঙ্কিমের হিন্দু-ধর্ম ব্যাখ্যায় বিষয়টি আপাত অনুদ্ঘাটিত এবং কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম-উন্মাদনার সঙ্গেও এর যোগ নেই। কিন্তু একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে, বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা কেবল বুদ্ধিচর্চা মাত্র। তাঁর যুক্তিবাদী পদ্ধতিতে জ্ঞানচর্চার বিজয় ঘোষিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ কঠোর যুক্তিতাড়িত, বরং তাঁর যুক্তির মধ্যেও মারাত্মক ও অপ্রত্যাশিত ফাঁক থেকে গেছে। বঙ্কিমের ধরণ অনুযায়ী যদি আমরা স্বীকারও করি যে, তাঁর ঈশ্বর একেশ্বরবাদী ধারণার বাহ্যিক ঈশ্বর নন, মানবিক সম্ভাব্যতার পরকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী সর্বব্যাপী ব্যক্তি সত্বাই ঈশ্বর, তবু মানবতাবাদী আলোচনার মাঝখানে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করা যৌক্তিক দিক থেকে অপ্রত্যাশিত। বঙ্কিম কিন্তু তাই-ই করেছেন। আর যুক্তির লৌহ কঠিন শাসনকে মানতে ব্যর্থ হয়েই তিনি তাঁর রচনাকে প্রাণহীন নিছক বুদ্ধিচর্চার অবনমন থেকে রক্ষা করতে সফল হয়েছেন। তিনি জ্ঞানকে থামিয়েছেন সার্বিক দৃষ্টির কাছে, আর এখানেই রয়েছে ব্যক্তিগত আহ্বান—সব মিলিয়ে তিনি হয়েউঠেছেন প্রকৃত যুগপুরুষ। তিনিও আধ্যাত্মিক অন্বেষক, তত্ত্ববাদী মাত্র নন। তিনি মনে করেছেন, ক্ল্যাসিক্যাল ও রেঁনেসা ধারণার যে মানবতাবাদ—একজনের শক্তির পূর্ণ বিকাশের উপর জোর দিয়ে এবং তার নিজস্ব সত্বার সীমার মধ্যে সামঞ্জস্য সন্ধান—সেখানে সুখ নেই, সুখ হল 'জীবনমুক্ত'। বঙ্কিমের এই বোধ যুক্তিবাদ থেকে

আসেনি। বঙ্কিম ভক্তিবাদের উপর জোর দিয়েছেন; তাঁর ভক্তিবাদের ভিত্তি সমস্ত মানবিক বৃত্তিগুলির ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পরিচালনা এবং ভক্তির মাধ্যমেই এই-সব মানবিক বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য বিধান। বঙ্কিমের এই ভক্তিবাদ একটা বিরাট ধর্মীয় আবিষ্কার; জীবনব্যাপী আধ্যাত্মিক অন্বেষাকে বাদ দিলে এর কোন অর্থ থাকে না, বস্তুতঃ, আধ্যাত্মিক অন্বেষার পটভূমিকাতেই এটি স্পষ্ট। ধর্মের যুক্তি-বাদী ব্যাখ্যা দেবার সময়েও বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে মোক্ষলাভের পথ নির্দেশ করেছেন, কিন্তু মোক্ষলাভ ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে সৃষ্ট হয় না। বঙ্কিম নিজেও তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, 'অনুশীলনতত্ত্বে' গুরু তাঁর শিষ্যকে বলেছেন,

"যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলোই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। এই কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিলেই বুঝিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা কিছু-মাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস, মাস, বৎসর, বৎসর এই তত্ত্বের চিন্তা করিও। কার্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। একজন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সৎ শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক হইবে"।[১]

ছদ্মবেশ ধারণের সামান্যতম প্রচেষ্টা না করেই বঙ্কিম এখানে নিজে গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং আরো মহৎ স্বীকারোক্তির উপর ঝুঁকে পড়েছেন, "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব'? 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। এই পরিশ্রম এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 'জীবন লইয়া কি করিব' এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ"।[২]

উল্লেখিত রচনাংশ পাঠ করার সময় একজন পাঠক নিশ্চয় অনুভব করবেন যে,

বঙ্কিম সেখানে এক ধরনের মোক্ষলাভের কথাই বলেছেন, যদিও এই মোক্ষ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীদের প্রচারিত মোক্ষতত্ত্বের থেকে ভিন্ন ধরনের। বঙ্কিমের মোক্ষলাভ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে মানবিক। এই মোক্ষলাভ ঘটে মানবিক কষ্ট ও কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে, যেখানে অসীম যন্ত্রণা ও কর্ম স্ব-ইচ্ছার উদ্দেশ্যকে সরিয়ে দেয় এবং সমস্ত যন্ত্রণা ও কষ্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। রচনাটি অনেকাংশে কাব্যিক কিন্তু তবুও ঈশ্বরে লীন হওয়ার অতীন্দ্রিয়গন্ধী কাব্যিকতায় এটি জর্জরিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দের মোক্ষলাভের অন্বেষাকে বুঝতে গেলে বঙ্কিমের ঐ অনুভবকে স্মরণ রাখতে হবে, যদিও বিবেকানন্দের ঈশ্বরে মিলিত হওয়ার অতীন্দ্রিয়বাদী অন্বেষা নিঃসন্দেহে অন্য ধরনের।

(ক) বিবেকানন্দের অন্তর্জীবন

এত অসংখ্যবার বিভিন্নরূপে বিবেকানন্দ আলোচিত হয়েছেন যে তাঁর অনালোচিত অথচ উল্লেখযোগ্য দিকটি নির্দেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তবু স্পষ্ট যে, কোন লেখকই বিবেকানন্দের জীবনের উদ্দেশ্যকে হিন্দুধর্মের নবতম বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন আলোচনায় ব্যাখ্যাত করেন নি। বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম নিশ্চিতরূপেই শশধর তর্কচূড়ামণি কিংবা গোঁড়া প্রচারকদের স্বধর্মী নয়। তাছাড়া বিবেকানন্দের ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপলব্ধি করাও কঠিন কারণ, বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের কোন একক দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেন নি, বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ থেকে পৌরাণিক বহুদেববাদ পর্যন্ত আস্তিকতার গোটা পর্যায়ই বিবেকানন্দের প্রচারের বিষয় হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই সূত্র-সন্ধানের প্রয়োজন দেখা দেয়, যে সূত্র ধরে বিবেকানন্দকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দাঁড় করান যায়; এবং তিনি যে শুধুমাত্র প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রচারক ছিলেন না, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরাজী শিক্ষিতদের কাছে তাঁর অসম্ভব আকর্ষণকেও ব্যাখ্যা করা যায়। সে সূত্রটি মিলবে তাঁর পূর্বের অন্বেষকদের পথে না গিয়ে, চিরায়ত সন্ন্যাস জীবনের অনুসরণ থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে বিবেকানন্দ তাঁর আত্মিক মুক্তিলাভের নূতন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, সে ব্যঞ্জনার প্রশান্তি কোন ঋষিকল্প চিন্তায় নির্দেশিত হয় নি, বিস্ময়কর উদ্যম ও অপান্ত অন্বেষা নিয়ে তিনি নিভৃত সুখের নীড় থেকে দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি ফেলেছেন। পরম নিভৃত সুখ একদা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর ক্ষণিক ধ্যানে, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় কর্ম-প্রেরিত হয়ে তিনি সে সুখকে বিসর্জন দিয়েছেন এমন এক অন্বেষায় যার সীমা নেই, শেষ নেই। ধর্ম থেকে যে নূতন বিষয়টি বিবেকানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন সেটি হল: ঈশ্বরের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় যোগাযোগের অন্বেষক ধারণাকে তিনি আর কোনরকমভাবেই বাহ্যিক বাধামুক্ত নির্জনে

আধ্যাত্মিক আচরণ বলে মনে করেন নি, তাঁর কাছে ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত হয়েছিল মানুষের জীবনের পরমার্থ সন্ধানের প্রচেষ্টারূপে, যে প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষ উপলব্ধি করবে কঠিনতম দুঃখকষ্ট ও মহত্তম আনন্দানুভূতি।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিবৃত ঘটনার কয়েকবছর আগে থেকেই এই অন্বেষণ কাহিনীর সূত্রপাত। ব্রাহ্মদের সঙ্গে বঙ্কিমের বিতর্ক শুরু হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং বঙ্কিমের ধর্মের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু বিবেকানন্দের ধর্মীয় জীবন শুরু হয় তারও আগে এবং বঙ্কিমের ধর্ম-ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে। তবু তাত্ত্বিকতা এবং সামাজিক প্রয়োগের দিক থেকে বিবেকানন্দের ধর্মীয় নির্দেশ বহুলাংশে বঙ্কিমের সমগোত্রীয়। আমরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে এর আলোচনায় দেখব যে বাঙলার জাতীয় জীবনে কয়েক দশক ধরে এঁদের উভয়ের ধারণা ও তার প্রয়োগরীতি অভিন্ন তাৎপর্য নিয়েই ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য ভুললে চলবে না, সন্ন্যাসী যেভাবে তাঁর প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌছান, বঙ্কিমের অনুসৃত পথ ছিল তার থেকে পৃথক। বঙ্কিমের ছিল পাণ্ডিত্য, বিবেকানন্দের সংগ্রহে ছিল অভিজ্ঞতা। কখন এবং কিভাবে সেই অভিজ্ঞতার পুষ্টি ও সঞ্চালন আমরা এখন তা দেখার চেষ্টা করব।

স্বামীজীর জীবনী রচয়িতাদের[৩] মতে ১৮৮০-১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ বিবেকানন্দের জীবনে তীব্র আধ্যাত্মিক অস্থিরতার বছর। কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে আলোচনা করার সময় আমরা ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য তাদের যে প্রচণ্ড আকাঙ্খা ও অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি বিবেকানন্দের জীবনে ঈশ্বর সান্নিধ্যের তৃষ্ণাও এসময় সমানভাবে চিত্তবিক্ষোপী। কিন্তু তাদের তৃষ্ণা ও আকাঙ্খার মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান, কারণ তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে বিবেকানন্দের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যতাই ছিল ভিন্নরকম। প্রথমতঃ, বিবেকানন্দের তারুণ্য ; ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স সতের বৎসর মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মানসিকতার দিক থেকে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, সম্পূর্ণ বহিঃমুখী মানসিক গঠনের আনন্দোচ্ছ্বল বোহেমিয়ানের মতো। গল্প শোনা যায় একজন ধনী ও সুন্দরী মহিলার মিতভাষণের যাদুতে তিনি তাঁর প্রতি ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং বেশ কিছুটা কষ্টেই তিনি সেই মহিলার প্রেমাকর্ষন মুক্ত হয়েছিলেন। অত্যাধিক পরিমাণে উন্নত দেহ-মনস্কতা নিয়েও তিনি দেহের দাবির ব্যতিক্রমী ছিলেন না ; অদম্য যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তার্থে তিনি একবার জ্বলন্ত কয়লার পিণ্ডও যৌনাঙ্গে প্রয়োগ করেন। ঘটনাটির তাৎপর্য শুধুমাত্র উপবাস কিংবা যৌন উত্তেজক খাদ্য পরিহার করে দেহের অদম্য দাবীকে শাসন করা নয়, বরং প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দিয়ে দেহকেও সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করার মানসিকতা কাজ করেছে এবং এই ঘটনা থেকে আমরা আগামী দিনের বিবেকানন্দকে দেখার একটা

ইঙ্গিতও পেয়ে যাই। আশ্চর্যের বিষয়, উপবাস এবং এর সগোত্র অন্যান্য আচরণ সম্পর্কে গান্ধীজীর মতো তিনি কখনো এদের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন নি, যদিও প্রত্যেক ধর্মাকাঙ্খীর কৌমার্যের নিখুঁত দাবীকে আপোষহীন ভাবেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কলকাতায় কলেজ ছাত্রদের সবরকম সামাজিক সংগঠনে তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি ছিলেন সংগীত বিলাসী, গানের আসরে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ আসরকে পূর্ণ করে তুলত এবং শ্রোতারা নির্বাক নিস্পন্দভাবে তাঁর গান শুনতেন। অর্থাৎ তরুণ নরেন্দ্রনাথের মানস-গঠনে অতীন্দ্রিয়বাদের সামান্যতম কণাও যুক্ত ছিল না।

স্পষ্টত : প্রথম জীবনে আধ্যাত্মিক অন্বেষা বিবেকানন্দের মনে স্থান পায়নি। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা এরই কাছাকাছি সময়ে নরেন যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেই শাখাটিতেই যোগ দেন যে শাখাটি কেশবচন্দ্র সেনের অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যান সম্পর্কে বক্তব্যের প্রতিবাদ হিসেবে গড়ে ওঠে। তাঁর একজন জীবনচরিতকার স্পষ্টতই বলেছেন যে, তিনি নববিধানপন্থীদের হর্ষোচ্ছ্বাস কিংবা কেশবচন্দ্র সেনকে 'পয়গম্বর' রূপে দাবী করার অত্যন্ত পাগলামীর কোনটাই সহজ-ভাবে মেনে নেন নি।[৪] মন্তব্যটির সত্যাসত্যে কিছুই আসে না, তবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নরেনের যোগদান থেকে প্রমাণিত হয়, ধর্মের প্রবল তাড়নায় নয়, সামাজিক সংস্কার মানসেই তাঁর আগ্রহ পরিচালিত হয়েছিল।[৫] ধর্মীয় আবেগ প্রবণতার কোন পূর্বসংকেত নরেনের মনে ছিল না। তিনি ক্রমশঃ চিত্রিত হচ্ছিলেন মিল্ ও স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদী ধারণার শিষ্যরূপেই। এমনকি কঠোর কৌমার্যের প্রতি তাঁর মনোভাব সম্ভবতঃ পরিচালিত হয়েছিল ধর্মীয় জীবন যাপনের প্রস্তুতিরূপে না হয়ে ইচ্ছা শক্তির সাধনায়।

১৮৮০-র দশকে নরেনের আত্মিক অস্থিরতাকে উপলব্ধি করতে হবে এই পট-ভূমিকাতেই। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে নরেন ও তাঁর গুরুর মধ্যে কী ভাব বিনিময় হয়েছিল সে সব বর্ণনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রত্যেক জীবনী-পাঠকই দেখতে পাবেন সন্দেহবাদী নরেন কীভাবে অদ্বৈত মতে পরাভূত হয়েছিলেন, কীভাবে তিনি মা কালীর কাছে আস্থা ন্যস্ত করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে সমাধিমগ্ন করিয়েছিলেন—যে সমাধিকে নরেন মনে করতেন সম্মোহনী যাদু বলে, এবং পরিশেষে নরেনের সবচেয়ে গূঢ় চিন্তার উত্তরে নরেনকে হতবুদ্ধি করে মৃত্যুশয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে পুরাকালের কথিত রাম ও কৃষ্ণের চিত্রনের মাধ্যমে অবতার বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিবেকানন্দ নিজেও পরবর্তীকালে এসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[৬] বিবেকানন্দের জীবনীরচয়িতাদের সকলেই এসব বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন : নরেন তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন অবিশ্বাসীরূপে কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছে অতীন্দ্রিয়বাদী অভিজ্ঞতা লাভ করার ফলেই তিনি শ্রেষ্ঠতম আস্তিকে উন্নীত হন।[৭] আমরা দেখব নরেনের পরবর্তী জীবন

অতিবাহিত হয়েছিল রামকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অলৌকিক অভিজ্ঞতার মানবিক ও সামাজিক রূপান্তরের সংগ্রামে।

এ সম্পর্কে যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে যে, রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় অতিমানবিক শ্রম ও যন্ত্রণাভোগের জীবন শুরু করে রামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথে অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভের অপ্রতিহত উদ্দেশ্যে নরেন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। রামকৃষ্ণ কথামৃতের রচয়িতা মহেন্দ্রলাল গুপ্ত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যাতে ঈশ্বরকে দর্শন করতে না পারায় নরেনের অসন্তুষ্টি ও হতাশা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহও ব্যক্ত হয়েছিল। স্পষ্টতই যতদিন না তিনি গুরুর মতো সমাধিলাভের কৌশলে অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন এবং ইচ্ছামত সমাধিমগ্ন হতে পারছেন ততদিন পর্যন্ত অলৌকিক উপলব্ধিকে তাঁর প্রজ্ঞা মেনে নিতে পারেনি। এর মাত্র দু'বছর পরে আমরা তাঁকে বারানসীর প্রমদা দাসমিত্রকে চিঠি লিখতে দেখি, তিনি চিঠিতে লিখেছেন, "ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে আমার বিশ্বাস যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। ...আমি আদর্শশাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চোখে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।" আরো একবছর পরে অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে আমরা দেখি তিনি গাজীপুরের পাওহারী বাবার শিষ্যত্বলাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন; তাঁর আশা যে, তাঁর প্রাক্তন গুরু যা শেখান নি পাওহারী বাবা তাহা-ই শেখাবেন অর্থাৎ এমন এক অখণ্ড ও দীর্ঘপ্রসারী অলৌকিক উপলব্ধি তিনি লাভ করতে পারবেন যা রামকৃষ্ণ শেখান নি। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং রামকৃষ্ণ আদর্শে স্বামী বিবেকানন্দরূপে পরিচিত হয়ে প্রতিবন্ধকহীন সমাধিমগ্নতার লক্ষ্য নিয়ে তিনি নিজেকে হিমালয়ে স্থানান্তরিত করেন। ধ্যান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা ভেঙ্গে যায়। বিবেকানন্দের ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ আসে। সংবাদটি বিবেকানন্দের কাছে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় এবং তিনি অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন। এরপর দু'বৎসর ধরে তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করলেন। তিনি সাক্ষাৎ করলেন রাজা মহারাজাদের সঙ্গে, বণিকদের সঙ্গে এবং এমন কি দরিদ্রতম যে জন তারও আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ভারত দর্শনে তিনি দেখলেন দেশের কী সীমাহীন দারিদ্র; দেশবাসীর দারিদ্র্যতায় তাঁর হৃদয় করুণ হয়ে উঠল। এ অভিজ্ঞতা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি এবং পরবর্তীকালে ভারত ও পাশ্চাত্যের দারিদ্র্যের তুলনা দিতে গিয়ে এর উল্লেখে ক্ষান্ত হন নি। পাশ্চাত্যের দারিদ্র তাঁর মনে হয়েছিল সামাজিক পাপ ও সমস্ত প্রকার নৈতিকতার অধঃপতন; কিন্তু ভারতের দরিদ্রতম অধিবাসীদের মধ্যেই রয়েছে আধ্যাত্মিকতার তাবৎ বড় বড় ভাণ্ডার। এটি একটি বিরাট আবিষ্কার এবং এই কঠোর বাস্তবতার তাৎপর্য বিবেকানন্দের

কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল কেবলমাত্র তাঁর নিজের ভগ্নীর মতো হাজার হাজার ভারতীয় নারীদের জীবন-চর্চার অভিজ্ঞতায়। এই নতুন উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর শিক্ষার এমন সব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেন, যাতে তাঁর জীবনধারাই সম্পূর্ণ বদলে যায়।

বিবেকানন্দের দেওয়া সে ব্যাখ্যায় যাবার আগে বিবেকানন্দের জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন। বাস্তবপক্ষে এই পরিবর্তন ছিল হিমালয়ের নির্জনতায় নৈরাশ্যজনকভাবে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র নিজের আত্মাকে প্রস্ফুটিত করার লক্ষ্যবিদ্ধ জীবন থেকে যোদ্ধাবেশে বজ্রগর্জন কণ্ঠে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করা, যে প্রচারের লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মের চিরন্তন সত্যকে প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র অবিশ্বাসী জগৎকে বৈদান্তিক আদর্শের সমান্তরালে নিয়ে আসা এবং পরিবর্তে ঐ অবিশ্বাসী জগতের কাছে ভারতের দরিদ্র দেশ-বাসীর জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে আহ্বান জানানো। বিবেকানন্দের জীবনী রচয়িতাগণ বিবেকানন্দের ভগ্নীর মৃত্যুর তাৎপর্য ব্যাখ্যার বিষয়ে নীরব। বাস্তবিকপক্ষে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে লিখেছেন, আর কখনো ফিরব না এই উদ্দেশ্যে বৎসরাধিকাল পূর্বে আমি হিমালয়ে যাত্রা করি। কিন্তু আমার ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ গিয়ে পৌঁছালে আমার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং শান্তিলাভের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। শান্তি আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু হৃদয়, ভক্তির আসন যেখানে, সেই হৃদয়ই আমাকে শান্তি খুঁজতে দিল না।[৮] এখানে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে বিবেকানন্দের আপন ভগ্নীর দুর্ভাগ্য শতগুণ বর্দ্ধিত হয়ে ভারতীয় নারীদের মধ্যে চিত্রিত হয়েছিল সে ভারতীয় নারীদের ভাগ্যও ছিল বিবেকানন্দের ভগ্নীর সমধর্মী ও অনন্য। এই নাটক আরো জমে ওঠে ভারতবাসীদের ভীতিকর অবস্থায়, বিবেকানন্দ যাঁদেরকে বলেছেন, 'অমৃতের সন্তান' (Children of Bliss)। 'এই হৃদয় দৌর্বল্যই আমাকে ভারতের বাইরে ছুটে আসতে প্ররোচিত করেছে তাদের সাহায্যের জন্য, যাদেরকে আমি ভালবাসি; আমি আজ তাই এখানে এসেছি'। আগের চিঠিতে বিবেকানন্দ এসব কথাও যোগ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতাকে লিখেছেন, জনসাধারণ আর নারীদের কথা কখনো ভুলো না। নির্জনে সন্ন্যাস জীবন থেকে যোদ্ধাবেশে উত্তরণের পটভূমিকা এই-ই।

এই উত্তরণকে আরো একটু গভীরভাবে দেখা যেতে পারে। বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য গমনের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্যকে প্রচার করা। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্র থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে আসে যে, তিনি চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্যকে পশ্চিমে প্রচারের বিনিময়ে পশ্চিমী দেশ থেকে অর্থসংগ্রহ করে দরিদ্র ভারতবাসীর হস্তে সেই অর্থের সমর্পম। 'ঠিক যেমন আমাদের দেশে সামাজিক

সততা অনুপস্থিত, তেমনি এখানে, এই আমেরিকায় আধ্যাত্মিকতার স্বাচ্ছন্দ্য নেই। আমি তাঁদেরকে দিচ্ছি আধ্যাত্মিকতা; তাঁরা দিচ্ছে অর্থ… আমার আমেরিকা আগমনের উদ্দেশ্য এই—নিজের প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করা এবং ভারতে ফিরে বাকী জীবন ভারতবাসীদের উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করা'। একটি পত্রে বিবেকানন্দ এভাবেই নিজেকে বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলেছেন, "ভক্তি, মুক্তি এ-সব কে চায়? শাস্ত্রে কি হবে? যদি আমি তমসা থেকে দেশবাসীকে জাগাতে পারি, তাদেরকে যদি নিজেদের পায়ে দাঁড় করাতে পারি, মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, স্বাচ্ছন্দ্যে হাজার বার নরকে যেতে রাজী আছি। আমি রামকৃষ্ণ বা অন্য কারো শিষ্য নই, আমি তারই অনুসরণ করি যে আমার পরিকল্পনাকে রূপ দেয়।" হিমালয়ের নির্জনতায় আত্মিক দীপনলাভের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে নারী ও দেশবাসীর জন্য এ ধরনের উক্তিই বিবেকানন্দের মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল।

নারী ও জনসাধারণের জন্য সংগ্রামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আত্মার প্রস্ফুটনে অন্বেষক বিবেকানন্দের সম্পর্ক উদ্ঘাটন করতে গেলে বিবেকানন্দের উপরোক্ত সদালাপকে পাশে রাখতে হবে। দ্বিতীয় বার আমেরিকা পরিভ্রমণকালে তিনি নিবেদিতাকে লিখেছেন, 'আমি কাজ করতে চাই না, আমি বিশ্রাম নিতে চাই, শান্তি পেতে চাই …কিন্তু মনে হয় কর্ম-নিয়তিই' আমাকে কাজের পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা কসাইখানায় টেনে নিয়ে যাওয়া জন্তুর মতো চাবুকের নিচে দিয়ে যেতে যেতে খুব দ্রুত রাস্তার দুপাশ থেকে ঘাস খুঁটে নিচ্ছি।[৯] কয়েক দিন পরে মিস্ ম্যাকলেওড্‌কে লিখেছেন, 'জো, আসলে আমিই একমাত্র বালক যে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী গাছের নিচে বসে অভিভূত হয়ে রামকৃষ্ণের অদ্ভূত সব কথা শুনত। আমার স্বভাবই তাই; কাজকর্ম ও ভালো করা এ সবই চাপানো … আমার জীবনের সবচেয়ে মধুর মুহূর্ত ছিল তখন যখন আমি ধর্মচিন্তায় ভেসে বেড়াতাম। আমার কাজের পিছনে উচ্চাশা ছিল, ভালবাসার গভীরে ছিল ব্যক্তিত্ব, পবিত্রতার মধ্যে ছিল ভয়, আমার চালিকা ছিল ক্ষমতার প্রতি মোহ। এখন সে সব অপসৃত হয়েছে, এখন আমি আবার ভেসে বেড়াচ্ছি'।[১০] মেরী হেলকে লিখেছেন, "আমার স্বভাব হল পণ্ডিতের অবসর। আমি কখনো তা পাই নি"।[১১] আবারও বলেছেন, "মেরী আমি এই জগতের জন্য করেছি, সারা জীবন, কিন্তু সেই জগৎ এক পাউণ্ড মাংস না নিয়ে আমাকে একখণ্ড রুটি দেয়নি…গর্ব যদি কেউ করতে পারে, সে আমি পেরেছি। এই পৃথিবী কী ভয়ানক, পাশবিক্ শবাগার। মানুষদের সাহায্যের কথা যে ভাবে সে মূর্খ"।[১২]

বিবেকানন্দের উপরোক্ত কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে হিমালয়ের সন্ন্যাস জীবন যাপন করার বাসনা থেকে নারী ও জনসাধারণের জন্য মুক্তিযোদ্ধারূপে বিবেকা-

নন্দের উত্তরণের মূল্য নির্ধারণ হয়েছিল ভয়াবহ; পরিণামে তাঁর অকাল প্রয়াণই ডেকে আনে। একদিকে হৃদয় দৌর্বল্য অর্থাৎ নারী ও জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গড়ন থেকে প্রাপ্ত উষ্ণতাবোধে একজন যোদ্ধার পেশার নির্দিষ্টতা, অন্যদিকে নিজস্ব আত্মার দীপনের জন্য রহস্যময়তার মুক্তির দাবী, যার সমাধানে তিনি ক্ষণিকমাত্র নিমজ্জিত হয়েই জেগে উঠেছিলেন—এই উভয়মুখী টানাপোড়েনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম তাঁকে স্থিরতা দেয় নি। বিবেকানন্দের জীবন চর্চায় এই দ্বান্দ্বিক যুদ্ধের ভয়াবহতা কত গভীর শিকড় প্রসারী তার উদাহরণ মিলবে চিকাগো বক্তৃতা থেকে তাঁর প্রয়ানলাভের সময় পর্যন্ত ঐ ন'বছরের সময় সীমায়। এই ন'বছর তাঁর কার্যাবলী প্রকৃতপক্ষে বহুবিধ মিশ্রণের সমাহার—ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিশ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে মানুষদেরকে তাঁর মতাদর্শে টেনে আনার জন্য বক্তৃতা দেওয়া, কখনো তাদের জীবনাদর্শের আঙ্গিক বৃত্তিকে নিন্দাবাদ করা এবং প্রবলভাবে তাকে খণ্ডন করা, কখনো বা তাদের মূর্চ্ছাগ্রস্ত হৃদয়ে আগ্রহের তীব্র বহ্নির প্রজ্জ্বলন—এক কথায় উন্মত্তের মতো নির্ধারিত কর্মের সিদ্ধি সাধন। এভাবে কঠোর পরিশ্রমে তিনি নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছিলেন যার পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ যখন একবার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন বিবেকানন্দকে লক্ষ্য করে বিবেকানন্দের এক আমেরিকাবাসী শিষ্য মন্তব্য করেছেন, "সে রাত্রে স্বামীকে যেমন দেখাচ্ছিল,পূর্বে সেরকম দেখিনি। এক অপার্থিব সৌন্দর্যে তিনি যেন মণ্ডিত, শক্তি যেন মাংস ভেদ করে বেরিয়ে পড়ছে; আমি তখনই তাঁর সমাপ্তির ছায়া দেখতে পেলাম। বর্ষব্যাপী অধিক পরিশ্রমে তিনি ক্লান্ত, এবং এমনকি বোঝা যাচ্ছে যে তিনি আর বেশীদিন পৃথিবীতে থাকবেন না। এ দৃশ্য থেকে চোখকে নিমীলিত করতে চেয়েছি, তবু হৃদয়ে সত্যকেই উপলব্ধি করলাম। তাঁর বিশ্রাম প্রয়োজন, কিন্তু তবু তিনি অগ্রসর হবেন-ই"।[১৩]

জনসাধারণের কাছে স্বামীজীর উপস্থিতির প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে একজন শিষ্য লিখেছেন, 'তিনি অপরের মনোযোগকে গেঁথে নিতে পারতেন, এবং যখন তিনি গভীর ভাবে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেন, বক্তব্য বিস্ময়কর যদিও, তাঁর শ্রোতাদের অনেকে আক্ষরিকভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে···আমি একটা ঘটনার কথা জানি, স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার ফলে এক ব্যক্তি স্নায়বিক আঘাতে তিন দিন বিছানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন"।[১৪]

এইসব বিবরণ থেকে বিবেকানন্দের অন্তর্দ্বন্দ্বের দুটো দিক বের হয়ে আসে। প্রথমটি অধিক পরিশ্রমে শরীরের ক্ষয়, কোন মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ শ্রম সহ্যাতীত ছিল ; দ্বিতীয়টি, তাঁর শরীর যত ভেঙ্গে পড়ে, অতিমানবিক ইচ্ছাশক্তিও তত বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, শক্তিকে দীপ্ত করার জন্য নরেন্দ্র যেন আবার দেহের অদৃশ্য দাবীকে ভর্ৎসনা করেছেন। নারী ও জনসাধা-

রণের জন্য সংগ্রামকে তিনি নিজের মধ্যে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুতঃ হিমালয়ের নির্জনতায় ধ্যান করার বিকল্প হিসাবেই তিনি তাঁর সংগ্রামকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন।

এ ধরনের সংগ্রামে, তিনি ভৌতিকরভাবে অস্বাভাবিক না হয়ে বরং নানাধরনের নারী ও পুরুষকে তাঁর আকর্ষণ ব্যূহের মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিলেন; ফলে বিবেকানন্দের প্রতি তাঁদের ভালবাসাও অসীম কোমলতায় রঞ্জিত হয়েছিল। তাঁর অনুরাগী লিখেছেন, "We saw him leave us with the fear that clutches the heart when a beloved, gifted, passionate child fares forth, unconscious, in an untired world"।[১৫] সিংহের মতো তেজোদীপ্ত হৃদয়বান বিবেকানন্দ সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু সর্বতঃ স্পষ্ট যে, কোন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকের প্রতি তাঁর বন্ধুবর্গের ধারণার স্বরূপতার সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর বন্ধুবর্গের ভালবাসার ধারণা মোটেই নিকটবর্তী নয়। প্রথমতঃ, তাঁর সিংহসদৃশ সাহসিকতা যে রকম ব্যতিক্রমী অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে জনমানস শ্রদ্ধার বদলে ভালবাসার স্নিগ্ধতায় তাঁর প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছে। তিনি আর সব চিরায়ত ধর্মপ্রচারকের মত ছিলেন না, তাঁর সাহসিকতায় বৈরাগ্য ছিল না, ছিল প্রচুর তারুণ্য ও সজীবতায় পূর্ণ। ইংলণ্ডে ভ্রমণকালে নিবেদিতা একটা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সে সময় বিবেকানন্দের সঙ্গী ছিলেন দুজন—তাঁদের একজন আবার ছিলেন মহিলা। পথে একটি ষাঁড় তাঁদের আক্রমণ করে। সঙ্গী ইংরেজ ভদ্রলোকটি পালিয়ে যান কিন্তু দৌড়ে পালাতে গিয়ে ভদ্রমহিলাটি পড়ে যান। বিবেকানন্দ তখন সেই ষাঁড় ও মহিলার মাঝখানে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়েন, ভদ্রমহিলা সে যাত্রা রক্ষা পান। বিবেকানন্দের জীবনে এমন ঘটনা বিরল নয়; সাহস ও সৌর্যের পরিচয়েই তিনি মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু যে কোমলতায় তিনি তাঁর অনুরাগীদের কাছে চিত্রিত হয়েছেন, এখানে সেটি স্পষ্ট নয়। তাঁর চিঠিপত্রে এর প্রচুর সাক্ষ্য বিদ্যমান। স্বামীজী লিখেছেন, 'মিষ্টার এবং মিসেস সোভিয়ার ঠাণ্ডায় আমাকে পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন, মায়ের চেয়েও বেশী সেবা শুশ্রূষা করেছেন, এবং তবুও আমার প্রতি আশীর্বাদই তাঁদের কাম্য ছিল'। বিবেকানন্দের জীবনী রচয়িতাদের কাছ থেকে জানা যায় যে বয়স্ক লোকেরা স্বামীজীকে যেমন একদিকে প্রভু বলে মনে করতেন তেমনি আবার অন্যদিকে একই সঙ্গে নিজের সন্তানের মতোই আদরযত্ন করতেন। মিসেস বুল এবং মিস্ যোসেফাইন আমাদের দেশে এসেছেন, ভ্রমণ করেছেন, আমাদের সঙ্গে বাস করেছেন,—কোন বিদেশী এ যাবৎ যা করেনি, এবং আমার বিলাসের জন্যও কটূক্তি করেন নি; আমি যদি ভালো খেতে ও দামী সিগারেট পান করতে ইচ্ছা করি তাঁরা কেবলমাত্র তখনই সবচেয়ে বেশী আনন্দিত

হবেন। এরকম ভালবাসা ও সহৃদয়তার ব্যাখ্যা একটাই : এর প্রেরণা ছিল বিবেকানন্দের অপ্রতিহত সংগ্রাম এবং নারী ও জনসাধারণের জন্য মহান আত্ম-ত্যাগ। এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা বিবেকানন্দকে 'অক্লান্ত পৃথিবীতে প্রিয় সন্তানের আগমন' (beloved child faring forth in an untired world) অভিধায় বিবৃত হতে দেখি। বিবেকানন্দের ধর্মীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমেরিকার অর্থ সাহায্যে ভারতবাসীর উন্নয়ন প্রকল্পের তুলনা দিয়ে ঐ লেখক তাঁর রচনাকে আরো দূরপ্রসারী করেছেন এবং আমাদের সন্দেহ মুক্ত করে দিয়েছেন যে, বিবেকানন্দের আন্তরিক উদ্দেশ্য বিবেকানন্দের চরিত্রকে এমন এক বিয়োগাত্মক সহনতা দিয়েছে যা ধর্মের নির্ভেজাল উদ্দেশ্য নিয়ে চালিত মানুষের কাছে অচিন্তনীয়। ঐ লেখক লিখেছেন 'তিনি সেইসব দেবতুল্য মানুষদের কথা বলতেন, যাঁরা একবার মাত্র দৃষ্টিপাতেই চরম পাপীকে রূপান্তরিত করেছেন এবং মানুষের অন্তরতম চিন্তাকেও বিশ্লেষণ করেছেন·· কিন্তু এসবই তুচ্ছ জিনিস ; তার চিন্তা সর্বদাই জনসাধারণের দিকে ধাবিত হত। তাদেরকে উন্নত করা এবং তাদেরকে যথাযোগ্য করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এত পথ পরিক্রমা করেছেন। তিনি কি যে চাইতেন আমরা জানি না ; অর্থ চাইতেন, যদি অর্থ তা পারে ; পরিশ্রম, উপদেশ, নূতন ধারণা এসবও চাইতেন এবং এ সবের জন্য আগামীকাল মারা যেতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন'।[১৬]

বিবেকানন্দের এই চারিত্রিক বিশ্লেষণে আর অধিক প্রয়োজন নেই, এর সার হল : বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক অস্থিরতা, যার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ছিল ধর্মীয় জীবন চর্চার মাধ্যমে আত্মানুভূতির আকাঙ্খা, সেই অস্থিরতার চরম পর্যায় যেমন অপ্রত্যা-শিত তেমনি দৃঢ়তায় বদ্ধমূল। ঈশ্বরের সঙ্গে অলৌকিক সংযোগে আত্মার দীপনের যে প্রচেষ্টা কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচেষ্টা পদ্ধতিই তার সর্বোত্তম। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণে-রই শিষ্য এবং তিনি তাঁর গুরুর মতবাদই পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেই আদর্শ ছিল 'ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই' ধর্মের প্রথম ও শেষ কথা। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্য চালিত না হলে ধর্মীয় আচার-আচরণ সবই মূল্যহীন— বিবেকানন্দের প্রচারের সারকথাও এই-ই। তবুও রামকৃষ্ণ আদর্শের সমাধিমগ্নতা তিনি চাননি এবং এমনকি হিমালয়ের নির্জনতায় ধ্যানভঙ্গ হবার পরও তিনি তা সম্পূর্ণ করেননি। তিনি যেন মানবতাবাদের বেদীতে মুক্তিলাভের জন্য নিজেকে উৎসর্গীকৃত করে আত্মার দীপনলাভের তত্ত্বকে সামাজিক রূপ দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি একটির জন্য অপরটিকে বিসর্জন দিয়েছেন, বরং করেছেন তার উল্টো। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অন্বেষণকারী ভবিষ্যতের সব সন্ন্যাসীদের জন্য সংকেত বাক্যটিকে তিনি একত্রে গ্রথিত করেছেন; সংকেত বাক্যটি ছিল : 'আত্মান

মোক্ষার্থান জগদ্ধীতায় চ'—একের মোক্ষলাভ সকলের সেবা। এ যাবৎ কোন সংকেতই কিন্তু পূর্ণতা পায়নি; কারো ব্যক্তিগত মোক্ষ যেমন হিমালয়ে নির্বাসনের ব্যক্তিস্বার্থে অবনমিত হতে পারে, সকলের জন্য সেবাকর্মও যেমন খাঁটি পরার্থবাদে পরিণত হতে পারে এবং সকলের জন্য এই ঐক্য, এই সমন্বয় কল্পবাদ হতে পারে; বিবেকানন্দের জীবনচর্চা ছিল এইসব সমস্যার সমন্বয় সাধনের সংগ্রাম। ভয়ঙ্কর আত্মত্যাগের মাধ্যমে মানবজাতির সেবাকর্ম এবং আত্মার দীপনকে সমস্ত আত্মার সমষ্টিতে প্রজ্জ্বলন, বিবেকানন্দের সমন্বয় ছিল এই; তিনি বলেছেন, 'the only God I believe in and above all my God the wicked my God the miserable, my God the poor of all races."

১৮৭০-এর দশকে শুরু হওয়া আধ্যাত্মিক অস্থিরতাকে তিনি এভাবেই বেঁধেছেন। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদানকে বিন্দুমাত্র খাটো না করেও বলা যায়, এই তিন জন প্রখ্যাত পুরুষ যেখানে আত্মার গভীর থেকে জেগে ওঠা ধর্ম তৃষ্ণাকে সামাজিক পরিকল্পনার প্রশমনলাভের সত্যে মূর্ত করেননি, বিবেকানন্দ যেখানে সেই তৃষ্ণাকে সামাজিক সংজ্ঞায় রূপায়িত করে বিষয়ীগতবাদের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে মুক্ত রেখেছেন, কিন্তু তার সামগ্রিক গভীরতাকেও গড়েছেন একই সঙ্গে। বিবেকানন্দের অন্তর্জীবনের তাৎপর্য এই-ই।

(খ) রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের শিক্ষার দার্শনিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে নিশ্চয় আমাদের দেখা প্রয়োজন কিরকমভাবে সে শিক্ষা তাঁর গুরুর শিক্ষানুসারী হয়েছিল। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'[১৭] থেকে আমরা জানতে পারি যে রামকৃষ্ণের শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি। প্রথমটি, সমাজসংস্কারের চেয়ে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ হিসাবেই ধর্মের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপন ও বিশেষ বিশেষ তত্ত্বে বিশ্বাস; এবং দ্বিতীয়টি, 'সর্বধর্মবাদ' (universialism)—সব ধর্মই ঈশ্বরে পৌঁছানোর পথ। কিন্তু সহজেই অনুমেয় যে, বিবেকানন্দ এ শিক্ষাগুলির রূপ দেননি, নাটকীয়-ভাবে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের যে প্রচার তিনি করেছিলেন, সে প্রচারেই সারা বিশ্বে ঝড় ওঠে। রামকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে বিবেকানন্দের অনস্তিত্ব যেমন সত্য, বিবেকানন্দকে বাদ দিলে রামকৃষ্ণের শিক্ষাও যে কেবলমাত্র অতিন্দ্রীয়বাদী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত একথাও সমান সত্য। ঐতিহাসিক গুরুত্বে ব্যক্তিগত প্রভাবের চেয়ে তাত্ত্বিক প্রভাব শক্তিশালী; কিন্তু তবু আমরা এ মূল্য নিরূপণে ভ্রান্ত নই যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ধর্মজগতে রামকৃষ্ণের অবদান ব্যক্তিগত প্রভাব প্রসূত। তত্ত্বগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বে মণ্ডিত হওয়ার কারণ বিবেকানন্দ এই অর্থে যে,

তিনি তাঁর গুরুর শিক্ষাকে এক বিশেষরূপে গঠন করেছিলেন, যে শিক্ষার রূপায়ণ ব্যাখ্যা বহুভাবেই গ্রাহ্য, এককভাবে কখনই নয়। আমরা পূর্বে দেখেছি সমাজ সংস্কারের চেয়ে মোক্ষলাভ হিসাবেই ধর্মের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপণ ও বিশেষ তত্ত্বে বিশ্বাস—রামকৃষ্ণের এই শিক্ষাদর্শই কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছিল এবং তাঁদের এই ব্যাখ্যা পদ্ধতিতে মানুষের প্রতি সেবার বিন্দুমাত্র লেশও ছিল না; কিন্তু বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় এই দুয়ের সম্পর্কই প্রধান। আবার, রামকৃষ্ণের 'সর্বধর্মবাদ' (universialism) অর্থাৎ সর্বধর্মই ঈশ্বরে গিয়ে মেশে এই তত্ত্ব সহজেই সর্বদর্শনবাদে রূপ নিতে পারে, কেশবচন্দ্র সেনের 'নববিধান' মতের উত্থানে এই তত্ত্ব সহায়ক ছিল, কারণ আমরা জানি নববিধান ছিল বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস ও আচরণের সংমিশ্রণ। বিবেকানন্দ কিন্তু রামকৃষ্ণের তাত্ত্বিকতাকে গঠন করেছেন এভাবে : 'সর্বধর্মবাদ' হল সকল ধর্মের অদ্বৈতবাদী ধারনার প্রকাশপদ্ধতি। বলা হয় যে, যেহেতু কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রাম-কৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি, রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে যাঁরা রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যেও বিবেকানন্দের মানবসেবামূলক শিক্ষাদর্শের সঙ্গে ধর্মের মূল হিসাবে রামকৃষ্ণ নির্দেশিত মোক্ষলাভের সংযোগ বিষয়ে সন্দেহ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় বিতর্কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পারস্পারিক অবদান সম্পর্কের আলোচনায় এই প্রামাণ্য মতবিরোধগুলির নিরীক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। আমরা সংক্ষেপে তার আলোচনা করছি।

"স্বামী শিষ্য সংবাদ"-এর লেখক একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।[১৮] মানবতা-মূলক ও শিক্ষাদান কর্মের উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণের নামে মিশন গঠনের প্রকল্পকে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী যোগানন্দ দোষাবহ মনে করেছেন এই ধারনায় যে, বিবেকানন্দ বিদেশী প্রভাব পুষ্ট হয়ে কাজ করছেন। তাছাড়া রামকৃষ্ণের শিক্ষা-পদ্ধতিও ছিল ভিন্ন ধরনের। বিবেকানন্দ এর উত্তরে বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ ছিলেন অনন্ত ধারনার প্রতিমূর্তি, তাঁর শিষ্যদের প্রস্তাবিত তত্ত্বসীমায় তাঁকে বাঁধা যায় না। স্পষ্টতঃই বিবেকানন্দের এই প্রত্যুত্তর যোগানন্দের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা যে একমুখী নয়, বহুদিকে বাঁক নিতে পারে এবং যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তার ব্যাখ্যা করেছেন তার বাইরেও বহুভাবে ব্যাখ্যা-ধর্মী—এই স্বীকারোক্তির মধ্যেই বিবেকানন্দের বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

অন্য একটি ঘটনা আরো তাৎপর্যপূর্ণ। প্রামাণ্য জীবনী থেকে পাওয়া যায়, স্বামীজীর এক গুরুভাই একসময় স্বামীজীকে প্রতিবাদস্বরূপ বলেছিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ প্রচার করছেন না, তাছাড়া ঐ গুরুভাই শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রকল্পের সামঞ্জস্য প্রমাণের দাবীও করেছিলেন। ঈশ্বর-

প্রাপ্তির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে প্রধানতঃ জোর দিয়েছেন ভক্তি ও সাধনমার্গের উপরে, সেখানে বিবেকানন্দ বারবার আহ্বান করছেন কর্ম, প্রচার এবং দরিদ্র ও পীড়িতের সেবায় নির্গত হতে—যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মন বহির্গামী হয়ে পড়ে, সাধকের জীবনে যা সবচেয়ে মারাত্মক বাধা। তাছাড়া, স্বামীজীর আদর্শে জনসাধারণের জন্য মঠ ও গৃহ নির্মাণ, সংগঠন ও দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য ভাবনা প্রসূত; ত্যাগের মহৎ আদর্শে এক নতুন ধরনের সন্ন্যাসবাহিনী সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজকর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের পরিপন্থী। তিনি স্পষ্টতঃই শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে বর্জন করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন গুরুভাইয়ের মত পার্থক্যের চরম নিদর্শন উপরের ঐ ছত্রকটি। আরো উল্লেখযোগ্য, বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসী ভাইদেরকে যুক্তির মাধ্যমে তাঁর নিজের আদর্শে বিশ্বাসী করে তুলতে প্রয়াস পাননি। তিনি তাঁর প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের সংস্কারাচ্ছন্ন কামনায়, এবং তীব্র আবেগে প্রশ্নকর্তাকে মৌন করে দিয়েছেন। জীবনীকার লিখেছেন, আরো অধিক গাম্ভীর্যতায় তিনি বলে উঠলেন, 'তুমি ভাবছ, তুমি আমার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশী জান? ··· তোমার ভক্তি তুচ্ছ আবেগমাত্র, এবং তুমি শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন বুঝেছ সেরকম প্রচারই চাইছ; আসলে তুমি তাঁকে বুঝতেই পারনি'।[১৯]

রামকৃষ্ণ মতাদর্শের অনুগামী একজন আমেরিকান শিষ্য বিবেকানন্দ সম্পর্কে এক সন্ন্যাস ভাইয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, "If we had dreamed of the labours that lay before us, we would not have spent our strength in severe austerifies or taxed our bodies by privations and long wanderings. All that was asked of us, we thought was a simple life of renunciation obeying in humble spirit what our Master had taught us." এখানেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ঐ সন্ন্যাসী ভাইয়ের চিন্তায় বিবেকানন্দের শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে পৃথক।

এ ধরনের আরো অজস্র ঘটনার বিবরণ দেওয়া যায়। উপরিল্লিখিত তিনটি বিবৃতিই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে, রামকৃষ্ণের প্রচারিত তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন, অন্যান্য গুরু ভাইদের ব্যাখ্যার থেকে তা ছিল ভিন্ন ধরনের; তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্যক্তিতত্ত্বের প্রচারক বলে দেখতেই আগ্রহী ছিলেন, এছাড়া মহেন্দ্রলাল গুপ্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকে গভীরভাবে আলোচনা করলে এই ধারনাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের জীবনী-রচয়িতাগণ স্বতঃই চেষ্টা করেছেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত আলোচনাকে এড়িয়ে যেতে। লেখকগণ একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন: বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর কাছে ব্যক্তি-

গত মুক্তিলাভের জন্য বারবার আবেদন করলে, শ্রীরামকৃষ্ণ সে আবেদনকে তাচ্ছিল্যভাবে উড়িয়ে দিয়েছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ) তাঁর প্রিয় শিষ্যের কাছ থেকে এর চেয়েও মহৎ কিছুর প্রত্যাশা করেছেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ যেভাবে গড়ে উঠেছিল তার পার্থক্যটি ধরার প্রচেষ্টাও এ বিবরণে নেই।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্যের একমাত্র ব্যাখ্যাটি এরকম দেওয়া যায় : বিবেকানন্দের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব ছিল ব্যক্তিগত, ততটা বৌদ্ধিক নয়। বৌদ্ধিকগত দিক থেকে বিবেকানন্দ ছিলেন যুগপুরুষ, ধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ ব্যক্তিগত বিষয়ের চেয়ে অধিকতর ভাবে সামাজিক। খ্রীষ্টানধর্ম এবং আরো গভীরভাবে দেখলে পাশ্চাত্য এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের যে চ্যালেঞ্জ হিন্দুধর্মের উপর পড়েছিল, বিবেকানন্দ সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বঙ্কিমের মতো আত্মরক্ষামূলক পথে তিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হন নি; বরং আক্রমণাত্মক পথে জয়লাভের মানসে নায়কোচিতভাবে তাঁর অতিমানবিক শক্তিকে অবিশ্বাসী জগতের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছিলেন। এ কারণেই বিবেকানন্দের বাণী আমাদিকে এক ভিন্ন বোধে আলোড়িত করে। রামকৃষ্ণের মতো পথে নয়, বস্তুত: রামকৃষ্ণ পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না এবং তার উত্তর দিতেও যত্ন করেন নি। তা সত্ত্বেও, বিবেকানন্দের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব বৌদ্ধিক না হয়ে ব্যক্তিগত হলেও সে প্রভাব হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। বিবেকানন্দের কাছে রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কোন শব্দই উপযুক্তভাবে মনঃপূত হয় নি। তাঁর মতে তিনি ছিলেন 'অবতারগরিষ্ঠ'—অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; তিনি বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং খ্রীষ্টের চেয়েও বড়, তিনি ইচ্ছা করলে শত সহস্র বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারতেন। বিবেকানন্দের এ ধরনের বাক্যবন্ধ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, রামকৃষ্ণের কাছে ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা ও অলৌকিক মাদকতা প্রাপ্ত হয়েই তিনি কামিনী ও কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে নির্ভীক হৃদয় নিয়ে অভিযানে বের হয়ে পড়েছিলেন, যাতে তাঁর শরীর ক্ষয় হয়ে পড়ে, আত্মা মুক্ত হয় এবং আলৌকিক উজ্জ্বলতায় আলোক বিচ্ছুরণ করতে থাকে। বিবেকানন্দের থেকে তাঁর গুরুর পার্থক্যের সন্তোষজনক ব্যাখ্যাটি এ প্রকল্প থেকেই বের হয়ে আসে। আরো গভীরভাবে আলোচনার জন্য এখন বিবেকানন্দের বাণীকে আমরা বেছে নিচ্ছি।

(গ) বিবেকানন্দের বাণী

চিন্তাজগতে বিবেকানন্দ বঙ্কিমের নিকট আত্মীয়। বিবেকানন্দের বৈদান্তিক কর্মবাদ ও নৈর্ব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে বঙ্কিমের গীতার কর্মবাদ ও ব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদের ঘনিষ্ট সাদৃশ্যের আলোচনা করলে আমরা বিবেকানন্দের বাণীর

আলোচনা করেছি, গীতায় প্রচারিত কর্মবাদের যে ব্যাখ্যা বঙ্কিম দিয়েছিলেন তা আবহমান ব্যাখ্যাকারদের থেকে ভিন্ন ধরনের। পূর্বেকার ব্যাখ্যাকারদের মতে গীতায় প্রচারিত কর্মবাদ হল, শাস্ত্র-নির্দেশিত পথে আচার-উপাসনা; বঙ্কিমের মতে বৈদিক যাগযজ্ঞ কিংবা পূজা উপাসনা গীতায় উল্লেখিত হয় নি, সমস্ত মানুষের মধ্যে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের উপাসনায় উল্লেখিত হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'Let all the vain Gods disappear for the time from our minds. This is the only God that is awake, our own race—everywhere his hands, every wherehis feet, everywhere his ears, he covers everythings. All other Gods are sleeping. What vain Gods shall we go after and yet can not worship the God that we see all round us, the Virat ? When we have worshipped this, we shall be able to worship all other Gods. Worship is the exact equivalent of the Sanskrit word, and no other English word will do. There are all other Gods,—men and animals : and the first Gods we have to worship are our countrymen.''[২০]

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, বিবেকানন্দের উক্ত বক্তব্যের মধ্যে 'মানবতার ঈশ্বরের' যে রূপ প্রচারিত হয়েছে, বিবেকানন্দের কাছে কিংবা তাঁর পূর্বে বঙ্কিমের কাছে সে ঈশ্বর নারী ও জনসাধারণের সেবাকর্মের প্রতীকি ঈশ্বর নন, বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদান্তের সারকথাই ছিল তা। বঙ্কিমের মানবতাবাদী ধর্ম প্রসঙ্গে আমরা ঈশ্বরের ধারণা লক্ষ্য করেছি, যাঁর উপাসনায় মানবিক বৃত্তিগুলি নিখুঁত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকশিত হয় এবং বিশেষ করে প্রেমবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। বিবেকানন্দ বলেছেন, "Where is the eternal sanction (of ethics) to be found except in the only Infinite Reality that exists in you and in me and in all, in the self, in the soul ? The infinite oneness of the soul is the eternal sanction of all morality, that you and I are not only brothers—every literature voicing man's struggle towards freedom has preached that for you—but that you and I are really one. This is the dictate of Indian Philosophy. This oneness is the rationale of all ethics and spirituality"।[২১]

এখানেই আমরা বিবেকানন্দের প্রচারিত তত্ত্বের মূল কেন্দ্রে পৌঁছাই। তথাকথিত বেদান্ত দর্শনের অধিবিদ্যক তত্ত্বই হল সমস্ত সৃষ্টির ঐক্য (oneness)। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী অন্ধকারের অন্ধগুহায় নিমজ্জিত অধিবিদ্যক তত্ত্ব থেকে বিবেকানন্দ ধর্মীয় সার সংগ্রহ করেছেন এবং হিন্দুধর্মের ভিত্তি হিসাবে

মূলকেন্দ্রে পৌছাতে পারি। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বঙ্কিমের কর্মবাদ সম্পর্কে রূপায়িত করেছেন, যা কতকগুলি মুষ্টিমেয় অজ্ঞেয়বাদীর জীবনের সঙ্গে যোগহীন দুঃখবাদী মতবাদে অবনমিত হয়েছিল।

আদিতে বৈদান্তিক ধর্ম ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের নির্বিচার ও সংকীর্ণ ধারণাগত মতবাদ। এটি সারত মোনাষ্টিক ও অতীন্দ্রিয়বাদী; ধ্যান ও যৌগিক কর্মই এর একমাত্র অনুমিত আচার অনুষ্ঠান। বিবেকানন্দই প্রথম সর্বজীবে প্রেমের নীতিকে আবশ্যকীয়ভাবে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে এই নীতির অন্তর্ভুক্তির ফলে সর্বশ্রেণীর লোকেরা জীবনচর্চার সঙ্গে এর মিলন ঘটে এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের এযাবৎ একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হয়। বিবেকানন্দের মূল কথা ছিল, সমগ্র সৃষ্টির ঐক্য যদি সত্য হয়, তাহলে এটি কখনোই কতকগুলি অতিন্দ্রীয়বাদী উপলব্ধির একমাত্র ফল হতে পারে না, কারণ তাহলে এর বিশ্বজনীনতাকেই অস্বীকার করা হয়, এটি সকলের জন্য মানবিক অনুভবের অংশ, প্রেমের মধ্য দিয়েই এর প্রাপ্তি। তিনি লিখেছেন : "ভগবৎ প্রেম ও সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া'—চৈতন্য এ কথাই প্রচার করেছিলেন, এবং নিঃসন্দেহে দ্বৈতবাদী ধারনার সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণ। কিন্তু আমরা যারা অদ্বৈতবাদী তাদের কাছে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতার এই ধারনা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার মতো। আমাদের নীতি হল প্রেম, দয়া নয়। আমাদের নীতিতে সৃষ্টির প্রতি দয়ার প্রযোজক ধারনা একটি প্রাক্-প্রত্যয়।"

বেদান্তে বিবেকানন্দের মৌলিক অবদান বিষয়ে উপরোক্ত বক্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আদি বেদান্ত ঈশ্বরের সঙ্গে সৃষ্টির ঐক্য সন্ধান করে অতিন্দ্রীয় উপলব্ধির মধ্যে, কিন্তু বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন, যদি আমরা এই ঐক্যের ধারনাকে আমাদের স্বাভাবিক মানবিক অভিজ্ঞতায় প্রয়োগ করি, তাহলে সেই ঐক্যে পৌছানোর একটা পথ আমাদের থাকবে; সেই পথ হল প্রেমের পথ, যা কোন কিছুর প্রত্যাশা করে না। বিবেকানন্দ এভাবেই আমাদের স্বাভাবিক মানবিক উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে সার্বজনীন প্রয়োগক্ষেত্রে রূপান্তরিত করেছেন।

সুতরাং দেখা গেল, বিবেকানন্দের মত বঙ্কিম ধারনার অভিন্ন এবং সেবা ও প্রেমের আদর্শ নির্যাস বের করতে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সর্বেশ্বরবাদী ধারনার যৌক্তিকতা বিবেকানন্দ যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, সে যৌক্তিকতা সর্বেশ্বরবাদী ও ব্যক্তিক ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, অ-ব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদের ভিত্তি তা নয়। কারণ স্পষ্ট যে, বিবেকানন্দের যেমন, বঙ্কিমেরও তদ্রূপ-যুক্তি কেবলমাত্র সর্বেশ্বরবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, সর্বেশ্বরবাদী ব্যক্তিক কিংবা অ-ব্যক্তিক ঈশ্বরের উপর প্রযোজ্য নয়। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নমুখীতার পর্যালোচনাও গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) সর্বেশ্বরবাদ—ব্যক্তিক ও অ-ব্যক্তিক

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বঙ্কিমের ধর্মে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ধর্মের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্কিম জোর দিয়েছেন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে—সুসম সামঞ্জস্য নিয়ে মানবিক বৃত্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশের জন্য এ ভক্তি আবশ্যকীয় শর্ত। বস্তুতঃ তাঁর ঈশ্বরও মানবতাবাদী ঈশ্বর এই অর্থে যে, সে-ঈশ্বর মানুষের সম্ভাবনার চরম সীমা এবং কোন ব্যক্তির প্রেমবৃত্তির সর্বব্যাপী-তার জন্য ঈশ্বরেরও সর্বব্যাপী হওয়া আবশ্যক। সর্বব্যাপী ব্যক্তি-ঈশ্বরের হিন্দু-ধারনার সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণ। কিন্তু এ ধরনের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কীত প্রশ্নে বঙ্কিম নীরব, তিনি শুধু মন্তব্য করেছেন এই বিশ্বাসে যে, এ ধরনের ব্যক্তিক ঈশ্বর 'কেবল তার কাছেই লব্ধ যিনি বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করেছেন, হৃদয়কে পবিত্র করেছেন'। বঙ্কিমের এই ধারনাটি বিশ্বাসগত, যুক্তিতে এর উত্তর নেই এবং ধর্মীয় আচার আচরণের উপরেই এটি নির্ভরশীল।

আদি বেদান্ত দর্শনের সূত্রকে স্মরণে রেখে বিবেকানন্দ বলেছেন, ধর্মের জন্য ব্যক্তিক ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, বরং খাঁটি যুক্তিবাদী ধর্মের গঠনে আত্মার দেবত্বই যথেষ্ট। সমগ্র সৃষ্টিতে অবস্থানকারী ঈশ্বরের ঐক্যই বিবেকানন্দের এই সমন্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং ধর্মের ভিত্তি গঠনে কিভাবে এটি কার্যকরী বিবেকানন্দ তা দেখতে চেষ্টা করেছেন।

আবার আদি বেদান্তকে অনুসরণ করেই বিবেকানন্দ জোর দিয়েছেন ধর্মের গঠনে আত্মার দেবত্বের উপরে। আত্মার দেবত্বের এই ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কারণে যে, এটিকে উপলব্ধি করা যায় এবং শান্তিলাভও ঘটে, অবরুদ্ধ আত্মা প্রকৃত মুক্তিলাভ করতে পারে। দেহ ও আত্মার চরম পবিত্রতা, কাম ও কাঞ্চনে পূর্ণ বিরাগ এবং সকলের জন্য তীব্র প্রেমই দেহে অবস্থানকালীন সময়েও আত্মাকে দেহ থেকে মুক্ত করে, তাকে স্বাধীন করে।

(ঙ) নব্য সমন্বয়

তবু একথা বলা যায় না যে, বিবেকানন্দের 'নব্য বেদান্তে'র সঙ্গে বঙ্কিমের 'ব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদে'র যোগ নেই। বঙ্কিম ভক্তিতত্ত্বকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন—সনাতন হিন্দুধর্মের রাম ও কৃষ্ণ মতবাদের ভিতর থেকে 'খোসা'কে বাদ দিয়ে তাদের মূল 'শাঁস'-কে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মবাদ এবং সর্বজীবে প্রেমই হল সেই মূল শাঁস। সর্বেশ্বরবাদের অধিবিদ্যক তত্ত্বের নির্যাস সিদ্ধান্ত ছিল এটি। ধর্মের সত্ত্ব হল, ব্যক্তিক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি—যে ব্যক্তিক ঈশ্বর মানুষের সম্ভাব্যতার সীমা। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিবেকানন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বঙ্কিমের তাত্ত্বিক শাঁসকে অনুসরণ

করেছেন। হিন্দুধর্মের মূল সত্ত্ব সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, কিন্তু তবু সত্য নয় যে বঙ্কিমের ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণাকে বিবেকানন্দ অস্বীকার করেছেন। বিবেকানন্দ আসলে রামকৃষ্ণের তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন; রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সর্বধর্মই ঈশ্বরে পৌছানোর পথ। এক্ষেত্রে যেমন, তাঁর নব্য বেদান্তবাদের ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ ছিলেন একজন খাঁটি সংস্কারক।

রামকৃষ্ণ জোর দিয়েছিলেন সকল ধর্মের সম-সত্যতায়। কিন্তু একেশ্বরবাদ সঠিক হলে বহু দেববাদ সম্পর্কে আমরা সন্দেহে পতিত হই। বিবেকানন্দ এই আপাত বিরোধী সত্যকে দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তত্ত্বের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বৈদান্তিক একেশ্বরবাদই সম্ভাব্য সঠিক হতে পারে, কারণ বেদান্তিক একেশ্বরবাদ আত্মার ঐশ্বরিকত্বকে স্বীকার করে; ব্যক্তিক ঈশ্বরের ধারণা, তা সে একেশ্বরবাদী কিংবা অন্যান্য যাই-ই হোক তার প্রকৃতি মূলতঃ অপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাত্ত্বিক এবং ধর্মের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন তেমনি 'চরম' সত্যের 'আপেক্ষিক' ধারণাতেও— কোন ধর্মকেই অসন্দিগ্ধভাবে সঠিক ঘোষণা করা যায় না। হৃদয়ের শুদ্ধিকরণ প্রত্যেক ধর্মেই তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রস্তাব বিদ্যমান, প্রত্যেক ধর্মেই ঐশ্বরিকত্বের বিশেষ দিকের উপর জোর দেয়; আর ঐশ্বরিকত্বের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে ভ্রান্তিতে পৌছাতে হয়, কারণ, ঐশ্বরিকত্ব সম্বন্ধে মানব প্রদত্ত সমস্ত বিবরণই অসম্পূর্ণ।

ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে এরকম ধারণা নিয়েই বিবেকানন্দ কয়েকটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাদের ঐশ্বরিক ধারণার প্রতিও বিদ্বেষ পোষণ করেছেন। তথাকথিত বামাচার তন্ত্রকে তিনি কঠোর ভৎর্সনা করেছেন, কারণ এই বামাচারীরা ধর্মীয় সংস্কৃতিকে যৌনচর্চায় অবনমিত করে ফেলেছিল। প্রচলিত বৈষ্ণবীয় গোষ্ঠী কর্তৃক রাধা ও কৃষ্ণের মিলনকে মহিমান্বিত করার প্রচেষ্টাও তাঁর অনুমোদন পায়নি। সুতরাং দেখা গেল যে, রামমোহনের সময় থেকে বাঙলার ধর্ম জগতের ঘূর্ণায়মাণ চক্রটি এতদিনে সম্পূর্ণ হল, চৈতন্যের বৈষ্ণব মতকে আক্রমণের মধ্যে দিয়েই রামমোহন তাঁর সংস্কারের সূত্রপাত করেছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর সমাপ্তি ঘটালেন কত ভিন্ন ও সুন্দর উপায়ে।

(চ) হিন্দুধর্মের প্রচারমুখী ধর্মে উত্তরণ

রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের ফলে হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্যান্য বৃহৎ ধর্মের মধ্যে পার্থক্যের একটি বিরাট আপেক্ষিক অবস্থান সূচিত হয়। রামমোহন যেখানে একেশ্বরবাদের বীজ খুঁজতে উপনিষদকে অপরিহার্য মনে করেছেন এবং সেই একেশ্বরবাদ যখন খ্রীষ্টান ধর্মের ইউনিটিরিয়ান মতের কাছা-কাছি নিয়ে এসেছেন তখন তিনি হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিকতার সহায়করূপে **Precepts**

of Jesus-এর প্রকাশ করেছেন। বিবেকানন্দ কিন্তু পাশ্চাত্যে হিন্দু ধ্যান-ধারণার প্লাবন ঘটিয়ে দিয়েছেন।[২২]

বিবেকানন্দের মতে হিন্দুধর্ম 'ধর্মসমূহের জননী' অন্যান্য ধর্ম এর জোড়াতালি দেওয়া অনুকরণ মাত্র। নীতিবাদ সমূহের যুক্তি যেমন একমাত্র সর্বব্যাপী ঈশ্বরের ধারণায় প্রস্তাবিত—প্রকৃতপক্ষে যা একটি হিন্দু ধারণা, তেমনি আমাদের দেহের মধ্যে সুপ্ত দেবত্বের ধারণা একমাত্র হিন্দুধর্মই শিক্ষা দিয়েছে, এবং কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মই সেই দেবত্বের ধারণায় পৌছানোর জন্য একটা ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রণালীর প্রস্তাব করেছে। এইসব ধারণাগুলি হিন্দুধর্মের সার্বজনীনতা বিষয়ে রামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি 'যত মত তত পথ' এর সঙ্গে একযোগে এবং বিবেকানন্দের দ্বারা পূর্নব্যাখ্যায় সঠিকভাবেই বিশ্বধর্ম সম্মেলনে আগ্রহের দাবী রাখতে পেরেছিল. দৃষ্টি-ভঙ্গীর গভীরতা ও আধ্যাত্মিক প্রাচুর্যে অন্যসব ধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াতে পারে নি। এসব তত্ত্ব দিয়েই বিবেকানন্দ বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন ; কেবলমাত্র তিনি যদি এই বিশ্বজয়ের সূত্রপাত করেই থাকেন, তাহলেও তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণাত্মক শক্তি অনুপ্রবিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ যাবৎ হিন্দুধর্ম ছিল ক্ষমাধর্মী, এবং পুর্নজাগরণের জন্য আবশ্যকীয় অন্যান্য ধর্মের মধ্যেকার তত্ত্বগ্রহণে অনিচ্ছুক। কিন্তু বিবেকানন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন দিক উদ্ঘাটিত হয় ; হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের তাত্ত্বিক যোগাযোগের যে সূচনা রামমোহন করেছিলেন, বিবেকানন্দ সেই তাত্ত্বিক যোগকে গ্রহণের পর্যায় থেকে প্রদানের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন।

(ছ) নব্য হিন্দুধর্ম

আমরা এখন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় সীমায় বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রচেষ্টার তাত্ত্বিক পরিণাম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ধর্মীয় বিতর্কে তাঁদের এই তাত্ত্বিক আলো-চনার পরিণাম হয়ে উঠেছিল একটি প্রধান কার্যকরী বিষয়। এখন আমরা নব্য হিন্দুধর্মের তত্ত্বগুলি একের পর এক আলোচনা করছি।

১। প্রথম তত্ত্বদর্শন বিষয়ক। সুসম সামঞ্জস্য নিয়ে পূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মানুষের সুখের অন্বেষণ ও তার বিশ্লেষণে অপরিহার্যরূপেই মানুষের বৃত্তিসমূহকে ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত করার কথা বিবৃত হয়েছে। এই ধারণা কেবলমাত্র বঙ্কিমের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে; বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে, ধর্মে এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গীতার শিক্ষা থেকেই এসেছে।

২। দ্বিতীয় ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। ধর্মতত্ত্বের সত্যতায়, একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বর-বাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্কিত দাবীকে কেন্দ্র করে এটি পরিচালিত। বঙ্কিম ও

বিবেকানন্দ উভয়েই সর্বেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন—বঙ্কিম যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করে বাহ্যিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, যে ঈশ্বর স্বর্গের সিংহাসনে বসে বিশ্ব পরিচালনা করেন। বিবেকানন্দ এই বাহ্যিক ঈশ্বরের ধারণাকে গোষ্ঠীগত বলে অভিহিত করেছেন, এর উৎসকে উল্লেখ করেছেন জুডিও-খ্রীষ্টান ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে। ইহুদী এবং ব্যাবিলোনিয়ার উপজাতিদের মধ্যে অবিরত বিদ্রোহের ফলেই ঐ ধারণা প্রচলিত রূপ পেয়েছে। বিবেকানন্দ আরো উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিক দিক থেকে একেশ্বরবাদ হল উপজাতীয় দেবতাদের উপর 'মোলখয়াভে' দেবতার বিজয় এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই বিজয় সর্বতঃই রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে।

সর্বেশ্বরবাদ সম্বন্ধে বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ উভয়েই দেখিয়েছেন যে, এই সর্বেশ্বরবাদ প্রকৃতই নির্ভেজাল ও বাস্তবানুগ ধর্ম-ভাবনা, অধিবিদ্যার অমূর্ত সত্তা নয়। হিন্দুদের কাছে এটি প্রেমময় ব্যক্তিক ঈশ্বর ও আত্মার ঐশ্বরিকত্ব ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই উভয় ধারণাতেই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা আসে, বিশেষ করে দ্বিতীয় ধারণাটি আধ্যাত্মিকতার এমন এক শিক্ষা দেয় যাতে দেহে অবস্থান করার সময়েও আত্মার ঐশ্বরিকত্ব লাভ হয়। অন্য কোন ধর্মে মোক্ষের এমন পথ নেই।

৩। তৃতীয় তত্ত্ব, নৈতিক এবং সর্বেশ্বরবাদের প্রত্যক্ষ ফল। ঈশ্বর যদি সর্বভূতে বিরাজমান হন, সর্বভূতে প্রেমকে বাদ দিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হাস্যকর ব্যাপার হয়ে ওঠে। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ উভয়েই সর্বেশ্বরবাদকে সকল নীতিবাদের আশ্রয়স্থল বলে মনে করেছেন। তাঁরা উভয়েই উল্লেখ করেছেন যে পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে কেবলমাত্র হিন্দুধর্মই এই বিশেষ গৌরবের অধিকারী। একথা সত্য যে হিন্দুধর্মের মতো অন্যান্য ধর্মও মানব প্রীতির কথা প্রচার করেছে, কিন্তু জগৎ থেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের উপাসনা করার ভাবনার ফলে মানব প্রীতির আবশ্যকীয় শর্ত সেখানে নেই। কেবলমাত্র হিন্দুধর্মেই ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত।

৪। চতুর্থ তত্ত্ব, সমন্বয়; হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠির প্রতি বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশেষ করে সমগ্র বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতি বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। বঙ্কিমের গীতা ব্যাখ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী আভাসিত "যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেইভাবেই তুষ্ট করি"[২৩] এবং ধর্মে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা হিসেবে বঙ্কিম গীতোল্লিখ শ্লোকের ব্যবহার করেছেন। রামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে বিবেকানন্দ আরো এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, সকল ধর্মই সত্য ধর্ম, যে সব ধর্মে আধ্যাত্মিকতা অর্জনের উপায় রয়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রাপ্তির ভিন্ন পদ্ধতি যেখানে বর্তমান, যদিও তত্ত্বের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বেদান্ত দর্শনই সম্ভাব্যতার মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠ, কেননা কেবলমাত্র বেদান্তেই উপাসনা পদ্ধতি তত্ত্বকে অনুসরণ

করেছে। বিবেকানন্দের এই সমন্বয় তত্ত্ব প্রচারের ফলে অন্যান্য সংস্কারবাদী গোষ্ঠীর প্রতি উদারতা আর মাত্র যুক্তিহীন বাণী হয়ে থাকল না, সেগুলিকে বিচার করার একটা মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত হল।

আমরা শুধুমাত্র এইটুকু বলব যে উপরোক্ত চারটি তত্ত্ব ভাবনার প্রচারের ফলে হিন্দুধর্মে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, রক্ষণশীল ও গোঁড়া হিন্দুধর্মের পরিবর্তে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীকে নব্য হিন্দুধর্ম নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। পশ্চিমী শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্টতার মধ্য দিয়েই ভাবনার এই নূতনত্ব সৃষ্টি হয়েছে। একথা সত্যি যে কেবলমাত্র বঙ্কিমই নতুন জ্ঞানের আলোকে হিন্দুধর্মের একটা পরিশীলিত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দ প্রচারিত হিন্দুধর্মের নৈতিক ভিত্তিও সেই নতুন জ্ঞানের আলোকেই প্রজ্বোলিত হয়েছে। রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে রহস্যবাদী বলে অভিহিত করা চলে, রামকৃষ্ণের সে ব্যাখ্যা স্বভাবতঃই ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।[২৪] বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ উভয়েই হিন্দুধর্মের নৈতিক ভিত্তি 'প্রেম ও সেবার' ধারণাকে উন্মোচন করে ঐ প্রতিবাদের উত্তর দিয়েছেন। আবার, একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা কঠোর বিচার পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়েছে এবং রক্ষণশীল আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ না করেও বিচার বিযুক্তভাবেই সর্বেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি বিবেকানন্দের সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রবাহিত হয়েছে একটা কার্যকরী শক্তি, এখানেও কোনরকম কুসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ছিল না।

এইসব তথ্যের আলোকে বলা যায়, কিছু কিছু লেখক যে নব্য হিন্দু আন্দোলনকে 'পুনরুত্থান' নামে অভিযুক্ত করেছেন তা মোটেই সত্যের কাছাকাছি নয়। পুনরুত্থান যদি অবনতি ও প্রতিক্রিয়া বোঝায়, কিংবা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মরা যেমন বলেছেন, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সকল রকম আচার বিশ্বাসকেই পুনস্থাপিত করতে চেয়েছেন, যার ফলে ব্রাহ্মদের গৌরবময় কাজকর্মের উপর যবনিকাপাত ঘটে, তাহলে বলা যায় যে, ধর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ অভিযোগ স্পষ্টতঃই ভিত্তিহীন। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নব্য হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্পর্কে নব্য হিন্দু বিশ্লেষণকে আলোচনা করার পূর্বে 'পুনরুত্থান' অভিযোগটির উত্তর দেওয়া যায় না।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিম রচনাবলী, একাদশ অধ্যায়।
২. ধর্মতত্ত্ব : একাদশ অধ্যায়।
৩. Nikhilanand : Swami Vivekananda : a Biography, New York, 1953. প্রমথনাথ বসু : স্বামী বিবেকানন্দ (৪ খণ্ড), Eastern and Western Disciples : Life of Swami Vivekananda, Advaita Ashram, Calcutta 1912.
৪. সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : বিবেকানন্দ চরিত, কলিকাতা, ১৯১৯.
৫. Eastern and Western Disciples : The 'Life of Swami Vivekananda',
৬. নরেনের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে। নরেন নিজেও মহেন্দ্রলাল গুপ্তের (শ্রী'ম) সঙ্গে আলোচনা কালে এর উল্লেখ করেছেন।
৭. প্রবুদ্ধ ভারত, এপ্রিল ১৯০৭ : ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বিবেকানন্দ স্মৃতিকথা : বিবেকানন্দের মানসিক বিকাশের প্রথম যুগ।
৮. Letter to Mrs. Bull, dated December 12, 1899 : The complete works of Vivekananda.
৯. Letter to Nivedita, Sanfrancisco, dated March 4, 1900 : The complete works of Vivekananda.
১০. Letter to Miss Macleod, Alameda, California, dated April 18, 1900 : ঐ
১১. Letter to Miss Mary Hale, dated March 22, 1900 : complete works.
১২. Letter to Miss Mary Hale, dated June 17, 1900 : ঐ।
১৩. Eastern and Western Disciple : The Life of Swami Vivekananda, Calcutta 1955, p. 388.
১৪. ঐ, পৃ. ৪০০।
১৫. ঐ, পৃ. ৪১২।
১৬. ঐ, পৃ. ৪১১।
১৭. শ্রী'ম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ খণ্ড)।
১৮. স্বামী শিষ্য সংবাদ : স্বামীজীর বাণী ও রচনা : শতবার্ষিকী, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃ. ৬২।
১৯. Eastern and Western Disciples : The Life of Swami Vivekananda, p. 507.
২০. The Future of India; complete works of Swami Vivekananda, Vol. III.
২১. Vivekananda : The Mission of Vedanta.
২২. This is the great ideal before us, and everyone must be ready for it—the conquest of the whole world by India—nothing less than that." (The Work Before us : complete works, Vol. III).
২৩. ভগবদ্গীতা : চতুর্থ অধ্যায়, (৪/১১)।
২৪. এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে হিন্দু মূর্তিপূজা সম্পর্কে রামমোহনের সমালোচনা।

৭

সংস্কার ও পুনর্জীবন

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, নব্য হিন্দু আন্দোলন ছিল মূলতঃ সংস্কার আন্দোলন এবং তার চালিকা শক্তি ছিল কর্মযোগ। এই কর্মযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের গীতা-ভাষ্য ও বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তবাদের নির্যাস।

এ বিষয়ে বিশ্লেষণের আগে সাধারণভাবে 'সংস্কার' এবং বিশেষভাবে 'সামাজিক সংস্কার' সম্পর্কে নব্য-হিন্দু ধারণার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

(ক) সামাজিক সংস্কার ও বঙ্কিম

অস্বীকার করা যায় না বঙ্কিম কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের বিরোধীতা করেছিলেন এবং তাঁর এই বিরোধীতা কখনো কখনো তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বিদ্যাসাগরের বহু-বিবাহ রীতিবিরুদ্ধ আন্দোলনের তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ ঐ প্রথারোধের আইন প্রণয়নে তিনি প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করেছিলেন। বি. মালাবারির নেতৃত্বে পরিচালিত সংস্কারক গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রভূত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছিল।[১] ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মালবারির 'টীকা' (Notes) প্রকাশিত হলে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, ফলে ১৮৯১-এর সহবাস সম্মতি আইন (Age of Consent Act) পাশ হয়। সামাজিক প্রশ্নে বঙ্কিম শশধর তর্কচূড়ামণির মতোই কিছুটা অনুদার ছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির মতে এই একখণ্ড আইনই হিন্দুধর্মকে বিপদগ্রস্ত করেছে। শশধরের সোচ্চার নিন্দার লক্ষ্য ছিল বার বছর বয়সের আগে হিন্দু স্ত্রীর উপর আরোপিত যৌনমিলনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বিষয়ক আইন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি যথার্থ হলে যুক্তি নির্ভর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সামাজিক প্রশ্নে নব্য হিন্দু আন্দোলন পশ্চাদ্‌গামী আন্দোলন।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের যে সমালোচনা করেছেন তার বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের 'বহু বিবাহে রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'[২] ছিল বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের প্রবন্ধের বিষয়। বঙ্কিমের প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের পদ্ধতিটি যে আদর্শের দিক থেকে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করা এবং আরো দেখানো যে, ব্যবহারিক দিক থেকেও এটি অচল। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর পিছনে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য ছিল, শাস্ত্র দরাজ হাতে বহু বিবাহ রীতি অনুমোদন করেনি। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের মাধ্যমেই তিনি বহু বিবাহ বিলোপের জন্য আইনের আশ্রয় চেয়েছিলেন। বঙ্কিমের মতে, সামাজিক প্রশ্নে শাস্ত্র কদাচিৎ নির্ভরযোগ্য নির্দেশক। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র এবং তার সামাজিক বিধানসমূহ ভারতবর্ষের অধঃগতির অন্যতম কারণ।[৩] বঙ্কিম চেয়েছেন, শাস্ত্রীয় আলোচনা থেকে সামাজিক প্রশ্নকে বিচ্যুত করতে। তাই তিনি শাস্ত্র নির্ভর বিদ্যাসাগরীয় সমাজ সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন।

সুস্পষ্ট যে শশধর তর্কচূড়ামণির মতো প্রগতি বিরোধীর বক্তব্যের চেয়ে এটি বেশী পরিমাণে প্রগতিশীল এবং শাস্ত্র আনুগত্যে যুক্ত বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদক্ষেপ থেকেও উদার। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে এরূপ নির্বিচারে গ্রহণকেই আক্রমণ করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন শাস্ত্রের প্রতি এরূপ মনোভাবের অবসান হোক।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে বঙ্কিমচন্দ্র কি ধরণের সংস্কার চেয়েছিলেন ? বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার পদ্ধতি হয়তো আপত্তিজনক, কিন্তু তাতে ছিল উপযোগবাদের নীতি অনুসারী 'যুক্তিসিদ্ধ মানবপ্রীতি' (rational Philanthrophy)। রাজনৈতিক ও কিছুটা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে জে. এস. মিলের শিষ্য এবং উপযোগীতাবাদ তত্ত্বে পূর্ণ সচেতন বঙ্কিম কি সমাজসংস্কার প্রশ্নে ঐ তত্ত্বেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন ? বরং তিনি কি সমাজ সংস্কারকদেরকে চমক সৃষ্টিকারী দল[৪] বলে আক্রমণ করেন নি ? পরিণত বয়সে তিনি কি 'সাম্য' প্রকাশ বন্ধ করে দেন নি ? যার ফলে পরবর্তীকালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে তাঁর মৃত্যু একজন সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলের, একজন হিন্দু সংকীর্ণতাবাদীর, একজন গোঁড়া ধর্মোন্মাদ ব্যক্তির মৃত্যু বলেই অভিহিত হয়েছে।

এসব প্রশ্নের উত্তরে ১৮৯১ এর সহবাস সম্মতি আইন প্রসঙ্গে শশধর ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর মনোভাবের আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার যে বিক্ষোভ এই আইনের পথ প্রস্তুত করেছিল সেই বিক্ষোভ আলোড়নের স্বরূপটিকে। সবাই জানেন যে, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের স্বামী কর্তৃক দশ বৎসর বয়সের স্ত্রী ফুলমণির উপর বলপূর্বক যৌনমিলনের ফলে ফুলমণির মৃত্যু

হলে বাল্যবিবাহের চাঞ্চল্যকর প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযুক্ত হরি মাইতি আদালতে নিরপরাধ প্রমাণিত হয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে, যে কন্যা দশ বৎসরের তার বিবাহিত, স্বামীকে তার উপর বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। ঘটনাটি ঘটেছিল সহবাস সম্মতি আইনপাশের এক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং অসম্ভবনয় যে বি. এম. মালাবারির বাল্যবিবাহ ও চিরবৈধব্যের বিরুদ্ধে প্রচারিত আন্দোলনে বিচারকের রায় প্রভাবিত হয়েছিল। মালাবারি ছিলেন পার্শী সমাজ সংস্কারক। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'টীকা' প্রকাশিত হলে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। 'টীকার' লক্ষ্য ছিল হিন্দু সামাজিক ব্যাধি, বিশেষতঃ চিরবৈধব্য ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে। মালাবারি ছিলেন সাংবাদিক, তাঁর সংস্কার উদ্যম সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল যা হিন্দু সমাজের চিরবিধবা ও বালিকাবধূদের উৎকণ্ঠা সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। এই 'টীকা' ছিল সংযত সমাজ সমালোচনার পরিবর্তে ফেনিল হৃদয়াবেগের ফলশ্রুতি। বিধবাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, " (The sights of mistreated widows) burnt themselves into my brains. It is not only that I know the miseries of widowhood, not merely that I feel them, fall for and with the widow; I am the widow for the moment".[৫]

সহজেই অনুমান করা যায় এমন অদ্ভুত মন্তব্যকারীর[৬] পক্ষে কতখানি অতিশয়োক্তি করা সম্ভব, যখন তিনি বিধবাদের থেকেও ব্যথা-বিধূর বালিকা বধূর জীবনের কথা বলেছেন, কেন না বিবাহের ক্ষণ থেকেই সে বধূ অবশ্যম্ভাবী বলপ্রয়োগের দ্বারা যৌনমিলনের ত্রাসে রুদ্ধশ্বাস। মালাবারি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন যে, শিশুকন্যা বিবাহ করেছেন এমন হিন্দুর অধিকাংশই শিশু বলাৎকারী।[৭] এখানেই মালাবারি থেমে যাননি, সারা ভারত ভ্রমণ করে জনসমাবেশে প্রচার করেছেন হিন্দু বিধবা এবং বালিকা বধূদের জন্য তাঁর শঙ্কিত উৎকণ্ঠা। অন্যদিকে তাঁর মতের যোগ্য প্রতিবাদ জানানোর মতো সচেতন ও সাহসী ব্যক্তিত্ব তখন হিন্দুসমাজে বিরল। মালাবারির উৎসাহের আতিশয্যে সরকারও প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু হিন্দুদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে তৎকালীন ভারতের অর্থমন্ত্রী স্যার অকল্যাণ্ড কলভিন্ (Sir Auckland Colvin) এইসব সমাজ সংস্কারকদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপদেশ দেন নি। তিনি বলেছিলেন, "আমি, আপনি, বিধবারা এবং পাঁচ বছরের বিয়ের কন্যা ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই ধৈর্যশীল থাকব, যতদিন পর্যন্ত না আরো বিনম্র, সহৃদয় ও যথার্থ প্রয়োজনবোধ অনুভূত হয়।" এরকম অস্পষ্ট আশ্বাসে নিবৃত্ত হবার পাত্র ছিলেন না মালাবারি। তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করে-

ছিলেন। ম্যাক্স-মূলারের মতো ভারতের যথার্থ কল্যাণকামী আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বহু জনসভার আয়োজন করে উদার-মনা ইংরেজ নাগরিকদের ভারতে বালিকা বলাৎকারী স্বামীদের হাতে হত-ভাগিনী শিশুকন্যাদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ও প্রভাবিত করে-ছিলেন। ভারতবর্ষেও ঘটনার গতি দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছিল। মালাবারির আন্দো-লন শুরু হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে হরি মাইতি অভিযুক্ত হলে পূর্বোল্লিখিত যুক্তিতে তিনি মুক্তি পান। মালাবারির শিষ্য দয়ারাম গিডুমল (**Dayaram Gidumal**) এই মুহূর্তে দশ এগার বছরের কন্যাদের জীবন রক্ষায় সহবাস সম্মতি আইনের (**Age of Consent Bill**) প্রস্তাব করেন। আইনটি বিধিবদ্ধ হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

উপরোক্ত ঘটনার পশ্চাদপটে এই আইন এবং বিদ্যাসাগর ও শশধরের প্রতি-ক্রিয়ার সঙ্গে আমরা বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করতে পারি। বিদ্যাসাগর এবং শশধর কেউই এই আইন সমর্থন করেন নি, বরং শশধর এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সোরগোল তোলেন। এই আইন প্রণয়নের পিছনে বিদ্যাসাগরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যৌনমিলনের মাধ্যমে আইনসিদ্ধ বিবাহের ক্ষেত্রে বয়স উল্লেখের কথাটি বাতিল করে সেই স্থানে প্রথম ঋতু দর্শনের কাল নির্দিষ্ট করতে। তাঁর আপত্তির কারণ সুস্পষ্ট—শাস্ত্রের নির্দেশ যে, প্রথম ঋতু দর্শনের পরেই কন্যার পক্ষে যৌনক্রিয়া আবশ্যিক এবং যে সব পিতামাতা ঐ সময়ের পূর্বে কন্যার বিবাহ দেন না তাঁরা অভিশপ্ত। ভারতবর্ষের মেয়েরা যেখানে সাধারণতঃ বারো বৎসর বয়সের পূর্বেই ঋতুবতী হয়, সেখানে শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য নিয়ে বিদ্যাসাগর অনভিপ্রেতভাবে হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানান। আরো দুঃখজনক বিষয় এই যে ঋতুবতী হলে এগার বছর বয়সের কন্যার সঙ্গেও যৌনমিলন সমর্থন করা।[৮] কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে শাস্ত্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য তাকে বাল্য বিবাহের কু-ফলের বিরুদ্ধে কোন ন্যায়-সঙ্গত পন্থা অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, ঐ আইনে তাঁর ঐ সংশোধন প্রচলিত রীতির প্রতি তাঁর সমর্থনকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

এই আইনের প্রতি বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়া একেবারেই ভিন্ন। এই আইন সম্পর্কে বঙ্কিম কেন একদিকে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন এবং অন্যদিকে আইনটি কার্যকরী হলে মালাবারির প্রতি তীব্র আক্রমণ করেছিলেন—বুঝতে হলে আমাদিকে দুটি বিষয় স্মরণ করতে হবে। বঙ্কিম জানতেন যে ঐ আইনের প্রতি শশধরের বিরোধিতা চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীক। আবার অন্যদিকে বিদ্যাসাগরীয় সমাজ সংস্কারের পদ্ধতিকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি এরকম সংস্কারের বিপদ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন, যেখানে শাস্ত্রের বিধান অনুসারেই সামাজিক কুপ্রথাকে অপ-

সারণের চেষ্টা করা হয়। আবার এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই পন্থাটি সামাজিক প্রথার চেয়েও নিকৃষ্ট।[৯] একই সময়ে তিনি মালবারির মতো উদার সংস্কারকদের অনুসৃত পথের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কারণ মালবারির আক্রমণের লক্ষ্যের ফলশ্রুতিতে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল সে আইনে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কেই যৌন অপরাধী ও নাবালিকা ধর্ষণকারীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে বিতর্ক ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট। তিলকের মন্তব্যকে মিস্টার হ্যাইম্স্যাথ (Mr. Heimsath) এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন :—"আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জভাবে এক অসভ্যজাতিরূপে চিত্রিত হয়েছি; সমাজ সংস্কারকগণ নির্লজ্জভাবেই তা প্রমাণ করেছে, এই সমাজ-সংস্কারকগণ অন্য একটি জাতি গড়ে তুলুক। আমাদের স্ব-জাতীয়দের মধ্যে এরূপ বন্ধুরূপী শত্রুদেরকে থাকতে দেওয়া আদৌ উচিত নয়"।[১০]

বঙ্কিমের ভাষাও আইনটির প্রতি নয়, আইনের জনকের প্রতিই নিক্ষিপ্ত :

"সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবারি নামে এক পার্শী সেদিন একটা হুলুস্থুল উপস্থিত করিয়াছিল (সেই শ্রেণীর মানুষের কাছে উন্মুক্ত যারা রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজ সংস্কার বা সমাজ বিপ্লব উপস্থিত করিতে চান)"।[১১]

এর অর্থ সুস্পষ্ট। বঙ্কিমের আক্রমণ সংস্কারের প্রতি যতটা না উদ্দীষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশী মালাবারির দলের সমাজ সংস্কারকদের প্রতি। যে সমাজের কল্যাণের জন্য মালবারি গোষ্ঠী আন্দোলন করছিলেন সেই সমাজকেই মসীলিপ্ত না করে তাঁরা নিবৃত্ত হতেন না। উপরন্তু তাঁদের সংস্কার কর্ম পরিচালিত হয়েছিল সহযোগী শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই, আর এই শাস্ত্রকে তাঁরা মনে করতেন সৃষ্টির প্রভাতে সৃষ্ট বিধিনিষেধের নিয়মাবলী, যার অংশবিশেষ নক্কারজনক এবং নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়। বঙ্কিমের সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি তাই বিদ্যাসাগরীয় কিংবা মালাবারি গোষ্ঠীর অনুসৃত পথ হতে যে ভিন্নতর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

(খ) বিবেকানন্দ ও সমাজ-সংস্কার

বিবেকানন্দ সমাজ-সংস্কারকদেরকে আক্রমণ শুরু করেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্কিমের মালাবারিকে আক্রমণের ঠিক পাঁচ বৎসর পরে। সমাজ-সংস্কারকদের কাজকে কেন্দ্র করেই এটি ঘটেছিল। আমেরিকায় বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম প্রচার প্রতিষ্ঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী এবং বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর নির্বিকার নীরবতার ফলে সমাজ-সংস্কারকেরা তাঁর প্রতি মিথ্যা নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরে এলে তাঁরা এই বলে হট্টগোল বাধিয়ে দেন যে, শূদ্র বংশজাত বিবেকানন্দের পক্ষে ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট পোষাক পরার অধিকার নেই।[১২]

গোঁড়া হিন্দুর কাছে বিবেকানন্দের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার আগ্রহে তাঁরা নিজেদেরকেই হাস্যাস্পদ করেছেন, কারণ একমাত্র তাঁরাই সবচেয়ে অন্তিম গোষ্ঠী যাঁরা বিবেকানন্দের বর্ণ নিয়ে মিথ্যা নিন্দা করেছেন। সন্ন্যাসীর ব্রাহ্মণত্ব অনুসন্ধানে আগ্রহী সমাজ-সংস্কারকগণকে তাঁদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে আস্থাশীলও বলা যায় না। কিন্তু এ ব্যাপারে দৃশ্যতঃ আত্মবিদারণকারী প্রয়াসের স্বপক্ষে তাঁদেরও যুক্তি ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন বিবেকানন্দকে ভগ্নোদ্যম করে নিজেদের দলে টেনে নিতে। কারণ তাহলে বিবেকানন্দের মর্যাদা ও প্রভাব তাঁদের বাঞ্ছিত সংস্কারে প্রয়োগ করা যাবে।[১৩] এর উত্তরে স্বামীজীর মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে এসেছিল তা তাঁর বাগ্মিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রচার পরিকল্পনা (Plan of Campaign) সম্পর্কে তাঁর ভাবনা তিনি মাদ্রাজের এক জনাকীর্ণ সভায় ব্যক্ত করেছেন। সেই ভাষণের পূর্ণ বয়ানে আমাদের প্রয়োজন নেই, সংক্ষিপ্ত অংশ উল্লেখ করছি। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামত সেখানে সুস্পষ্টভাবেই বিবৃত হয়েছে। তিনি সার্বিক বিচারে সমাজ-সংস্কারক সংস্থাগুলিকে 'নিন্দাবাদকারী সংস্থা' বলে চিহ্নিত করে প্রশ্ন করেছেন :

"(শত বৎসরের সংস্কার আন্দোলনের ফলে) অত্যন্ত জঘন্য ভৎ'সনামূলক ও নিকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া আর কি কল্যাণ সাধিত হয়েছে...? যতদিন পর্য্যন্ত না গোঁড়া হিন্দুর দল তাঁদের গলা চেপে তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁদেরই অস্ত্র প্রয়োগ করেছে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁরা কেবলই গোঁড়া হিন্দুদের সমালোচনা করেছেন, নিন্দা করেছেন, গালি পেড়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, প্রত্যেকটি আঞ্চলিক ভাষায় এমন সব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে যা সমগ্র জাতির লজ্জা, দেশের লজ্জা। এর নামই কি সংস্কার ? এতে কি জাতির গৌরব বাড়ে" ?[১৪]

এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, সহবাস সম্মতি আইনকে কেন্দ্র করে যে অশালীন সমালোচনা এবং তাঁর নিজের চরিত্র নিয়ে যে 'সাহিত্য' সৃষ্টি হয়েছিল উদ্ধৃত অংশে বিবেকানন্দ তারই ইঙ্গিত করেছেন। এরূপ ধারণার আরো সম্ভাব্য যুক্তি এই যে, গোঁড়া হিন্দুদের দ্বারা সংস্কারকের অস্ত্রই সংস্কারকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার প্রসঙ্গ এ ধারণা ছাড়া পরিষ্কার হয় না। এ অনুমান সঠিক হোক কিংবা নাই হোক, সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী মালাবারি গোষ্ঠীর সংস্কারকদের প্রতি বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অভিন্ন।[১৫] তাঁরা একই যুক্তিতে সমসাময়িক সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে নিন্দা করেছেন, কারণ যে সমাজকে সংস্কার করতে তাঁরা উদ্যত সেই সমাজের ভিত্তিমূলেই তাঁরা আঘাত করেছেন।

(গ) সংস্কার ও পুনর্জীবন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষাপটেই আমরা বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের সংস্কার

পরিকল্পনার বিচার বিশ্লেষণ করব। তাঁদের কেউই সমকালীন সংস্কার পরিকল্পনায় আগ্রহী ছিলেন না। এমন নয় যে, তাঁরা শশধর তর্কচূড়ামণি এবং অন্যান্য গোঁড়া নেতার মতো হিন্দুধর্মকে প্রচলিত দোষত্রুটিসহ রক্ষা করতে চেয়েছেন; তাঁদের বিচারে তথাকথিত সমাজ সংস্কারকেরা গাড়ীটিকে জুতেছেন ঘোড়ার আগেই। বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণই আদর্শ সমাজ সংস্কারক। শ্রীকৃষ্ণ 'রাক্ষস বিবাহের'[২৬] মতো একটি নিকৃষ্ট প্রথার উচ্ছেদ না করে নিজের বোন সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ দিয়ে এই প্রথারই সুপ্রয়োগ করেছিলেন। সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নেবার পরিবর্তে তিনি সত্যধর্ম প্রচার ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বঙ্কিমের ভাষায় "দেশের নৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্জীবন, ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজ সংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে, ইহা না ঘটিলে সমাজ সংস্কার কোনমতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন, জানিতেন গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা (মৃত) ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না···তাই আদর্শ মানুষ মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই"।[২৭]

সামাজিক প্রশ্নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এই-ই—সংস্কারের পরিবর্তে পুনর্জীবনের। বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীও অনুরূপ। মাদ্রাজ বক্তৃতায় তিনি সংস্কারকদের সংস্কার পদ্ধতিকে 'ধ্বংসাত্মক' বলে অভিহিত করেছেন, অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিকে বলেছেন 'বিকাশের'[২৮] পদ্ধতি। শোভাবাজার রাজপরিবারের কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখা চিঠিতে বঙ্কিম নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই চিঠিতে বঙ্কিম বিনয়কৃষ্ণের সমুদ্রযাত্রা আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের এই সমর্থনের দৃষ্টিভঙ্গী কুমার বিনয়কৃষ্ণের গোঁড়া মানসিকতা হতে স্বতন্ত্র। বিনয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগরীয় পদ্ধতিতে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং হিন্দুদের সমুদ্র-যাত্রার জন্য শাস্ত্রীয় অনুমোদনের সন্ধান করছিলেন।[২৯] খাঁটি হিন্দুর মধ্যে সমুদ্রযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ তা ব্যাখ্যা করার জন্য বিনয়কৃষ্ণের পত্রোত্তরে বঙ্কিমের চিঠিটি[২০] লেখা। বঙ্কিম যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় অনুশাসন একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, এবং শাস্ত্রীয় অনুমোদন কিংবা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংস্কার দুই-ই অসার। তাঁর মতে, "দেশে কোনরূপ নৈতিক এবং ধর্মীয় পুনর্জীবনের অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে সামাজিক রীতিনীতির সুদূর-প্রসারী পরিবতন কার্যকরী করা যায় না"। সমাজ, তাঁর মতে, চলে দেশাচারে, শাস্ত্র দিয়ে নয়, এই দেশাচার যতই ভ্রান্ত হোক "নীতিবোধ এবং ধর্মের পরিবর্ত্তন না এলে দেশাচারের পরিবর্তন সম্ভব নয়"। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই তিনি সমুদ্রযাত্রার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণের সনাতন ধর্মনীতি অনুযায়ী সমাজ কল্যাণের পরিপূরকরূপেই এটি সমর্থনীয়। বঙ্কিমের মতে শাস্ত্র সনাতন

রীতির অধীন, এবং দেশে ধর্মের ও নৈতিক পুনর্জীবনের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সনাতন রীতি আর কিছুই নয়।”

বিবেকানন্দের ভাষাও অনুরূপ : “ভারতবর্ষে সর্বপ্রকার (সামাজিক) উন্নয়ন সর্বাগ্রে ধর্মে উজ্জীবন দাবী করে। ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক অথবা রাজনৈতিক চিন্তার বন্যা ডাকিবার পূর্বে আধ্যাত্মিক ভাবনার প্লাবন বহাইয়া দাও। যেই কর্মটি সর্বাগ্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা হইল আমাদের উপনিষদে, ধর্মগ্রন্থে, পুরাণে যেই সকল বিস্ময়কর তথ্য ও সত্যবন্দী হইয়া আছে, গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে এবং মুষ্টিমেয় মানুষের সংস্থা হইতে সেই সব উদ্ধার করিয়া আনিয়া সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া প্রচার করিতে হইবে যাহাতে ঐ সব সত্য অগ্নির ন্যায় উত্তর দিগন্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্তে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে”।[২১]

(ঘ) পুনর্জীবনের নব্য-হিন্দু পরিকল্পনা

সুস্পষ্ট যে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের মতো নব্য-হিন্দু নেতারা সমাজ পুনর্জীবন বিষয়ে সমসাময়িক সংস্কারকদের মতো বিবাহ কিংবা যৌনমিলনের মাধ্যমে সিদ্ধ-বিবাহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। আরো পরিষ্কার যে তাঁরা প্রত্যাশা করছিলেন আরো মৌলিক সংস্কারের, যে সংস্কার আরো প্রত্যক্ষ পরিবর্তন আনতে সমর্থ হবে। বিবেকানন্দের বাণী ছিল ‘শূদ্রের জাগরণ’। আমরা দেখি তাঁর চরিত্রের কী তীব্র বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে সমগ্র ভারত ও সাগরপারে তাঁর বিরামহীন পর্যটনে। তাঁর বাণী যে নিছক বেদনার্ত ভাবাবেগ নয়, বরং ভারতের মহতী প্রয়োজনের সোচ্চার অভিব্যক্তি, তা স্বামীজীর বাস্তব পদ্ধতির ব্যাখ্যার মধ্যেই পরিস্ফুট। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও তিনি বঙ্কিমের সঙ্গে একমত। এই সূত্রে বঙ্কিমের শূদ্র জাগরণের আলোচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ‘বঙ্গদর্শনের’ প্রথম দিকে প্রকাশিত বঙ্কিমের বহু-নন্দিত প্রবন্ধ ‘বঙ্গদেশের কৃষক’-এর উল্লেখ করেছি। জনসাধারণের কাছে কৃষক-দের অবস্থা তুলে ধরার প্রথম প্রচেষ্টা যদিও এই প্রবন্ধটি নয়, তবু এটি একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ। প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের সময় থেকেই বাংলার কৃষকদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু বঙ্কিমের প্রবন্ধ আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই অর্থে যে ভারতের অবনতির ইতিহাসের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে শূদ্র সম্প্রদায়ের অধোগতির কাহিনী সর্বপ্রথম এই প্রবন্ধে যুক্ত হয়েছে। এবং এর বিশ্লেষণেও বঙ্কিম মৌলিক দৃষ্টির অধিকারী। তিনি মিশনারী (ও ব্রাহ্ম)-দের উদ্ধৃত বহু ব্যবহারে জীর্ণ জাতিভেদের কুফলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নি,

বরং শূদ্র সম্প্রদায়ের দারিদ্রের জন্য ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবিদের প্রাথমিক উত্থানকে দায়ী করেছেন—যে ঘটনা বহু প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণ মানুষকে পদানত করে রেখেছে। প্রচলিত ধারনার সঙ্গে সঙ্গতিহীনভাবে বঙ্কিম দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষকে পদানত করে রাখার পরিণতিতে ব্রাহ্মণরা নিজেরাই নিজেদের অবক্ষয় ডেকে এনেছিল, অন্য কোন পথে নয়। নিজেদের কল্যাণ সাধনের জন্য ব্রাহ্মণদের উচিত শূদ্রের পক্ষাবলম্বন করা। জাতিভেদ প্রশ্নে ব্রাহ্মণ বিলোপের পক্ষে যে সব সমাজ সংস্কারক অবিরাম প্রচার চালিযেছিলেন—তা থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। উপরন্তু বঙ্কিমের মত এই যে, হিন্দুয়ানীতে কুসংস্কারের অনাবশ্যক বাহুল্য উচ্চশ্রেণীর অবক্ষয়ের ফল। স্মৃতিশাস্ত্র, বিশেষ করে শূদ্রদের কাছে টোপ হিসেবে ব্যবহৃত শাস্ত্রসমূহকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরীয় গোষ্ঠী যে সংস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন, সে পরিকল্পনাও ছিল সেই একই অবক্ষয়ের ফল। তাই ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সামাজিক সমস্যার সর্বপ্রধান বিষয় নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নকে সর্বাগ্রে এবং সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে বঙ্কিম তথাকথিত সংস্কারকদের পরিকল্পনাকে বর্জন করে তাঁদের চেয়ে আরো সুদূরপ্রসারী বক্তব্যে নিমগ্ন হয়েছেন। ভারতবর্ষের অবনতি যে এদেশের নিম্নশ্রেণীর অবনতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের এই অন্তর্দৃষ্টিকে বিবেকানন্দ একটি শক্তিশালী সামাজিক বাণীতে পরিণত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক গোষ্ঠীর তথাকথিত রুটিনমাফিক সমাজ সংস্কারের কর্মসূচী কার্যতঃ অর্থহীন। "বিগত শতাব্দীর প্রায় সব সংস্কার আন্দোলনই ছিল বহিরঙ্গের অলঙ্কারের মতো"[২২], মাদ্রাজের সভায় বিবেকানন্দ বলেছেন, "শতকরা সত্তরজন ভারতীয় নারীকে বিধবা বিবাহ স্পর্শ করবে না, এবং এইসব বিষয় জনসাধারণের অর্থে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসীর কাছেই কেবল পৌছাবে"।[২৩] তিনি একে সংস্কার নামে অভিহিত করতে অস্বীকার করে বলেছেন, সংস্কারের নামে এরা "আপন ঘরে ঝাড়ু দিচ্ছেন"। তিনি মন্তব্য করেছেন "সংখ্যালঘুর স্বেচ্ছাচার বিশ্বের নিকৃষ্টতম স্বেচ্ছাচার। তিনি আরও বলেছেন, সংস্কারকেরা হলেন জাতীয় জীবনের মূল স্রোত হতে বিচ্ছিন্ন কতিপয় উচ্চবর্ণের মানুষ। জাতি প্রকৃতই কী অনুভব করছে, অথবা কী আশা করছে এ সবকিছু হৃদয়ঙ্গমের সামান্যতম চেষ্টা না করে তাঁরা নিজেদের খেয়াল খুশির চরিতার্থতায় জাতিকেই বলি দিচ্ছেন।

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এমন এক ধর্মীয় গোষ্ঠী তৈরী করতে যাঁরা (ক) সেকুলার এবং আধ্যাত্মিক উভয় শিক্ষায় জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবেন; (খ) যাঁরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে দরিদ্রের সেবা করবেন, বিশেষতঃ বিপদের সময় সাহায্যের কর্মসূচী নিয়ে এবং সারা বৎসর ধরে পীড়িতের ও অক্ষমের সুশ্রূষায় নিযুক্ত থেকে ; এবং (গ) যাঁরা ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ধ্যানধারণা বিনি-

ময়ের একটি সংস্থা গড়ে তুলবেন, হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিকতা পশ্চিমে প্রচার করবেন এবং পরিবর্তে ভারতের দরিদ্র জনগণকে নিজেদের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য অর্থ ও জ্ঞান সঞ্চয় করে আনবেন।

বলা বাহুল্য যে, এই লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে বিশেষ একটিকে সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণ যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেননি, আমরা সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাই।

সেই দিকটি হল—দরিদ্রকে শিক্ষাদান, আর্তের সেবা এবং হিন্দু আধ্যাত্মবাদ প্রচারে পাশ্চাত্য দেশে সন্ন্যাসী প্রেরণ। এসব কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। দশ বৎসর বয়সের বিধবা কিংবা বার বৎসর বয়সের কন্যার উপর পয়ত্রিশ বৎসর বয়সের স্বামীর যৌন অত্যাচার থেকে কেন এইসব বিষয় শ্রেষ্ঠতর? এই রূঢ় প্রশ্নে বিবেকানন্দের (এবং বঙ্কিমের) সামাজিক পরিকল্পনাকে তাৎক্ষণিক বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা সহজ নয়, মনে রাখা দরকার যে, বিবেকানন্দের প্রয়াস আধ্যাত্ম আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তুলনীয়ভাবে অন্য সবই তার আধ্যাত্ম নির্দেশের কাছে অপ্রধান। শত শত মন্ত্র পড়ে বিধবা বিয়ে দেওয়া আধ্যাত্মিকতা নয়, বড় জোর সধবা নারীর কাছে যে—পার্থিব সম্ভোগ নিত্যলভ্য তার দ্বার খুলে দেওয়া। কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে সকল জাতির দরিদ্র নারায়ণ ও আর্ত নারায়ণের সেবা আধ্যাত্ম কর্ম—সে কর্ম ব্যর্থ হলেও অস্তিত্বকে গৌরবমণ্ডিত করে। বঙ্কিমের 'পুনর্জীবন' এবং বিবেকানন্দের 'উন্নয়নে'র এই-ই তাৎপর্য। এই পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যকে মনে রেখেই উনিশ শতকের সংস্কারকদের এবং নব্যহিন্দু চিন্তানায়কদের তুলনামূলক সাফল্যের হিসাব নিকাশ শুরু করতে হবে।

স্বাভাবিক মূল্য ছাড়া ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা অবশ্যই বলব বিবেকানন্দের মতো মানুষের তুলনায় সংস্কারকদের সাফল্য একেবারেই নগণ্য। মিথ্যে নয় যে, বিবেকানন্দ এমন একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী পাননি যাঁরা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাদান করবেন। আজও পর্যন্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও অধঃপতিত থেকে গেছেন। কোটি কোটি ভারতবাসীর দরিদ্র, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা দূরীকরণের এই মৌলিক বিষয় সমাধানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মিশন'-ও সামান্যতম সফল হয়েছে। তবু প্রশ্নাতীতভাবেই বিবেকানন্দ নব ভারতের প্রথম জনপ্রিয় (Populist) নেতা, বঙ্কিম তাঁর মনস্বী পূর্বসূরী, এবং এঁদেরই পদাঙ্ক গভীরভাবে অনুসরণ করে, দরিদ্রের সেবাকারী, আরো বেশী সফল উত্তর সাধক মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীর সমাজসেবা পরিকল্পনা বিবেকানন্দের পরিকল্পনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাঁরা উভয়ই রাজনৈতিক ও আইনগত দিক থেকে পৃথক দরিদ্র সেবার আধ্যাত্মিক দিকের উপর জোর দিয়েছেন।

(ঙ) নব্যহিন্দু সংস্কারের পরিকল্পনা

বঙ্কিমের 'পুনর্জীবন'বাদ ও বিবেকানন্দের 'উন্নয়ন' মতাদর্শের সীমার মধ্যে সঠিকভাবে সংস্কারকে অন্তর্ভুক্ত না করা গেলেও, সংস্কারের স্তরে এই দুই চিন্তাবিদ হিন্দুর আচার সর্বস্ব প্রাণহীণ পুজাপার্বনের মরাগাঙে নবীন মুক্তবায়ুর স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। এই আচার সর্বস্ব ধর্মীয় কর্মযজ্ঞই চরম অনিষ্টকারী, গোঁড়া ও ধিকারজনক জাতিভেদের জন্য অনেকাংশে দায়ী। খাদ্যকে ধর্মের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলার জন্য বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন থেকে ব্রাহ্মরাও উপবীত পরিত্যাগ করা এবং ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ একত্র ভোজনের উপর জোর দিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এটি সংস্কারের হাস্যকর প্রয়াস, কারণ উপবীতধারণ করা ও না করার মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাবের কোন যোগ নেই। বঙ্কিম ব্রাহ্মণদের উপবীত ধারণ করতে নিষেধ করলেন না, আবার একই সময়ে সেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করলেন "যিনি প্রভাময় পবিত্র উপবীত কণ্ঠে পরিধান করেন, কিন্তু দিন যাপন করেন হিংসা দ্বেষ ও ব্যাভিচারের মধ্যে।" এইভাবে তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতির ফলে একটি যুগের অবসান হল—যখন উপবীত পরিত্যাগ করা ছিল একটি বৈপ্লবিক কাজ এবং উপবীত পরিধান করা ছিল আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশের সহজতম প্রবেশ পত্র। তিনি তাঁকে হিন্দু বলে স্বীকার করতে সম্মত নন, "যাঁর নেই সেই জ্ঞান এবং যিনি জানিতে চেষ্টাও করেন নাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্য। যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকে অনিষ্ট করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোছা করা পৈতা থাকিলেও তাঁহাকে হিন্দু বলিব না"।[২৪] আবার তিনি সোচ্চারে বলেন, "মহাত্মা ঐ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেন সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠগুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র"।[২৫] তিনি প্রস্তাব করেন, "কছিমুদ্দি শেখকে দিয়ে মুরগী রন্ধন করাইয়া দুর্গাপূজায় ভোজন পরিবেশনের আয়োজন করাইব। যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই হিন্দুধর্ম তখন হিন্দু ও মুসলমান এ ছোট জাতি ও বড় জাতি এরূপ ভেদজ্ঞান করিতে নাই"।[২৬] বঙ্কিম এমনিভাবেই নীরবে এবং বিপ্লবের চকমকি না জ্বালিয়েই একটি নূতন যুগের সূচনা করলেন—যে যুগে জাতি ও খাদ্য হিন্দুধর্মের সারকথা নয়।

বঙ্কিমের সংস্কার পরিকল্পনাটি ছিল এ রকম: অন্যান্য সংস্কারকদের মতো বঙ্কিম প্রস্তাব করেন নি যে জাতপাত রীতি বিলোপই সংস্কারজাত (reformed) হিন্দু সমাজের অপরিহার্য পুর্বশর্ত। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের মূলনীতির প্রতি আবেদন জানিয়ে এবং কেবলমাত্র মূলের সঙ্গে যেখানে জাতপাত রীতির বিরোধ বাধে সেখানে নিন্দা করে ঐ রীতিকে বিলোপ করতে। বঙ্কিম জানতেন যে

যেমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁরা মুসলমানের পরিবেশিত খাদ্যকে অপবিত্র বলে ঘৃণা করেন এবং সেই মুসলমানের প্রতি তাঁর ঘৃণাকে গোপন করেন না, তেমনি ভূদেবের মতো ব্রাহ্মণও আছেন, যাঁরা মুসলমানের সঙ্গে স-পংক্তি ভোজন পরিহার করলেও তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদারমনা। অতএব রীতির বিলোপ কেবলমাত্র সেখানেই প্রস্তাবিত হয়েছে—যেখানে অধ্যাত্মিক পর-হিতৈষার সঙ্গে বিরোধ বেঁধেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বঙ্কিমের 'পুনর্জীবনের' পরিকল্পনা সংস্কারেরই পরিকল্পনা। বঙ্কিমের উপরোক্ত মতামত বিবেকানন্দের সংস্কার পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে অস্থূয়া জাতিভেদ প্রথা হিন্দুদের বিভক্ত করে রেখেছে গোঁড়া হিন্দু সমাজের সেই শক্তিশালী জাতিভেদ প্রথা, বিবেকানন্দ যাকে অস্পৃশ্যতা বলতেন, তার উপরে বিবেকানন্দের আক্রমণ সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর সময়ের হিন্দুদের কাছে যা ছিল হিন্দুত্বের সারবস্তু সে-সব নিয়ে লেখা বিবেকানন্দের চিঠিপত্র (বিশেষ করে বাংলায় লেখাগুলি) সে সব প্রথার প্রতি লজ্জা, পরিহাস এবং পর্বত প্রমাণ অমর্যাদার সত্যিকার অস্ত্রাগার বিশেষ।

বিবেকানন্দের চিঠিপত্র যাঁরা গভীরভাবে পাঠ করেছেন তাঁরা এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে বঙ্কিমের অভিন্নতা স্বীকার করবেন। বঙ্কিমের মতোই বিবেকানন্দও যখনই হিন্দুরীতির জাতপাতের প্রসঙ্গ তুলেছেন, তখনই হিন্দুধর্মে জাতিভেদের বিরুদ্ধে যে সুস্থ মতবাদ তার তুলনা করতে ভোলেননি। এবং এও স্পষ্ট যে তিনি মালাবারীয় পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান নি। এমন কি ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে স-পংক্তি ভোজনের যে বিজয় ঘোষণা সে সম্পর্কেও তিনি কোন কঠোর মত বা পথ অবলম্বন করেননি—কেবলমাত্র তা যখন সত্যকার হিন্দু নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে তখন ছাড়া। 'The Dialogue Between the Swami and His disciple' এর সংকলক একটি উদাহরণ দিয়েছেন—স্বামীজী জনৈক ব্রাহ্মণকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কেবল চা-পানে সম্মত করেছিলেন, অন্যত্র তিনি কেবল বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণদের জাতিভেদ না মেনে একত্র ভোজনের উপর জোর দিয়েছেন। সত্য যে, জাতি শিথিলতার সমর্থক হয়েও এমনকি ভগিনীনিবেদিতার মতো মহিলার খাতিরেও তিনি এমন আইন প্রয়োগে সম্মত ছিলেন না যা সমগ্র হিন্দু সমাজকে জড়িয়ে ফেলে, একগুঁয়েমির প্রচণ্ডতায় তিনি অস্পৃশ্যতার মতো সর্বনাশা দুষ্ট ব্যাধিকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে সচেষ্ট হননি, বরং সতর্কতার সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুর আচার-আচরণ মেনে নিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই আচার-আচরণ জাতির প্রতি ঘৃণায় রূপান্তর লাভ করেছে। মিস্ ম্যাকলয়েড (Miss Macleod) এর বর্ণিত ঘটনায় বিষয়টি আরও বেশী উদ্ঘাটিত হয়েছে। আলাসিঙ্গ পেরুমল ছিলেন বিবেকানন্দের ঘনিষ্ট শিষ্যদের অন্যতম। মাদ্রাজী

ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হওয়ায় অত্যন্ত গোঁড়া পরিবেশেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অস্পৃশ্যতার কঠোরতা মেনে চলতেন। বিবেকানন্দ কিন্তু কখনই তাঁকে তাঁর অন্ধবিশ্বাসের সামান্যতম অংশও পরিত্যাগ করতে বলেন নি। আমেরিকা থেকে সদ্য আসা মিস্ ম্যাকলয়েড এই আলাসিঙ্গ পেরুমলের কপাল জুড়ে রমনীয় অথচ অদ্ভুত বৈষ্ণবীয় চিহ্ন দেখে আশ্বস্ত হতে পারেননি। তিনি বিবেকানন্দের একান্ত সাক্ষাতে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তাঁর নিজের কথায়: "স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ফিরে তাকালেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে বললেন, 'থামো'! তুমি এ পর্য্যন্ত কি করেছ? কি করেছি আমি নিজেই জানি না। সুতরাং আমি উত্তর দিই নি। আমার চোখে জল, আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। পরে জেনেছি মিস্টার আলাসিঙ্গ পেরুমল একজন ব্রাহ্মণ, মাদ্রাজের এক কলেজে দর্শন শাস্ত্র পড়িয়ে একশত টাকা পান, বাবা, মা, স্ত্রী ও চার সন্তানের ভরণপোষণ করেন, ইনিই বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্ত্য দেশে পাঠানোর জন্য দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই পেরুমল না থাকলে আমরা কখনোই বিবেকানন্দকে পেতাম না"।[২৭] স্পষ্টতই, যে সংস্কারকেরা ম্লেচ্ছদের সঙ্গে স-পংক্তি ভোজন করে এবং যাদের বৈষ্ণবীয় কিম্ভূত চিহ্ন নেই সে রকম শত সংস্কারকদের চেয়েও কঠোর বর্ণরীতির প্রতি অন্ধশ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী আলাসিঙ্গ পেরুমলের মতো মানুষ বিবেকানন্দের কাছে বেশী দামী।

উনিশ শতকের ব্রাহ্ম সমাজ এবং অন্যান্য সংস্কারক গোষ্ঠী যে সংস্কার দাবী করেছিলেন, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ তৎকালীন সেই প্রগতিশীল মতের নিছক আবৃত্তি করেন নি, পুনর্জীবনের মৌলিক ভাবনা নিয়ে তাঁরা সমাজমনে সংস্কারের দৃঢ় মতকে প্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে গোঁড়া হিন্দু সমাজের খাদ্যাখাদ্যের বিরুদ্ধে ধর্মসংক্রান্ত অন্যান্য নিষেধের বিরুদ্ধে সংস্কারকদের বজ্র নির্ঘোষের তুলনায় 'অস্পৃশ্যতার' বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের আক্রমণ আমাদের কাছে অনেক বেশী যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।

সমসাময়িক সংস্কারকদের দুটি সংস্কার পরিকল্পনার প্রতি বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বঙ্কিম অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করতেন, কিন্তু এ নিয়ে আন্দোলন করেন নি। বিবেকানন্দও বাল্য বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এই প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে তুলতে তাঁর শিষ্যদেরকে কোন নির্দেশ দেন নি। এর ফলে বিরোধী সমালোচকগণ এঁদের বিরুদ্ধে 'পুনরুত্থানের' (revivalism) অভিযোগ তুলে হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ করে দেন। কিন্তু কেন এই দুই চিন্তাবিদ্গণ তৎপর ক্রিয়ানুশীলনে প্রবৃত্ত হন নি, তাঁরা তা আদৌ বুঝতে পারেন নি।[২৮]

গীতার ব্যাখ্যা আলোচনায় বঙ্কিম সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, গীতায় অসবর্ণ

বিবাহের বিপক্ষে অনুশাসন খোঁজা নিরর্থক। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ধর্মোপদেশের সামগ্রীক লক্ষ্যই ছিল কুলধর্ম সম্পর্কে অর্জুনের পূর্ব সংস্কারকে আরো পবিত্র ও সমুন্নত ধর্মবোধের দ্বারা পরিশীলিত করে তোলা।[২৯] তিনি প্রমাণ করতে সদা প্রস্তুত এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে অত্যন্ত 'প্রগতিবাদী'র (Progressirist) মতো আড়ম্বর সহকারে এই প্রসঙ্গের মন্তব্য টেনেছেন—"বর্ণের সংমিশ্রণ আধুনিক সমাজের পক্ষে উপকারী"।[৩০]

এই মন্তব্য থেকে কেউ যদি এমন সিদ্ধান্তে লাফ দেন যে কেশবচন্দ্র সেন বা অন্যান্যদের মতো বঙ্কিমেরও উচিত ছিল অসবর্ণ বিবাহের স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলা, তাহলে তাঁরা বঙ্কিমকে ভুল বুঝবেন। বঙ্কিম আসলে বিবাহের নতুন পথ খুলে দেওয়ার চেয়ে জাতি মিশ্রণের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিধিনিষেধ অপসারণে বেশী উৎসাহী ছিলেন। জাতি সম্পর্কে ধর্মীয় বিধি নিষেধকে ভ্রান্ত ধর্ম বলে নিন্দা করে বঙ্কিম আবার হিন্দু ধর্মের সেই সত্যকার বৈশিষ্ট্য লক্ষণকে কেবলমাত্র 'সংস্কার' না করে 'পুনর্জীবনে'র স্বপক্ষে জোর দিয়েছেন। বঙ্কিম ভালই জানতেন, বিবাহ-সংস্কারের চটকদার ও ফাঁপা উদারনীতির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে জঘন্যতা ও কলঙ্কের ইতিবৃত্ত। উদাহরণ স্বরূপ, বিদ্যাসাগরের আয়োজিত বিধবা-বিবাহের পাত্র তাঁর অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতে অর্থলাভের লোভে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন এবং অনতিবিলম্বে অন্য কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছেন।[৩১] বঙ্কিমও যদি পুনর্জীবনের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করতেন, তাহলে আরো গুরুতর জঘন্যতার ক্ষেত্রই সৃষ্টি হত। বঙ্কিম বরং হিন্দুদেরকে হিন্দুধর্মের সঠিক আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন, সিদ্ধান্তের দায়ভার তুলে দিয়েছেন ব্যক্তিগত চেতনার উপরে।

বাল্য বিবাহের প্রশ্নে বিবেকানন্দের প্রতিক্রিয়াও ছিল অবিকল। এই রীতির প্রতিবাদে তাঁর কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত কোলাহল সৃষ্টিকারী সংস্কারকদের চাইতেও হাজারগুণ রূঢ় ও উচ্চতারে বাঁধা। তাঁর পত্রে তিনি বারবার শিষ্য ভাইদের উপদেশ দিয়েছেন সমালোচনায় কর্ণপাত না করতে, কারণ, তাঁর মতে, "বারো বছরের কন্যার উপর বলপূর্বক গর্ভসঞ্চারে অধিকাংশ ভারতীয়-ই বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন।"

বিবেকানন্দ না ভেবে পারেন নি যে, নাবালিকা কন্যার উপর বিবাহ চাপিয়ে দেওয়া দানবীয় অবিচার ছাড়া কিছু নয়। এবং এর বিরুদ্ধে কোন ভাষাই তাঁর কাছে খুব বেশী রূঢ় বলে মনে হয় নি। কিন্তু এটা কদাচ সংস্কারের বিষয় নয়, নারীর কাছে নারীর বৈদান্তিক মর্যাদা শেখানোর বিষয়। বিবেকানন্দের মতবাদ নিশ্চিতভাবেই 'নারীমুক্তি'র উদার তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত; এ তত্ত্বকে ছাড়িয়েও বিবেকানন্দের মতবাদ আরো বেশী অগ্রগামী, কারণ বৈদান্তিক ভাবনায় বিবাহকে

ছাড়িয়ে যেতে না পারলে মুক্তি অর্থহীন। এটি কেবল বিবাহ কিংবা অন্যান্য প্রসঙ্গকে নারীর নিজের পছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়া নয়; সংস্কারকদের পরিকল্পিত প্রাপ্ত বয়সে বিবাহের চেয়ে নারীর সন্ন্যাসিনী হওয়ার অধিকার অর্জনের জন্য তিনি বেশী সচেষ্ট ছিলেন।

বঙ্কিম কিংবা বিবেকানন্দ কেউই সে সময়ের স্বীকৃত অর্থে 'সংস্কারক' ছিলেন না, যদিও তাঁদের, বিশেষ করে বিবেকানন্দের প্রচার অভিযান সংস্কারকদের চেয়েও সংস্কার কর্মকে অধিকতর সঠিকভাবে উন্নীত করেছিল। তাঁরা 'সংস্কারক' ছিলেন না প্রথমতঃ এই অর্থে যে, তাঁরা কোন 'সংস্কারক সংস্থা' গড়ে তোলেন নি। দ্বিতীয়তঃ তাদের সংস্কার পরিকল্পনা আইন-নির্ভর নয়, শিক্ষাভিত্তিক। এবং তৃতীয়তঃ গোঁড়া লোকেদের জাতিনিয়ম পালনের অনুমতিতে তাঁরা কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন—তাঁদের সহহিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষে নয়, সহৃদয় ও মিত্রতার সঙ্গে ব্যবহার করে। অন্যদিকে সংস্কারকগণ গোঁড়া চেতনাকে বারে বারে বিক্ষোভ সংগঠনের মধ্যে দিয়ে, আঘাত করাকেই মূল লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

(চ) 'নারীজাতি প্রশ্নে' নব্যহিন্দু মানসিকতা

সমাজ সংস্কার বিষয়ের তথাকথিত নারী জাতী প্রশ্নে বঙ্কিমও বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ ছিল উপরোক্ত বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবেই বুঝে নিতে সাহায্য করেছে। এ প্রসঙ্গে মানতেই হবে বঙ্কিমের মনোভাব বিবেকানন্দের মনোভাবের তুলনায় কিছুটা গোঁড়া বলেই আমাদের মনে ধাক্কা দেয়। বাল্য-বিবাহের প্রতি বিবেকানন্দের তীব্র বিরোধিতা বাঙ্কমের রচনায় একেবারে অনুপস্থিত। অন্যদিকে, মালাবারি গোষ্ঠীর[৩২] সংস্কারকদের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমের ভাষার তীব্রতা, যদিও সেই সংস্কারের প্রতি তাঁর বিরূপতা সোচ্চার, তবু সন্দেহ করার অবকাশ আছে যে, বাধ্যতামূলক বাল্যবিবাহ তাঁর কাছে সামগ্রীকভাবে আপত্তিজনক নয়। তাঁর জীবনের শেষের দিকে 'সাম্যে'র পরিমার্জন এবং সমাজে নারীর স্থান ও মর্যাদা-বিষয়ক অংশটিকে পরিহার করে পুনর্মুদ্রণ[৩৩] এই সন্দেহকেই সমর্থন করে যে, সংস্কারের প্রশ্নে হিন্দু সমাজে নারীর অধিকার বিষয়ে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের দিক পরিবর্তন ঘটিয়ে সুদৃঢ়ভাবে গোঁড়া মতবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মতত্ত্বের নিম্নোদ্ধৃত অংশ ঐ সন্দেহকেই সমর্থন করে।

"শিষ্য : তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রী পুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র ?

গুরু: সাম্য কি সম্ভবে ? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন-পান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি ?"।[৩৪]

পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের প্রশ্নে তাঁর আগেকার মতকে বর্জন করে এই

পর্যায়ে বঙ্কিম এক বিকৃত যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ বঙ্কিম নিজেই তাঁর পূর্বেকার রচনায় ব্যক্ত করেছেন 'দৈহিক বৈষম্য' সামাজিক সাম্যের[৩৫] দাবির বিরুদ্ধে বৈধ যুক্তি নয়। সুতরাং স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দু সমাজে নারীর উপর যে অবিচার হয়ে আসছে তাঁর প্রতি বঙ্কিমের দৃষ্টি-অনীহা নিয়ে আধুনিক সমালোচকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কিছুটা সত্যতা আছে, অস্বীকার করা যাবে না।

এই অভিযোগের বৈধতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এই অধ্যায়েরই শেষ পরিচ্ছেদে। বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রযোজ্য নয়। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র জ্বালাময়ী ভাষণগুলিই প্রমাণ করে যে, ধর্মের নামে তাঁর দেশের মানুষ নারীর উপর যে অবিচার চালিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে সবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি সংস্কার প্রয়াসীদের চেয়েও বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন।

বঙ্কিমের মতো বিবেকানন্দের কাছেও বিবাহের প্রথা পরিবর্তনের প্রয়োজন প্রথম বিবেচ্য বিষয় নয়, যেমন বিবেচ্য সমসাময়িক সমাজ সংস্কারকদের কাছে। তাঁরা উভয়েই হিন্দু সমাজে নারীর স্থানের পুনর্মূল্যায়ণ করতে চেয়েছেন। তাঁরা উভয়েই নিঃশর্তভাবে স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণিত নারী সম্পর্কীয় সংকীর্ণ ধারণা এবং সন্ন্যাস দৃষ্টি-ভঙ্গীর 'নারী নরকের দ্বার' এমন ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন। পরিবর্তে তাঁরা প্রচলিত ধারণার পরিপন্থী সম্পূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন, তান্ত্রিকতার ক্ষীণসূত্রে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। অনেকের কাছেই এসব কিছুটা বা অপ্রীতিকর মনে হয়েছে. কিন্তু বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের হাতে এই ধারণা নবরূপ লাভ করেছে।

তান্ত্রিক তত্ত্বে নারীর যে শক্তিরূপ, বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট ভাবেই তা বলেছেন। এ ধারণা বিবেকানন্দ পেয়েছেন তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের কাছ থেকে। রামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নারীই অমর্ত্যজননীর মর্ত্য প্রতীক। বস্তুতঃ এটি অবশ্যই একটি অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব যা মানুষের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। নারীর মধ্যে বীরাঙ্গনার ধারণাকে ব্যাখ্যা করে এর পথনির্দেশ করেছেন বঙ্কিম। তাঁর উপন্যাসে কী বিস্ময়করভাবে তিনি স্ত্রী-চরিত্র চিত্রনে নারীকে বীরাঙ্গনার সমুচ্চ ও সশ্রদ্ধ আসনে বসিয়েছেন তা বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিমের উপন্যাস— দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম ইত্যাদিতে নারী তাঁর সুগভীর প্রাণসঞ্চারী শক্তি এবং মন ও চরিত্রের ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলতা বিকীরণ করে পুরুষদের চেয়েও ঐশ্বর্যশালিনী ও শক্তিরূপিনী। বঙ্কিমের 'দ্রৌপদী'[৩৬] প্রবন্ধে এই সাহিত্য ভাবনা হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধারণার পুনর্মূল্যায়নের সঙ্গে সহযোগী হয়েছে। এই প্রবন্ধে তিনি পাণ্ডবকুলের বীরাঙ্গনা মহিষীর তুলনা করেছেন হিন্দু সমাজের আদর্শ, আত্মবিলীনকারিণী সীতার সঙ্গে। বঙ্কিম কিন্তু সীতা সম্পর্কে কোন ভ্রান্তমত আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন নি। পুরুষ শাসিত সমাজের স্বেচ্ছাচারের সামনে দাঁড়িয়ে

সীতার আত্মত্যাগউৎকর্ষতার পরীক্ষাকে অতিক্রম করেছে এবং হিন্দু নারীর এক মহৎ আসনে তাঁকে অলংকৃত করেছে। বঙ্কিম কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখেননি যে, নব্যহিন্দু ধারণায় পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদীর চরিত্রে কোমলতার চেয়ে কাঠিন্যের অংশ উজ্জ্বলভাবে প্রাধান্য লাভ করলেও সীতার প্রায় সমমর্যাদায় তাঁর স্থান। নারীত্বের গর্ব ও নারীত্বের দৃঢ়তাকে দ্রৌপদী আপন মর্যাদায় যে ভাবে কৌরব সভায় প্রদর্শন করেছেন, স্বামীর ইচ্ছার সঙ্গে নারী ধর্মের সংঘাত দেখা দিলে স্বামীর ইচ্ছা সম্পর্কে নারী স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী—এই-ই ছিল সমাজ সংস্কারকদের প্রতি বঙ্কিমের উত্তর এবং নারীমুক্তি বিষয়ে তাঁর নব্য হিন্দু মতবাদ।

বিবাহিতা নারীর লক্ষ্য পূর্ণতা তাঁর বিবাহে এবং এই বিবাহই কেবলমাত্র তাঁর স্বামীর প্রতি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ধর্মানুসন্ধানের সংযোগ করেছে—হিন্দু ধারণার প্রথম এবং প্রধান বিশ্বাস ছিল এই। এই চিরায়ত ধারণার সঙ্গে বঙ্কিমের সংযোজন: বঙ্কিম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর চিরায়ত নিষ্ঠার উপরে জোর দিয়েছেন—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পারস্পরিক নিষ্ঠার পরিপূরক রূপে, নারীর আনুগত্যকে শক্তিশালী আত্মপ্রতিষ্ঠা হিসাবে দেখেছেন, নতজানু হয়ে স্বামীর কাছে আত্মবিলোপ রূপে নয়।[৩৭]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নিষ্ঠার অংশ হিসাবে বঙ্কিম নারীর 'সহধর্মিণী' ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। সহধর্মিণী, অর্থাৎ স্বামীর আধ্যাত্মিক কর্মের সহায়িকা। তিনি উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের মাধ্যমে এই বৈচিত্র্যহীন ধারণাকে কবি কুশলতায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা স্বামীর দাসীরূপে চিত্রিতা না হয়ে পরিচালিকা শক্তিরূপেই চিত্রিতা হয়েছেন। 'আনন্দমঠের' শান্তি এবং 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল চিত্রিত হয়েছেন তাঁদের স্বামীর জীবনছাত্রীরূপে স্বামীর প্রতি প্রেমের মহিমার উজ্জ্বলতায় তাঁদের অস্তিত্বকে তাঁরা মহীয়সী করে তুলেছেন, সহানুভূতিতে নয়, বস্তুতঃ এক ধরনের নারীসুলভ নিষ্ঠায়, যে নিষ্ঠা এত উৎকৃষ্ট যে তা দৈব মহিমা লাভ করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কিত ধারণাটিকে সুউচ্চ করেই বঙ্কিম হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদাকে উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন, এবং এই প্রচেষ্টা ছিল চিরাচরিত প্রথাকে যেন আঘাত না করে। যে সংস্কারকগণ মনে করতেন প্রাচীন ঐসব প্রথা এখন অচল এবং আগাগোড়া সংস্কারের প্রয়োজন, নারী বিষয়ের সমস্যার সমাধানে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গী ঐ সংস্কারকগণের দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে একেবারেই পৃথক। আইনানুগ সংস্কারের[৩৮] প্রতি আস্থা না থাকায় বিবেকানন্দ সংস্কারকদের দলে যোগ দেননি[৩৯], অথচ অন্যদিকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই বলেছেন, হিন্দু সমাজে নারীর স্থান

পুরোপুরি কলঙ্কজনক।[৪০] বঙ্কিমের মতোই বিবেকানন্দের নারী সমস্যার উত্তরও নিহিত ছিল হিন্দু সমাজে নারীত্বের আদর্শ উন্নয়নে—যদিও কিছুটা পার্থক্য তাতে বিদ্যমান ছিল। যেমন, প্রথমতঃ তিনি নারীর বীরাঙ্গনার ধারণাকে বৈদান্তিকতান্ত্রিক ভাবাদর্শে সাধারণীকৃত করেছেন; দ্বিতীয়ত, বৈদান্তিক নারী-পুরুষ সাম্যকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে তিনি নারীকে এমনভাবে জীবনযাপনের ক্ষেত্র দিয়েছেন যেখানে অনিবার্য নয় বলে বিবাহও বাতিল হয়ে পড়ে। এভাবেই তিনি নারীকে তার শক্তিপ্রকাশ ও বিকাশের জন্য অধিকতর স্বাধীনতা ও সুযোগ করে দিয়েছেন।

বিবেকানন্দের দ্বিতীয় বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনিই প্রথম হিন্দু সংগঠক যিনি নারীকে সন্ন্যাসিনী জীবন যাপনের স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা এ যাবৎ কেবলমাত্র পুরুষদেরই অধিকারে ছিল। নারীর এই অধিকার ও আচরণ যা বহুকাল পূর্ব থেকেই রোমান ক্যাথলিক এবং বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত ও প্রচলিত ছিল বিবেকানন্দের এই স্বীকৃতি কারো কাছে বৈপ্লবিক না-ও মনে হতে পারে, কিন্তু যে গোঁড়া হিন্দু সমাজে নারীর বিবাহের উপর গুরুত্ব অত্যাধিক এবং স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাই যেখানে নারীর একমাত্র বাঞ্ছিত ধর্মাচার সে সমাজে নারীর এই অধিকার প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক প্রয়াস। সত্য যে, এই অধিকার বাস্তবে রূপদানের জন্য তিনি সন্ন্যাসিনীদের জন্য কোন মঠের প্রতিষ্ঠা করেন নি। বস্তুতঃ তাঁর এই তত্ত্বের গুরুত্ব ছিল সাংকেতিক। ধর্মীয় কিংবা লৌকিক নারীর যে-কোন স্বেচ্ছাবৃত্তি গ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি বাস্তবিকপক্ষে এই-ই প্রথম। বিবাহ আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে সংস্কারকদের যে নারী মুক্তির চেষ্টা তার ত্রুটি লক্ষ্য করে বিবেকানন্দ বলেছেন, কোন মৌলিক অর্থেই সংস্কারকদের পরিকল্পনা হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়মকানুনের চেয়ে নারী স্বাধীনতা বিষয়ে বেশী সহায়ক নয়। "স্বাধীনতাই বিকাশের প্রথম শর্ত। এটা ভ্রান্ত, হাজারবার ভ্রান্ত। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ স্পর্ধাভরে বলেন, 'আমি এই নারীর বা শিশুর মুক্তি সম্পাদন করবো'[৪১] প্রথম নারীকে শিক্ষাদান কর এবং তাঁদের নিজেদের উপরেই ছাড়িয়া দাও, তখন তাহারাই তোমাকে বলিবে কোন্ এবং কী ধরণের সংস্কার তাঁহাদের প্রয়োজন। তাঁহাদের নিজেদের বিষয় প্রসঙ্গে তুমি কে?" এ সকল উক্তি থেকে সুপ্রকট হয় যে বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' স্বাধিকার নারীকেই দেওয়া হোক, ব্যস্ত সমস্ত পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে, নির্দেশের অপেক্ষা না করে আপন জ্ঞানের আলোকে সে গড়ে নিক আপন জীবন। যে যুগে পুরুষেরা বিধবাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তায় কেঁদে মরছেন এবং বিবাহের শৃঙ্খল ছাড়া নারীর মুক্তির কোন পথই খুঁজে পাচ্ছেন না, সেই রকম সময়ে বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছেন তাঁর এই সঞ্জীবনী বাণী।

যে পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের প্রবক্তা বিবেকানন্দ সেই পুনরুজ্জীবিত ধর্মে নারী-ধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের একটি ধারণা, যেটি ভ্রান্ত বলে বহুল প্রচলিত, সেই ধারণার অপনোদন আবশ্যক। কিছু কিছু লেখক বিবেকানন্দের সীতা সম্পর্কে বহু প্রশংসনীয় উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্ত টেনে ভুল করেছেন যে, তাঁর প্রস্তাব হলো অতীতের মতো হিন্দু নারীর আদর্শ প্রতীক হবে আত্মবিলীনকারিণী পবিত্র সেই সীতা। "ভারতবর্ষের নারী সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিকাশ লাভ করিবে এবং পরিপূর্ণতা অর্জন করিবে, এবং সেই একমাত্র পথ।"[৪২] বিবেকানন্দের এই ধরনের উক্তিই সেই ভ্রান্ত ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু সীতা সম্পর্কে বিবেকানন্দের সশ্রদ্ধ উক্তিকে আমেরিকার নারী প্রসঙ্গের অসংখ্য মন্তব্য আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। আমেরিকার নারীরা সাহসিকতায়, স্বাধীনতায়, নতুন ধ্যান-ধারণার গ্রহণ ক্ষমতায় সংক্ষেপে দুঃসাহসিকতার মনোজ্ঞতায় বিবেকানন্দের মনে এমন একটি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল যে যখনই তিনি আমেরিকার নারীদের ভাগ্যের সঙ্গে ভারতীয় নারীদের ভাগ্যের তুলনা করেছেন, ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারী সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণাগুলি তখনই তাঁর মনের মধ্যে সক্রিয় ছিল। 'আমি যদি ভারতবর্ষে এইরূপ সহস্র নারী তৈরী করতে পারি, আমি শান্তিতে মরবো',[৪৩]—তাঁর শিষ্য ভাইদের তিনি লিখেছিলেন। তিনি বীর্যবত্তাকেই সর্বাধিক মূল্য দিতেন। নারীর মধ্যে যেরূপ পুরুষদের মধ্যেও ঠিক তেমনি। তাঁর সময়ে যদি আদৌ সেরকম কেউ থেকে থাকেন, তবে স্বামীজী নিজেই সেই নায়ক। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে—আবেগের বীর্যবত্তা তিনি (বঙ্কিমের মতো) ভবিষ্যৎ ভারতীয় নারীর মধ্যে চেয়েছেন সে বীর্যবত্তার উৎস হিন্দুধর্ম, যদিও তিনি বঙ্কিমের মতো পাণ্ডব মহিষীকে তাঁর যুগের নারী উদ্বুদ্ধতার প্রতীকরূপে তুলে ধরেন নি।

নারীর বীর্য মহিমার ধারণা বিবেকানন্দ আহরণ করেছিলেন নারী পুরুষ ভেদহীন সর্বজীবে বিরাজমান ঈশ্বরের তত্ত্বের সঙ্গে তন্ত্রমতের শক্তি সাধণার সমন্বয় ঘটিয়ে। "যখন তোমার সত্যদর্শন হইবে যে জ্যোতির্ময় আত্মাই সত্য, তখনই দেখিবে নারী পুরুষ ভেদ অন্তর্হিত হইয়াছে একেবারেই, এবং তখনই কেবল তুমি সকল নারীতে ব্রহ্মের প্রকৃত প্রকাশ উপলব্ধি করিতে পারিবে।"[৪৪] এ থেকে যে ধারণা বের হয়ে আসে তার দ্বিতীয়ার্দ্ধ হলো, "সর্বত্র বিরাজমান একটি শক্তি নারী তার একটি বিশেষ প্রকাশ।"[৪৫] প্রথমার্দ্ধ ঘোষণা করে নারী পুরুষের মৌলিক সাম্য এবং সেই অধিকার স্বীকার করে—নারীর আপন অভিব্যক্তির অধিকার, যা কেবলমাত্র পুরুষকেই মঞ্জুর করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধ আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে নারীকে আরো উচ্চতার পাদপীঠে দাঁড় করিয়ে দেয়। খুবই আশ্চর্যজনক যে, বিবেকানন্দ নিজের অজান্তেই সাংখ্য ও তন্ত্র ধারণার প্রকৃতি-আত্মাকে

মেনে নিয়ে দ্বৈতবাদকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তান্ত্রিকতা 'প্রকৃতি'-কে শক্তিরূপে মহিমান্বিত করে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যবর্তী আসন লাভ করতে চেয়েছে এবং দুই শ্রেণীর মধ্যে সুস্পষ্ট বিভিন্নপ্রকার পার্থক্যের ব্যবধানকে না কমিয়ে 'পরমাত্মার' সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করেছে।[৪৬]

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা"[৪৭] এমন কথা বলার পরে তন্ত্র আবার বলে : "যা শ্রীশ্যাম স্বকৃতিনাম ভবনেষু।"[৪৮]

যদিও নারীত্ব শক্তিরই একটি বিশেষ প্রকাশ। আমেরিকার নারীর স্তুতি করার সময় বিবেকানন্দ এই উভয় শ্লোকই উদ্ধৃত করেছেন এবং অজান্তেই তন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতের মূল কারণকে অস্বীকার করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে বঙ্কিম তন্ত্রে যতটা অনুরক্ত ছিলেন বিবেকানন্দ তাঁর চেয়ে বেশী ছিলেন না—অথবা ঐ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মদের চেয়েও অধিক নয়।[৪৯] "উপনিষদ ব্যতীত অন্য কিছুই আমি প্রচার করি নাই"—অবৈদান্তিক বিন্দুর প্রশংসার চেযে বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক পরিচয়ের এই-ই নিকটতম অনুমান। অথচ নারীর বীরাঙ্গনা মহিমা ধারণার সমর্থনের জন্য বিবেকানন্দ উপনিষদের কাছে আবেদন করে সন্তুষ্ট থাকেন নি। উপনিষদে পুরুষের সঙ্গে নারীর সাম্য স্বীকার করেছে 'আত্মায়' এবং কোথাও প্রত্যক্ষভাবে নারীত্বের গৌরব গান করে নি। ভারতের সমস্ত ধর্মীয় প্রথার মধ্যে কেবলমাত্র তন্ত্রই সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে 'নারীশক্তি'-কে স্বীকার করেছে, প্রচার করেছে এবং পরম আনন্দেই নারীত্বের গুণগান করেছে—সমস্তরকম হিন্দু ধর্মীয় চিন্তায় এ ব্যাপারটি অনুপস্থিত। এ কারণেই বৈদান্তিক বিবেকানন্দের তন্ত্রের কাছে আবেদন। আর প্রসঙ্গটি যখন নারীত্বের মহিমার, বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে শেষ ব্যক্তি যিনি ধর্মতত্ত্বের কোনরূপ সামঞ্জস্যের[৫০] বিবেচনাতেই নারীর মহিমা কীর্তনে নিরস্ত্র হননি।[৫১]

আবার এই তন্ত্র থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেই বিবেকানন্দ তাঁর সেই বিখ্যাত তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন—পাশ্চাত্যের কীর্তিতে 'পত্নীত্বে'র সঙ্গে হিন্দু সমাজের নন্দিত 'মাতৃত্বে'র। চিরাচরিত হিন্দুধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণাটি নির্ভুল নয়, যদিও 'স্মৃতিশাস্ত্রে' পরিবারে জনক-জননীর দিব্যস্থান নির্দিষ্ট করেছে (মনু জনক-জননীকে নরদেহে 'ঈশ্বর' বলেছেন)। কিন্তু এই ঈশ্বরত্ব প্রথাগতভাবে মাতার চেয়ে পিতার সম্পর্কেই বেশী প্রচলিত। জনপ্রিয় একটি শ্লোকে এটি প্রচলিত : "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমতপঃ" বিবেকানন্দের উদ্ধৃত একটি শ্লোক "জননী সহস্র জনকের গৌরব মহিমাকে ছাড়িয়ে যায়" ব্যতিক্রম হিসাবেই চিহ্নিত। সকল ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মে জননীত্বের ঐতিহ্যবাহী গৌরবগান খুব বেশী কার্যকরী হয়নি, যাতে একজন বড় কবিও অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁর সাহিত্য রচনায় নারীর কোন একটির মাতৃত্বকেও অমরতা দান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের

সব পরিচিত নায়িকারাই—সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা—পত্নীরূপে অমর, জননীরূপে নয়। এই-ই সত্য যে, যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মন সম্মতিক্রমেই ঐসব নায়িকাদেরকে দেশের সাধারণ জননী হিসাবে স্মরণ করেছে, শ্রদ্ধা করেছে। সাহিত্য কিংবা ধর্মশাস্ত্র কেউই এমন কোন স্বাক্ষর রেখে যায়নি যাতে বিবেকানন্দের ধারণার পত্নীত্বের চেয়ে মাতৃত্বই বেশী মহিমাময়ী এমন ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। কেবলমাত্র তন্ত্রই মানুষের পরিচালিকা ও অদৃষ্ট নিয়ন্তা 'মাতৃশক্তি'র কথা বলে। বিবেকানন্দ এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে একটি সজীব মর্ত্য অর্থ দান করেছেন, এবং নারীর মাতৃত্বের মধ্যে সেই শক্তির উৎস সন্ধান করেছেন। এমনকি তিনি কুমারী নিবেদিতার মধ্যেও প্রত্যাশা করেছেন নারীর 'বীরাঙ্গনা', 'বাসনা' ও 'মাতৃ' হৃদয়ের সমন্বয়। বিবেকানন্দের কাছে এই দ্বিত্ব একসঙ্গে চলে, যার একটির অনুপস্থিতিতে অপরটি অর্থহীন ও নিষ্ফল হয়ে পড়ে।

উপসংহার

এই অধ্যায় শেষ করার আগে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের সমাজ সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা "পুনরুজ্জীবনবাদে" সীলমোহর সম্বলিত এবং তার ফলশ্রুতিতে এই দুই চিন্তাবিদ সমাজের "আধুনিকীকরণ" ও 'জ্ঞানদীপ্তি'র পথে বাধা সৃষ্টির যন্ত্র ছিলেন—আধুনিক সমালোচকদের এইসব প্রতিবাদের উত্তর দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমরা এই অধ্যায়ে যথেষ্ট যুক্তি উপস্থাপিত করেছি এই কথা প্রমাণ করতে যে এ ধরণের অভিযোগ সংস্কার সম্পর্কে প্রকৃত ধারণার বিপরীতমুখী। আসলে এই সমালোচকগণ বঙ্কিমের "পুনর্জাগরণ" ও বিবেকানন্দের "উন্নয়ন" সম্পর্কিত ধারণার উপর জোর দেননি এবং এর ফলেই বুঝতে পারেননি যে, পূর্ববর্তী সংস্কারকদের চেয়ে এই দুই মনীষির সংস্কার পরিকল্পনা জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতীতে অনেক বেশী কার্যকরী হয়েছিল।

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের সমালোচকগণ নিশ্চয় প্রতিবাদ করতে পারেন যে, সংস্কারের সবচেয়ে বাস্তব পদ্ধতি আইনানুগ সংস্কারের বিরোধিতা করে তার পরিবর্তে তাঁরা বাগাড়ম্বর করেছেন, যদিও তাঁদের বক্তৃতা সদিচ্ছা প্রণোদিত, তবু বড় জোর তা শিক্ষামূলক হয়েছে। আমরা এই যুক্তির যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে পারি :—

(১) সংস্কারের ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত বিধিই সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা এই দাবির যথার্থ আলোচনায় আমরা কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ আইনে'র কার্যকারিতা স্মরণ করলেই বুঝতে পারি আইনসঙ্গত বিধি সবসময় সমাজে গৃহীত হয় না। প্রচণ্ড ভেরী নিনাদের মধ্যে এই আইন পাশ হয়। হিন্দু সমাজের

সবচেয়ে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। সর্বোপরি এর জনক এমন একজন পুরুষ যিনি উনবিংশ শতাব্দীর সংকীর্ণ বাংলায় একাই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জুড়ে এক বিশাল প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন; এমন একজন মানুষ সাহসিকতা ও চরিত্রের সমুন্নতিতে যাঁর তুলনা সমগ্র ভারত ইতিহাসে বিরল। তবু এ আইন হিন্দু সমাজে সামান্য প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

(২) জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের কর্মপদ্ধতি সংস্কারকদের প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন ছিল। সংস্কারকেরা এর প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্র, আহারে, উপবীত পরিত্যাগ করে এবং অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে, শেষের পন্থাটিই শ্রেষ্ঠতম, এবং আমরা এর নামকরণ করেছি 'বৈবাহিক সংস্কার'। ঐ সব সংস্কারের প্রতি বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রতিক্রিয়া আমরা আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সংস্কারকদের মতো এগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে তারা সানন্দেই এগুলিকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।[৫২] আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয় যে সমালোচকগণ বঙ্কিম ও বিবেকানন্দকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিযুক্ত করার সময় এই বিষয়টি মনে রেখেছেন কিনা। এই সমালোচকদের মনে রাখা উচিত ভারতে এমন অনেক 'কালো আদমী' (Natives) বিদ্বেষী ইংরেজ ছিলেন যাঁরা ভিন্ন জাতির সঙ্গে একত্র আহারে সংকোচবোধ করতেন না, আবার মধুসূদনের ব্যঙ্গ নাটক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র নায়ক ভক্তপ্রসাদের মতো ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা মুসলমানদের ঘৃণা করতেন আবার রূপসী মুসলমান কন্যার বক্ষলগ্ন হতে আকাঙ্খা করতেন। ভিন্ন-জাতির সপংক্তি ভোজ এবং অসবর্ণ বিবাহের মতো সংস্কার প্রকৃতপক্ষে শাঁখের করাত, যা প্রায়শঃ জাতি-প্রীতি বাড়ানোর চেয়ে জাতি-বিদ্বেষে জোর দেয়। সুতরাং কেবলমাত্র সংস্কার প্রীতির ধুয়ো না তুলে সংস্কার সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের অ-ভেদ-তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দানে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ সঠিক ও নির্ভুল ছিলেন।

আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো এই যে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ জাতিভেদ প্রশ্নের সমাধান করতে চেয়েছিলেন নিম্নজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে এবং উচ্চশ্রেণীর সমতুল্য তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বিখ্যাত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ স্মর্তব্য। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম ভারতের অবগতির কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, হিন্দুধর্মের ক্রমাবনতির জন্য নয়, ব্রাহ্মণ স্মৃতি শাস্ত্রের জন্য। কারণ এই সব স্মৃতি শাস্ত্র নিম্নশ্রেণীর কাছ থেকে শিক্ষা, রাজনীতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্ত ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়েছিল। সংস্কারকগণ অপরপক্ষে নিম্নশ্রেণীর বঞ্চনার পরিবর্তে বরং বিবাহ (উচ্চশ্রেণীর নারীর সঙ্গে), পবিত্র উপবীত (যা উচ্চশ্রেণীকে বিছিন্ন বিশিষ্ট করে) এবং সপংক্তি ভোজনের উপর জোর দিয়েছিলেন। 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে বঙ্কিম শিক্ষিত সমাজের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার প্রতি

উদাসীনতায় তিরস্কার করেছেন শিক্ষিত সমাজকে, রামমোহন ও ব্রাহ্ম সমাজকে উল্লেখ করেছেন তাঁদের সংস্কার প্রকল্পের কোথাও সাধারণ মানুষদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বলে। বিবেকানন্দের ভাষা আরো রূঢ়, আরো বেশী কঠোর। সমস্ত সংস্কারকদের এই বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণের দিকে উদাসীন থেকে তাঁরা সবাই নিজের কোলে ঝোল টানতেই ব্যস্ত। সত্য যে, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের সমাজকল্যাণ ভাবনাকে কখনো বাস্তব রূপ দেওয়া হয়নি। মঠ স্থাপন করে সেখানের সন্নাসীদের দিয়ে দিকে দিকে শিক্ষা প্রদানের যে স্বপ্ন বিবেকানন্দের ছিল তা আজ আমাদের যুগেও সম্পূর্ণ হয় নি। তবুও অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে ভারতীয় একটি মৌলিক সমস্যার প্রতি জাতীয় চৈতন্যকে এঁরাই সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন। সংস্কারকদের বিধবা বিবাহ সম্পাদন এবং পুরীর অনুসরণে পংক্তিভোজের রাজপথ দিয়ে ভারতবর্ষকে গৌরব মহিমার সিংহদ্বারে পৌছে দেবার মোহময় দিবা স্বপ্নে আমরা কিছুক্ষণ যদি আধুনিক সমালোচকদের পুনর্জাগরণের বিরুদ্ধে (পুনর্জাগরণকে তারা সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতা বুঝতেন) ঢক্কা নিনাদে বিস্মৃত হই, কান পাতি জনৈক সমসাময়িক সংস্কারকের পুনর্জাগরণের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্যে যা তাঁর মতে বিবেকানন্দের সময় থেকে ঝড়ের মত প্রচণ্ডতায় সারা ভারতে প্রবাহিত হয়েছে, তাহলে আধুনিক কালে তুচ্ছ সমালোচকদের ঐ আন্দোলনকে হেয় করার পরিশ্রমের বিপরীতে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।[৫৩]

চার্লস হেইমস্যাথ সমসাময়িক মতামতের উপর ভিত্তি করে আলোচনায় ছেদ টেনেছেন, "সমাজের নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি সমাজ সংস্কারের অর্থ ও ক্ষেত্রের আরও ব্যাপক প্রসারতা দাবী করে"—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি অধিবেশনে প্রেরিত বাণীতে এই উদ্ধৃতি দিয়ে চন্দ্রপ্রভাকর বলেছিলেন, "এ যাবৎকাল স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস ইত্যাদির মধ্যে সামাজিক সংস্কারকে আমরা আবদ্ধ রেখেছি, তার পরিবর্তে এমন সব প্রসঙ্গ—জনসাধারণের শিক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যবস্থা, গরীব লোকদের বাসগৃহ, রোগী ও অসহায় মানুষদের সেবাযত্ন, শ্রমিক শ্রেণীর কর্মসংস্থান…এবং গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা" অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই অধিবেশন সমাজসংস্কারের এই নতুন সংজ্ঞা মেনে নেয়। এবং কে. নটরাজন ভারতের সামাজিক উন্নতি সম্পর্কে চন্দ্রপ্রভাকরের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

(৩) আধুনিক সমালোচকগণ বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর একেবারে মূলে যে দোষ ত্রুটির যুক্তি দিয়েছেন সম্ভবতঃ সেটিই তাঁদের অন্যান্য যুক্তির অন্যতম। এই সমালোচকদের মতে বঙ্কিমের 'পুনর্জাগরণ' এবং বিবেকানন্দের উন্নয়ণের যে সামাজিক তত্ত্ব, সেই সামাজিক তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মের

সংযোগ অত্যন্ত আপত্তিজনক। তাঁদের মতে সমাজে নারীর স্থান অথবা নিম্ন-শ্রেণীর মানুষদের উন্নতিসাধন প্রভৃতি বিষয় সেকুলার পরিকল্পনার মাধ্যমে করা যেতে পারত। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব যে তথাকথিত 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ—পুনর্জাগরণ ও উন্নয়নের নব্যহিন্দু তত্ত্বের রাজনৈতিক দিক আমাদের যুগেও সমালোচনার চরম শিকার হয়েছে যে, জাতীয় আন্দোলনের পর্যায়ে মুসলমানদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ফলে দেশভাগ এবং অত্যন্ত তিক্ত সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা যা আজও আমাদের সমাজে বহমান তার কারণ ঐ বিশেষ ধরণের হিন্দু জাতীয়তাবাদ। আমরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই সমালোচনার বিশ্লেষণ করব। এখানে সমালোচনার যে অংশটুকু নব্য হিন্দু চিন্তাবিদ্‌দের সামাজিক শিক্ষা-বিষয়ক, কেবলমাত্র সেটুকু সমালোচনার উত্তর দিতে চেষ্টা করছি।

এই প্রসঙ্গে এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সংস্কার পরিকল্পনাই ধর্মসংশ্লিষ্ট, নব্য হিন্দু চিন্তাবিদ্‌গণও স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর পদক্ষেপই অনুসরণ করেছেন। এমনকি বিদ্যাসাগরও তাঁর সমস্ত রকমের সংস্কার তথাকথিত 'ধর্মশাস্ত্র' থেকেই গ্রহণ করেছেন। বি. মালাবারিই সম্ভবতঃ একমাত্র সমাজ সংস্কারক যিনি সেকুলার পন্থায় সংস্কার আন্দোলন করেছেন। তবুও বলা যায়, এই পার্শী সংস্কারক তাঁর উদ্দেশ্যের অনুকূলে হলে শাস্ত্রবাণীর দোহাই দিতেন। বাস্তবিকপক্ষে সমাজ সংস্কার বিষয়ের আলোচনাকালে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ছিল আজকের তুলনায় অনেক বেশী ধর্মাশ্রয়ী।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. ''আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, 'রিফর্মরই' আদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরনের রিফর্মর হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুনের মধ্যে গণি না, সুতরাং একথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না'' । কৃষ্ণচরিত্র : বঙ্কিম রচনাবলী, সংসদ, পৃঃ ৫০৩।

২. ঐ।

৩. ''এই বিধিগুলি সমান্ প্রচলিত রাখা যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে বা কখন ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। ...পূর্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতদূর প্রচলিত ছিল এবং প্রচলিত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি।'' বিবিধ প্রবন্ধ : 'বহুবিবাহ', বঙ্কিম রচনাবলী, সংসদ, পৃঃ ৩১৬।

৪. "সমাজ সংস্করণ আর কিছু হউক না হউক, একটা হুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিস।" কৃষ্ণচরিত্র : বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪০৬।

৫. Charles Heimsath : Indian Nationality and Hindu Social Reform, p. 150 (উদ্ধৃতি)।

৬. মালাবারি সম্পর্কে মন্তব্য আতিশয্যের পর্যায়ে পড়ে না। এমন কি হেইমস্যাথও মন্তব্য করেছেন, "Malabari did not rely only on considered argument to support his case but allowed his pen to flow freely."

৭. মালাবারি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তথ্যের অতিরিক্ত ব্যবহার করতেন। হেইমস্যাথ লিখেছেন, "On several important factual questions raised by Malabari opinions varied. No agreement was apparent on whether or not child marriage was followed by premature consummation" (Heimsath, p. 154).

৮. ভারতীয় পেনাল কোড এবং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর এর কোডের সংশোধনী বিলের টীকা ১৮৮২—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪৩, ৪র্থ সংস্করণ।

৯. কুলীনদের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর যখন আইন প্রণয়নের বিষয়ে আন্দোলন করছিলেন, তখন কুলীন রমণীদের বেশী বয়সে বিবাহের প্রতিবাদও করেছিলেন তিনি, কারণ শাস্ত্রে তা ছিল নিষিদ্ধ। এর সমর্থনে তিনি শ্লোকও ব্যবহার করেছেন,

পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলীস্মৃতা।।

(যে কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে রজস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হন। সেই কন্যাকে বৃষলী বলে) বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ : বহুবিবাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮৮। এরকম আরো অনেক শ্লোক তিনি ব্যবহার করেছেন।

১০. Charles Heimsath : Indian Nationality and Hindu Social Reform, p. 173.

১১. বিবিধ প্রবন্ধ : ভূমিকা, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৯২।

১২. "I read in the organ of the social reformers that I am called a Shudra and one challenged as to what right a Shudra has to become a Sannyasin". My Plan of Campaign : Vivekananda.

১৩. "Some of these societies, I am afraid, try to intimidate me join them" (ঐ)।

১৪. ঐ।

১৫. বিদ্যাসাগরীয় সংস্কারকের প্রতি বিবেকানন্দ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। "The question of widow marriage would not touch seventy percent of the Indian women" (ঐ)।

১৬. মনু আট রকম বিবাহের কথা বলেছেন : (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্য, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আসুর, (৬) গান্ধর্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই আট রকম বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। মনুর মতে (তৃতীয় অধ্যায়) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে চার রকম বিবাহ বৈধ। এগুলি হল : (১) আসুর, (২) গান্ধর্ব, (৩) রাক্ষস ও (৪)

পৈশাচ। আবার মনুর মতে দু'রকম বিবাহ পদ্ধতি—পৈশাচ ও আসুর, সকল বর্ণের জন্য অকর্তব্য (শ্লোক, ২৫)। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের জন্য গান্ধর্ব ও রাক্ষস এই দুটি বিবাহ পদ্ধতি বৈধ। বর-কন্যার উভয়ের পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ তা গান্ধর্ব বিবাহ এবং বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যে বিবাহ তা রাক্ষস বিবাহ।

১৭. কৃষ্ণ চরিত্র : বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, চতুর্থ অধ্যায়।
১৮. Complete works of Vivekananda : Vol. II, 'My Plan of Campaign',
১৯. স্বাভাবিক ধারণা যে গোঁড়া হিন্দুরা সবরকম সংস্কারের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ-আন্দোলনে সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। রক্ষণশীলদের দুর্গ বলে পরিচিত, শোভাবাজার রাজ পরিবার থেকেই এ আন্দোলনের সূত্রপাত। হেইমস্যাথের মতে এই আন্দোলনটিই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের একমাত্র বাংলার সমাজ সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ব্রাহ্ম কিংবা অন্যান্য সংস্কার গোষ্ঠীর কাছ থেকে আবির্ভূত হয় নি, হয়েছিল বিতর্কিত শোভাবাজারের রাজপরিবার থেকেই।
২০. Sinha Pradip : Nineteenth Century Bengal, Calcutta, 1965, Appendix C.
২১. Complete works of Vivekananda : Vol. III. 'My Plan of Campaign'
২২. ঐ।
২৩. ঐ।
২৪. ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিম রচনাবলী, উনবিংশতি অধ্যায়, পৃ. ৬৪৩।
২৫. ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিম রচনাবলী, দশম অধ্যায়, পৃ. ৬১৮।
২৬. বিবিধ প্রবন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৯।
২৭. 'Reminiscences of Vivekananda' : His Eastern and Western Admirers, Calcutta, 1964, pp. 237-38.
২৮. পরবর্তীকালে 'সাম্যে'র প্রকাশ বন্ধ করে বঙ্কিম প্রগতিবাদীদের শিকার হয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিলেন (বঙ্গদেশের কৃষক দ্রষ্টব্য)। প্রগতিবাদীরা এ বিষয়ে মনযোগ দেন নি।
২৯. বঙ্কিমচন্দ্রের গীতাভাষ্য (প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ শ্লোক)।
৩০. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ. ৭৫৯।
৩১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর।
৩২. এ রকম ভাষা—তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুষিয়া রাখিলে পাত্র বিশেষের প্রতি ইচ্ছা জন্মিতে পারে। কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
৩৩. 'বঙ্গদেশের কৃষক', পুনঃ প্রকাশ।
৩৪. ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিম রচনাবলী, ২৩তম অধ্যায়।
৩৫. সাম্য : বঙ্কিম রচনাবলী, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
৩৬. দ্রৌপদী : বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ. ১৯৪-২০০।
৩৭. 'নব্যহিন্দু উপন্যাস', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম 'প্রফুল্ল' ও 'শান্তি' চরিত্রে এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বর্ণনা করেছেন। বীরাঙ্গনা আদর্শে তারা গড়ে উঠলেও তাদের সে শক্তি স্বামীর প্রতি অনুরাগে রঞ্জিত ছিল।

৩৮. Vivekananda Centenary Memorial Volume edited by Dr. R. C. Majumdar, 'Sociological view of Swami Vivekananda' by Dr. Roma Chowdhury, pp. 347-432.

৩৯. ঐ।

৪০. "In India, there are two great evils : trampling on the woman and griending the poor through caste restrictions." ঐ গ্রন্থ, পৃ: ৪০০। "We are horrible sinners and our degradation is due to our calling women 'despicable worms', 'gate ways to hell' and so forth", ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৪০১।

৪১. ঐ, পৃ. ৪০৫।

৪২. Complete works of Vivekananda, Vol. III, p. 256.

৪৩. বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড।

৪৪. Vivekananda Centenary Volume : Dr. Roma Chowdhury, p. 402.

৪৫. বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা : শতবার্ষিকী গ্রন্থ (ষষ্ঠ), পৃ. ৩৮৮।

৪৬. বেদান্ত 'প্রকৃতি'কে স্বীকার করে না, সৃষ্টিকে 'মায়া' বলে অভিহিত করে।

৪৭. "The Divine soul who as power pervaoles all creation.

৪৮. 'She who in honest men's houses shine as Lakshmi in the form of their wives :

৪৯. ব্রাহ্মরা তন্ত্রকে ঘৃণা করে।

৫০. বৈদান্তিক বিবেকানন্দের কালীপূজা অনেক সমালোচকদের কাছে রহস্যজনক মনে হয়েছে। এমন কি নিবেদিতাও এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বিবেকানন্দও এর কোন সঠিক ব্যাখ্যা দেন নি। একবার তিনি বলেছিলেন, "That's a secret that will die with me'. মেরী হেলের কাছে একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, "Kali worship is my special fad", বস্তুত এটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপারই ছিল। তবে হিন্দুধর্মের পুনঃস্থাপনে তিনি নারীত্বের মাহাত্ম্য প্রচারে তান্ত্রিকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

৫১. Dr. Roma Chowdhury : essay : Vivekananda Centenary Volume, p. 402.:

৫২. অসবর্ণ বিবাহ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ নীরবই ছিলেন। কিন্তু 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি তিন হাজার বিষম বর্ণকে সমর্থন করতেন না, বৈদিক সমর্থিত মাত্র চারটি বর্ণকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য অবশ্যই অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

৫৩. K. Natarajan (Indian Social Reformer এর সম্পাদক) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন, "Revivalism has had a wonderfully steadying effect on the national character. It has made us more deliberate and self-respecting in our progress…and has invested the work of reform with a dignity which does not belong to mere imitation, Hindusthan Review, XXIII 13.

৮

ভারতবিদ্যায় নব্য দিগন্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি 'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় কী মায়ামন্ত্রবলে প্রাচীন ভারতের এক মহান সভ্যতার দৃশ্যপট রচনা করা হয়েছিল এবং শ্রমসাধ্য প্রয়াস ছাড়াই ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে একে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছিল। 'বঙ্গ-দর্শন' প্রবন্ধাবলীতে এই সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি কোন একক ঐতিহাসিক পর্বের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেনি, তাছাড়া বঙ্গদর্শনকে এই অর্থেও বিশ্বজনীন বলা যায় যে, ভারতীয় সভ্যতার উচ্চতম মহিমাগুলি বর্ণনা করার সময়েও বঙ্গদর্শনের আলো-চনা এমন কোন বিশেষ লক্ষণের উপর জোর দেয় নি যাতে ভারতের সভ্যতাকে পাশ্চাত্যের সভ্যতা থেকে পৃথক করতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভারতবিদ্যা সম্পর্কিত চিন্তাবলীকে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনোত্তর ভারততত্ত্ব গবেষণায় অন্বিষ্ট ছিল প্রাচীন ভারতের একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বের আবিষ্কার এবং তা দিয়ে বঙ্গদর্শনের দিব্যদর্শনকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার দান এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার দ্যুতিতে ভারত ইতিহাসের এক অলিখিত অধ্যায়ের আলোকোজ্জ্বল প্রকাশ।

ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য বঙ্কিম বেছে নিয়েছিলেন বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের মধ্যবর্তী সময়টি। ঐ যুগে ভারত ইতিহাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বঙ্কিম মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটো প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিম খুঁজে-ছেন (১) সেযুগে ভারতে প্রচলিত ধর্মের প্রকৃতি, এবং (২) সে যুগে ভারতে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। একথা বলা প্রয়োজন যে, এ দুটি প্রশ্নের আলোচনা বঙ্কিম যেভাবে করেছেন তাতে নব্য হিন্দু ধ্যান-ধারণা যে শুধুমাত্র

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই দিব্যদর্শন লাভ করেছে তা নয়, গৌরবময় অতীতের প্রেরণায় ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর নির্দেশক হয়ে উঠেছে।

(ক) মহাভারতের কাল

যেসব উৎস থেকে বঙ্কিম উত্তর খুঁজেছেন সেই উৎসগুলির প্রামাণিকতা পরীক্ষা করা প্রাসঙ্গিক। বঙ্কিমের অমর সৃষ্টি "কৃষ্ণচরিত্রে" গবেষণার যে ফল সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা দুটি সূত্রে বিবেচিত হতে পারে: (১) মহাভারতে বর্ণিত কয়েক-জন পৌরাণিক নায়কের কাজকর্ম, এবং (২) ঐ গ্রন্থেই বর্ণিত এক বিশেষ যুগের সভ্যতা। প্রথম পর্বে বঙ্কিম দাবী করেছেন যে, কৌরব, পাণ্ডব ও সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ এঁদের সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র। দ্বিতীয় পর্বে বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন যে, মূল ঘটনার দিক থেকে মহাভারত প্রাক্‌-বুদ্ধযুগের সৃষ্টি এবং সযত্নে ব্যবহৃত হলে ঐতিহাসিক তথ্যের আকর হতে পারে।[১] বঙ্কিমের প্রথম পর্বের দাবী পৌরাণিক নায়কদের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাবে গ্রাহ্য হতে পারে না বললেই চলে। ঐতিহ্যকে বাদ দিলে তার উৎস সাহিত্যভিত্তিক—বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত এবং পুরাণ সমূহ। এইসব গ্রন্থই একযোগে মহাভারতের কাহিনীকে ঐতিহাসিক বলে মেনে নিয়েছে। পুরাণ এবং মহাভারত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ও নির্দেশ করেছে; বঙ্কিমচন্দ্র সেই কালসীমা নির্ণয় করেছেন ১৪৩০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। এই সময়কাল সম্পর্কে এইসব গ্রন্থগুলির ঐকমত নিঃসন্দেহে লক্ষণীয় আবিষ্কার।[২] কিন্তু ভারতের অতীতকালের নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য হিসাবে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক উৎসের সাধারণ অবিশ্বাস যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্কিমের দাবীকে বিচার করতে হবে। সব কিছু সত্ত্বেও এটা একটি সাহসী সিদ্ধান্ত, যা এখনও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারে।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ। যেসব ইউরোপীয় ভারততত্ত্ব-বিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, প্রচলিত মহাভারত পরবর্তী যুগের রচনা, বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত মূল মহাভারত চিরতরে হারিয়ে গেছে, বঙ্কিম তাঁদের মত গ্রহণ করেন নি, তিনি তাঁদের যুক্তিসমূহের পরীক্ষা করে সেগুলির অসারত্ব প্রমাণ করেছেন। মহাভারতের একাধিক চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে 'শতপথব্রাহ্মণে' (যেমন ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, অর্জুন), এমনকি 'অশ্বলায়ন' ও 'সাংখ্যায়ণ' গৃহ্যসূত্রে মহাকাব্যটিরও উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণের নাম বারংবার উল্লিখিত হয়েছে 'ঋগ্বেদসংহিতায়'। 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' কৃষ্ণ-দেবকী পুত্রের উল্লেখ আছে। 'কৌষীতকিব্রাহ্মণ' দেবকীপুত্র বিশেষণ ব্যবহার করেনি বটে, কিন্তু ছান্দোগ্যের মতো জনৈক 'ঘোর আঙ্গিরস'-এর প্রসঙ্গে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেছে। এ সমস্ত গ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যের অংশ এবং অধিকাংশই সুনিশ্চিতভাবে প্রাক্‌-বৌদ্ধযুগীয়।

বৈদিক যুগের পরবর্তী সাহিত্যে বঙ্কিম দেখিয়েছেন, পানিণির উক্তিগুলি শুধুমাত্র মহাভারত এবং মহাভারত-খ্যাত বীরদের অধিকাংশের নামোল্লেখই করেনি, অর্জুন এবং বাসুদেবকে (কৃষ্ণের অপর এক নাম) পূজা গ্রহণকারী দেবতা হিসাবে উল্লেখ করেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্য 'সূত্রপিটক' কৃষ্ণকে 'মার' হিসাবে উল্লেখ করেছে, এতে প্রমাণিত হয় বৌদ্ধধর্ম কৃষ্ণকেই সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে মনে করেছিল।

লাসেন (Lassen) এবং আরো কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রথম দিকের বৈদিক সাহিত্যে 'কুরু-পাঞ্চাল' কথাটির উল্লেখ পেয়েছেন। তাঁরা এই সূত্র থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মূলগ্রন্থে নিশ্চয় কুরু-পাঞ্চালদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ আছে। যেহেতু প্রচলিত গ্রন্থে (মহাভারতে) কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ বর্ণনা আছে সেহেতু মূল গ্রন্থটি নিশ্চয় হারিয়ে গেছে। বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে কুরু এবং পাঞ্চালদের মধ্যেই হয়েছিল। পাণ্ডব সেনাবাহিনীর বৃহদংশই ছিল পাঞ্চাল এবং সৃঞ্জয়গণ (পাঞ্চালদের জ্ঞাতি একটি গোষ্ঠী)। শুধু তাই নয়, পাঞ্চাল রাজপুত্র মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন পাণ্ডব সেনাপতি। মহাভারতও কুরু-পাঞ্চাল সংঘর্ষের কাহিনীতে পূর্ণ। উপরোক্ত যুক্তিগুলি নিঃসন্দেহে অকাট্য; এবং এসব যুক্তির উপর নির্ভর করেই বঙ্কিম দাবী করতে পারতেন যে, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবের কাহিনী মূল মহাভারতেরই অংশ, কিন্তু বঙ্কিম এখানেই থেমে যান নি, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কৃষ্ণ পাণ্ডব কাহিনীর সার অংশটিই ছিল মূল মহাভারত।

প্রাক্‌-বৌদ্ধ সাহিত্যে এই গ্রন্থটির বারবার উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে এর অনেক নায়কের নাম ব্যবহৃত হয়েছে। পাণ্ডব কাহিনী এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাদ দিলে বর্তমান গ্রন্থটি সারহীন হয়ে পড়ে।[৩] এসব সত্ত্বেও ইউরোপীয় ভারত-তত্ত্ববিদ্‌গণ অস্বীকার করেন যে, এই কাহিনীটি মহাভারতের সার। ব্যাপারটি রীতিমত অদ্ভুত। শুধুমাত্র এই কাহিনীর ভিত্তিতেই বঙ্কিম যেসব তত্ত্ব পেয়েছিলেন, তা বৈদিকোত্তর ও প্রাক্‌-বৌদ্ধ ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য তথ্যের উৎস বলে মনে হয়। এখন আমরা এই মধ্যবর্তী যুগের অন্যতম সভ্যতা সম্পর্কে বঙ্কিমের ব্যাখ্যা আলোচনা করব।

(খ) হিন্দু সভ্যতার ঊষাকাল

মহাভারতের আদি পর্বে যে সভ্যতা চিত্রিত হয়েছে তা সুনিশ্চিতভাবেই প্রাক্‌-বৌদ্ধযুগীয়, সে যুগে প্রচলিত ধর্মের প্রকৃতি পরীক্ষা করলে স্পষ্টরূপেই এটি প্রতীয়মান হবে। বৈদিক ধর্মের তখন প্রাধান্য। যজ্ঞের উল্লেখ করা হয়েছে বার-বার। বৈদিক দেবতারাই তখন প্রধান। ন্যায় ও সত্যের উপজাতীয় ধারণাগুলি

তখনো প্রচলিত। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন গাণ্ডীবের নিন্দাকারীকে তিনি হত্যা করবেন। তাই তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির অর্জুনের গাণ্ডীবের নিন্দা করলে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণাগুলি পৌরাণিক কৃষ্ণই (বঙ্কিম কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে দেখেছেন) উত্থাপিত করেছেন, তিনি প্রচলিত ধারণাগুলির বিরোধীতা করেছেন এবং ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও ধর্ম ও নীতিবোধের যুক্তিবাদী ভিত্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি অর্জুনকে বলেছেন, ধর্ম এবং অধর্মের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষণ আছে। কিন্তু যে স্থানে এটি জটিল আকার ধারণ করে আমরা সেক্ষেত্রে যুক্তির উপরই নির্ভর করব।[8] এই-ই সব নয়, কৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবেই অর্জুনকে বলেছেন, বৈদিক ধর্ম অসম্পূর্ণ। "অনেকে শ্রুতিকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত, ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই।"[৫] কৃষ্ণ বলেছেন, "ধর্ম প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দারা প্রাণীগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম।"[৬]

মহাভারতের যুগে পৌরাণিক কৃষ্ণ ধর্মের এক নতুন ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন; যুক্তি এবং জগৎ-হিতকে তিনি সত্যধর্মের পথ প্রদর্শকরূপে নির্দেশ করেছিলেন। 'কর্মে'র যে নতুন ব্যাখ্যাটি কৃষ্ণ দিয়েছিলেন তাঁর আলোকেই এই নবধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের সম্পর্কটি আভাসিত। চিরাচরিত কর্মনীতি 'কাম্যকর্ম' বা বৈদিক যাগযজ্ঞের লক্ষ্য ছিল মৃত্যু পরবর্তীকালে স্বর্গ-সুখ লাভ করা, কিন্তু কৃষ্ণ সবটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন 'জগদ্ধিতায়'—সর্বভূতের হিতের উপরে। সঞ্জয়ের প্রতি কৃষ্ণের উক্তিতে এটি স্পষ্ট। সঞ্জয় দুর্যোধনের অন্যায়পথে পাণ্ডবরাজ্য অধিগ্রহণের পক্ষে কপট-যুক্তি বিন্যাসের চেষ্টা করেছিলেন এবং চিরাচরিত ধর্মের দোহাই পেড়ে পাণ্ডবদের নিষ্ক্রিয় থাকতে বলেছিলেন; কারণ এ ক্ষেত্রে ক্রিয়া মানেই যুদ্ধ। কৃষ্ণ বলেছেন "কেহ কর্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্মসংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্মানুষ্ঠানের বিধি নাই সে বিদ্যা নিতান্তই নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপাসার শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।"

জগৎ হিতের উদ্দেশ্যে কর্মবাদ—মহাভারতের যুগে উদ্ভূত ধর্মের প্রাণসত্তা ছিল এই-ই। অবশ্য বৈদিক ধ্যান-ধারণাও যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল। সর্বভূতে

বিরাজমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হবেসন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে নয়, 'নিষ্কাম কর্মের' দ্বারা, কৃষ্ণই এই ধারণা প্রচারের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই ধারণাটি বস্তুতঃ উপনিষদের নৈব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদ (নিগু'ণ ব্রহ্মবাদ); কিন্তু এই নিগু'ণ ব্রহ্মবাদের পাশাপাশি ব্যক্তিক সর্বেশ্বরবাদ (স্বগুণ ব্রহ্মবাদ)-ও গড়ে উঠেছিল এবং কৃষ্ণ স্বয়ং শরীরী বিশ্বাত্মারূপে পূজিত হয়েছিলেন। মহাভারতের প্রচলিত পাঠে কৃষ্ণের যে ভূমিকা তা মূল পাঠেও ছিল কি না বঙ্কিম সে প্রশ্নের মীমাংসায় যান নি। কিন্তু স্পষ্ট যে, দেবপ্রতিম মানুষদেরকে মূর্ত বিগ্রহরূপে পূজা করার প্রবণতা তখন ছিল।[৮] অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে, ভক্তিবাদের বিকাশ ঘটছিল।

মহাভারতে চিত্রিত নিরপেক্ষ (secular) সভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে, নতুন নতুন ও মহত্তর আদর্শের সংস্পর্শে এসে একটি উপজাতীয় সমাজ ধীরে ধীরে পুনর্গঠিত হচ্ছিল। পরবর্তীকালে বর্ণবিভেদময় সমাজের জন্য জাতি-ধর্ম-হীন বৈদিক সমাজ জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। তবু কিন্তু মহাভারতের জাতি বর্ণ-বোধকে অনড় বলা চলে না। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। সামাজিক স্তরে বিভিন্ন বর্ণের মেলামেশার কোন বিধিনিষেধ ছিল না, ভিন্নবর্ণের মানুষদের একত্র আহারও ব্যতিক্রম ছিল না; সাধারণ নিয়মরূপেই সে সব প্রচলিত ছিল।[৯]

সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রে উপজাতি মনোবৃত্তি তখনও অপসৃত হয়নি। ক্ষত্রিয়দের বিবাহ সাধারণতঃ পাত্রীহরণের মাধ্যমেই সংঘটিত হত। কিন্তু রোমান্টিক 'স্বয়ংবর প্রথা', যেখানে পাত্রী নিজে পাত্রকে নির্বাচন করে, তারও প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বস্তুতঃ এটিই ছিল শ্রেষ্ঠ প্রথা।

নারীরা কোন অর্থেই পুরুষদের অনুগত দাসী ছিলেন না। পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা দ্রৌপদীর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দেই নারী জাতির মহিমা ধ্বনিত হয়েছে। বঙ্কিম সমর্থন সহকারে দ্রৌপদীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয় বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

রাজনীতিতে প্রধান কর্মই ছিল যুদ্ধ। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, এমনকি ব্রাহ্মণরাও রণকৌশলে উন্নত ছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্রাহ্মণরা কঠোর সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।[১০] যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করাই ছিল ক্ষত্রিয় আদর্শ, শান্তিতে যেমন, নির্বাসনেও তেমনি ক্ষত্রিয় ক্রীড় ছিল সুউন্নত ও উদার। কৃষ্ণ বলেছেন, "বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা নির্বাসন সুখের নিদান।"[১১]

কৃষ্ণ পরিচালিত এই নতুন ধারণার লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ক্ষত্রিয় আদর্শকে বর্দ্ধিত করে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করা। যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপরায়ণ নৃপতি কিন্তু

ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল চিরাচরিত। শকুনির সঙ্গে পাশা খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিনি রাজকর্তব্যের অংশ বলেই মনে করেছেন, এবং রাজ্য, ভ্রাতা ও ভার্যাকেও বাজী রেখেছেন, তের বৎসর নির্বাসিত জীবন যাপন করে অনমনীয় দৃঢ়তায় খেলার শর্ত পালন করেছেন। তবু হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার হবে কি করে সে বিষয়ে যুধিষ্ঠির বিমূঢ়। তাঁর অধিকাংশ সুহৃদ যুদ্ধের পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ তখন যুদ্ধই ছিল রাজনৈতিক বিরোধ সমাধানের ক্ষত্রিয় আচরিত চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের কল্পনায় তিনি পশ্চাদ্‌পদ। ধর্ম সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণাই তাঁকে এই সংকটে ফেলেছিল। একদিকে পাণ্ডব শিবিরে আছেন যুদ্ধ-ক্ষুধার্ত ক্ষত্রিয়রা, অন্যদিকে আছে আত্মীয়বধজনিত পাপের আশঙ্কা। যুধিষ্ঠির পড়েছেন উভয় সংকটে। কৃষ্ণ তখন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পন্থা প্রদর্শন করেছেন। অক্ষত্রিয়সুলভ, কোমলচিত্ত, দৃঢ়সংকল্পহীন যুধিষ্ঠিরকে তিনি ভৎর্সনা করেছেন। অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করার মধ্যে যে ক্লীবতা ও অনৈতিকতা রয়েছে তিনি তারও সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।[১২] তিনি বলেছেন, বলপূর্বক অধিকারের নিষিদ্ধকরণ যেমন কর্তব্য, রাজনৈতিক বিতর্কের মীমাংসকরূপে যুদ্ধকে এড়ানোও সমান কর্তব্য। এ দুটিই এক্ষেত্রে মূল নৈতিক আদর্শ—যুদ্ধের চিরাচরিত ক্ষত্রিয় আদর্শ কিংবা আত্মীয়বধের চিরাচরিত পাপভীতি নয়। কিন্তু যখন এদুটি পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠে তখন এই আদর্শগুলির সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে সম্ভব? শান্তির জন্য যথাশক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে হৃত রাজ্যের মাত্র অর্ধেক অংশ কৃষ্ণ দাবী করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং শান্তির জন্য স্বয়ং দূতের পদ গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন নিরস্ত্রভাবে। অর্জুনকে তিনি বেছে নিতে বলেছেন একদিকে নিরস্ত্র কৃষ্ণ অন্যদিকে তাঁর দক্ষ সৈনিকদের বিরাট এক বাহিনীর মধ্যে যে কোন একটিকে। অর্জুন কৃষ্ণকে বেছে নিলে তিনি দুর্যোধনকে প্রতিশ্রুত সৈন্যবাহিনী দিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং কৌরব রাজসভায় গিয়ে রক্তক্ষয় প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন; ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি ধর্মনিষ্ঠ রাজনীতির নীতিটি সুস্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। মহাধ্বংসের পরে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কৌরবদের মধ্যে বৃদ্ধতম এবং প্রাজ্ঞতমদের কাছ থেকে রাজনীতি শিক্ষা গ্রহণ করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ করেছেন।

বঙ্কিমের আলোচিত একটা প্রধান বিষয় রাজনীতিতে কৃষ্ণের এই ধর্মপরায়ণতা। বঙ্কিমের মতে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্পর্কে কৃষ্ণের নীতি এবং যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ধর্মপরায়ণ রাজনীতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত কৃষ্ণের জীবনের শেষাঙ্ক। জরাসন্ধ কাহিনীর সাহায্যে বঙ্কিম একে ব্যাখ্যা করেছেন। মহাভারত যুগের সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাজা জরাসন্ধ ছিলেন

অধর্মাচারী। ছিয়াশিজন রাজাকে তিনি বন্দী করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল আরো চোদ্দজনকে যোগ করে শিবের সামনে বলি দেওয়া। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছেন জরাসন্ধকে দমন করতে। অনর্থক রক্তক্ষয় বন্ধ করতে তিনি ভীম এবং অর্জুনকে নিয়ে জরাসন্ধের রাজধানীতে গিয়েছেন এবং তাঁদের তিনজনের মধ্যে যে কোন একজনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করেছেন। ক্ষাত্র-প্রথা অনুযায়ী এ-আহ্বান জরাসন্ধ গ্রহণ করতে বাধ্য। জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে লড়ে নিহত হলে কৃষ্ণ ছিযাশিজন রাজাকে মুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু বলপূর্বক জরাসন্ধের রাজ্য অধিকার করেন নি। এইভাবে একই সঙ্গে তিনি একজন অত্যাচারীর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করেছেন এবং ছিযাশিজন নৃপতির মৈত্রী লাভ করে ধর্মপরায়ণ রাজনীতি চর্চার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেছেন।[১৩]

ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদেরা ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে মহাভারতের প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মহাকাব্যটিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতায় সংশয়ের যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু ঠিক যেমন ঋগ্বেদসংহিতাকে ভারত ইতিহাসের একটি মূল্যবান আকরগ্রন্থ বলে মনে করা হয় তেমনি মহাভারতের মূল কাহিনী থেকে অলৌকিকতার পোশাক ফেলে দিলে এই গ্রন্থটিও বৈদিক ও প্রাক্ বুদ্ধ যুগের মধ্যবর্তী সময়ে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বঙ্কিম এক্ষেত্রে অগ্রদূত, যদিও তাঁকে অনুসরণ করে বেশীদূর গবেষণা এগোয় নি, তাহলেও তাঁর মহান্ কাজটির গরিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

মহাভারতের যুগ সম্বন্ধে বঙ্কিমের আগ্রহ নিছক প্রাচীন অনুসন্ধিৎসা ছিল না, একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বঙ্কিম 'ধর্মতত্ত্বে' হিন্দুধর্মের যে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন তাকে সঠিক প্রমাণ করা এই ইচ্ছের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবেই সংযুক্ত ছিল। গীতায় প্রচারিত কর্মবাদের বঙ্কিম প্রদত্ত ব্যাখ্যা সঞ্জয়ের প্রতি কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে সমর্থিত। সর্বোপরি ধর্মরাজ্যের ধারণার উদ্দেশ্য ছিল একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনাকে ঐ কর্মবাদের পরিপূরক করে তোলা। পরবর্তী দশকগুলিতে জাতীয় আন্দোলনে এই ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধী ধারণাটিকে 'রামরাজ্যে'[১৪] রূপান্তরিত করেছেন এবং ঐ আদর্শ থেকে যুদ্ধের সকল সম্পর্ক বর্জন করেছেন। বঙ্কিমের পছন্দসই ক্ষত্রিয় আদর্শ সম্ভবতঃ মহাত্মার পক্ষে গ্রহণ যোগ্য ছিল না, স্বামীজীর 'রজোগুণে'র সঙ্গে এটি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙলার তরুণদের কাছে সোৎসাহ আগ্রহে গৃহীত হয়েছিল।

এখানে শুধু একটা কথা যোগ করা যায়, বঙ্কিম 'কৃষ্ণচরিত্রে' হিন্দু সভ্যতার একটা সত্যিকার উষাকাল আবিষ্কার করেছেন যার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এরকম : প্রথমটি ছিল বেদান্ত ও গীতার ধর্ম—কৃষ্ণ স্বয়ং ছিলেন এর প্রধান

উদ্গাতা। দ্বিতীয়তঃ এই বেদান্তবাদ সদ্যোজাত ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, এই অর্থে যে কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই দেবতারূপে পূজিত হচ্ছিলেন। তৃতীয়তঃ, এই সভ্যতার ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শিথিল ও অন্তর্বিবাহ সম্বন্ধীয় বর্ণ-ব্যবস্থা, সেখানে দ্রোণের মতো ব্রাহ্মণেরাও পেশা হিসাবে যুদ্ধকে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণোচিত আদর্শ হিসাবে জোর দেওয়া হচ্ছিল ধর্ম ও পাণ্ডিত্য লাভের জন্য শান্ত ও অহিংস জীবনচর্চায়। ক্ষাত্রবীর্য সহকারেই ক্ষত্রিয় আদর্শ ঘোষিত হচ্ছিল; কিন্তু তখনও কৃষ্ণ একে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিমুখী করে আকার দিচ্ছিলেন। ভারতীয় নারীত্বের মহিমার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল দ্রৌপদীর মতো নারীদের মধ্যে, যাঁর সুউন্নত শৌর্য ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সমস্ত পুরুষ প্রধানদের ম্লান করে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।[১৫]

(গ) সভ্যতার সূত্র

সাধারণভাবে ভারততত্ত্ববিদ্ বলতে আমরা যা বুঝি স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা রবীন্দ্রনাথ কেউই তা ছিলেন না। কিন্তু বঙ্কিমের আবিষ্কারের সঙ্গে আরো দুটো বিষয় তাঁরা যোগ করেছেন। হিন্দু সভ্যতার উষাকালের সন্ধানে বঙ্কিম তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণায় সন্ন্যাস আদর্শের প্রশ্নটিকে শুধুমাত্র ছুঁয়ে গিয়েছিলেন, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় এর স্থান নির্ণয় হয় নি। বস্তুতঃ সন্ন্যাস আদর্শকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মহাভারত যুগ যেন যথেষ্ট আগ্রহী ছিল না। মহাভারতে বিবাহিত ও ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমন্বিত তপোবনের উল্লেখ আছে ; কিন্তু প্রাক্-বুদ্ধ যুগের মহাভারতে সন্ন্যাসীমণ্ডলী ও মঠের উল্লেখ নেই। উপনিষদসমূহ অবশ্য সন্ন্যাস-ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে উল্লেখ করেছে, তবু সেগুলিতে মঠরাজির উল্লেখ নেই। উপনিষদ বর্ণিত সন্ন্যাসীরা কোন মঠের সদস্য না হয়ে ব্যক্তিগত প্রয়াসে মোক্ষ-লাভের চেষ্টা করতেন। বিবেকানন্দ এ সমস্যার সমাধান কিভাবে করেছেন জানতে হলে ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ ভারততাত্ত্বিক ছিলেন না, কিন্তু তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতীয় সভ্যতার 'বিশেষ' দিকের উপর জোর দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা শুরু করেছিলেন। আমরা বিশেষ বলছি এই কারণে যে বিবেকানন্দের পূর্বে সমকালীন ভারতীয়রা যাঁরাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সার্বজনীন দিকগুলির উপর জোর দিয়েছেন। সত্য যে, রামমোহন প্রাচীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার দিকে বিশেষ নজর দেন নি, এই অর্থে রামমোহনের মতো বঙ্কিম সার্বজনীন। হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইসলাম এই তিন প্রধান ধর্মের এক সাধারণ ভিত্তির অনুসন্ধান অভিলাষে

বেদান্তসম্মত একেশ্বরবাদ উন্মোচনের পিছনেই রামমোহনের প্রধান আগ্রহ ছিল। স্বগুণ ব্রহ্মবাদের সমর্থনে বঙ্কিম একেশ্বরবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু তবুও এই তিন বিশ্বধর্মের সাধারণ ভিত্তি হিসাবে তিনি ভক্তিবাদের উপর জোর দিয়েছেন।[১৬] বঙ্কিমের মতে, হিন্দুদের মধ্যে আদর্শ মনুষ্য ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বঙ্কিম স্বীকার করেছেন কৃষ্ণের নির্দেশিত সংশোধনগুলি সমেত ক্ষত্রিয় আদর্শই প্রাচীন হিন্দু আদর্শ, সমসাময়িক হিন্দুধর্মে তা অনুপস্থিত। বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিলেন প্রাচীন হিন্দু আদর্শের পুনরুজ্জীবন। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র এক উজ্জ্বল অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন ভারতের পতনের কারণ প্রাচীন আদর্শ থেকে বিচ্যুতি; তাঁর মতে প্রাচীন আদর্শ ছিল একটা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানদের সন্ন্যাসপন্থী আদর্শের চেয়েও তা শ্রেষ্ঠ। সেই প্রাচীন আদর্শের পুনরুজ্জীবনের স্বপক্ষে তিনি বলেছেন :

"অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না। কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেননা ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে, কি, হিন্দুধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে : খ্রীষ্টীয় আদর্শ পুরুষ বিনীত, নিরীহ, নির্বিরোধী, সন্ন্যাসী ; এখনকার খ্রীষ্টানগণ ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখরত সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্বকর্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্বকর্মে অকর্মা। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন ? উত্তর সহজ—লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রীষ্টানদিগের ধর্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা এবং প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ। যেদিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যেদিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেইদিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্য্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।"[১৭]

ঠিক এখান থেকে বিবেকানন্দ সরে গেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র এই অনুচ্ছেদটি বিবেকানন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রায় অক্ষরে অক্ষরে এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত হয়েছে।[১৮] কিন্তু তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণের শিষ্য, তাই ক্ষত্রিয় আদর্শই যে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ একথা স্বীকার করতে রাজী হননি। বঙ্কিমের চেতনায় ছিল ভারত ইতিহাসের একটা যুগ মাত্র, বিবেকানন্দ ভারত ইতিহাসকে দেখেছেন তার অখণ্ডতায় ও ভারততত্ত্বের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে পরীক্ষা

করেছেন নিছক পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সভ্যতার সূত্রের সাহায্যে।

সূত্রটিকে বিবেকানন্দ বলেছেন জাতীয় জীবনের লক্ষ্য। প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় লক্ষ্য আছে[১৯]—এই ছিল বিবেকানন্দের গৃহীত সূত্র—যার ভিত্তিতে তিনি ভারত, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সভ্যতার আলোচনা করেছেন। এদিক থেকে সভ্যতাবলীর তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে তাঁকে অগ্রদূত বলা যায়—যে ক্ষেত্রের দিকপাল ছিলেন অসওয়াল্ড স্পেংলার (Oswald Spengler) এবং অধুনা আর্নল্ড টয়েনবি (Aronold Toynbee)। ভারতীয় এবং পশ্চিমী সভ্যতার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তাঁর সূত্রটিকে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন এখন তা দেখা যেতে পারে।

পাশ্চাত্যের জাতীয় লক্ষ্য ছিল মীমাংসক সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের গৃহীত অর্থে ধর্ম।[২০] ভারতের জাতীয় লক্ষ্য মোক্ষ, মুক্তি বা আত্মোপলব্ধি। "ধর্ম মানুষকে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ খুঁজতে শেখায়। কর্ম এর ভিত্তি"। "মোক্ষ শেখায় প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি, স্থূল সুখের দাসত্ব থেকে মুক্তি"। "এই মোক্ষপথ কেবলমাত্র ভারতেই মেলে, অন্য কোথাও নয়।" যদিও বিবেকানন্দ আশা করেছেন অন্য দেশগুলিও এই পথ অবলম্বন করবে। এটি ছিল ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ ও ভারতের জাতীয় জীবনেরও লক্ষ্য।

যদি তাই হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, (১) ভারতীয়গণের কি পাশ্চাত্য অর্থে ধর্ম ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে 'মোক্ষমার্গী' হওয়া উচিত নয়? (২) মীমাংসকদের অর্থে ধর্ম যদি সুখান্বেষণের পথ হয় এবং সে পথ যদি ভারতীয় জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন না করে তাহলে কি সমগ্র ভারতীয় জাতি মোক্ষ কামনায় সন্ন্যাসী হয়ে উঠবে না? বিবেকানন্দ বলেছেন, ঠিক তা'র উল্টো। দুটো পথের মধ্যে তিনি সমন্বয় খুঁজেছেন। বুদ্ধদেব মোক্ষপথকেই জাতীয় জীবনের একমাত্র প্রকাশভঙ্গী করে তুলেছিলেন, তাতেই পতনের সূত্রপাত, একথা স্বীকার করে বিবেকানন্দ বঙ্কিমের ক্ষত্রিয় আদর্শকে গ্রহণ করেছেন।[২১] কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মহাভারতের যুগ শুধুমাত্র ক্ষত্রিয় আদর্শ ও সন্ন্যাস আদর্শের সমন্বয়।[২২] গৃহস্থ বঙ্কিমের একদেশদর্শী মতের এই সংশোধনটুকু করে সন্ন্যাসী-প্রবর দৃঢ়ভাবে গৃহীপক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং রক্তে আগুন ধরিয়ে দেওয়া ভাষায় ক্ষত্রিয়ের প্রশংসাগীতি গেয়েছেন[২৩]।

এইভাবেই বিবেকানন্দ ক্ষত্রিয় আদর্শ ও সন্ন্যাস আদর্শের সমন্বয় বাণী প্রচার করেছেন। কিন্তু এটা কি প্রকৃত পক্ষে সমন্বয়? সন্ন্যাস আদর্শকে বলা হয়েছিল 'জাতীয় জীবনের লক্ষ্য' এবং গৃহস্থকে বলা হয়েছিল ক্ষত্রিয় আদর্শকে সর্বোচ্চস্তরে তুলে ধরতে, যদিও তা নাকি 'জাতীয় জীবনের লক্ষ্য' রূপে পরিগণিত হবে না। আমরা জানি বিবেকানন্দের বিধা অপনোদন করে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, সন্ন্যাস আদর্শই ভারতীয় সভ্যতার শুরু ও শেষ,

অর্থাৎ মহত্তম এবং বঙ্কিমের ক্ষত্রিয় আদর্শের ধর্মরাজ্যের পরিশোধিত রূপ দিয়েছিলেন পুরোপুরি সন্ন্যাস মতাদর্শে। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী ও গৃহীর বিবাহের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মধ্যপন্থার কথা প্রচার করছিলেন।

বিবাহ শব্দটি এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত। কারণ রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মহানকাব্য 'কুমারসম্ভবমে'র যা মূল বিষয়, সন্ন্যাসী শিবের সঙ্গে গৃহী পার্বতীর বিবাহকে ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত ধারার প্রতীক বলে প্রচার করেছেন। এই বিবাহের ফলেই জন্ম হয়েছিল মহাবীর কার্তিকেয়র। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন সন্ন্যাস-বাদ ও গৃহীর দৈনন্দিন কর্তব্যপালনের মিলনেই প্রকৃত ক্ষত্রিযের সৃষ্টি সম্ভব।[২৪]

কিন্তু এতে কি ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ মেলে? বিবেকানন্দ হয়ত সন্ন্যাসীর বিবাহের কথা শুনে হাসতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে পুন-রুজ্জীবন ঘটিয়েছেন ভারত ইতিহাসের এক বিশিষ্ট লক্ষণের। তিনি নির্দেশ করেছেন, ভারতীয় সভ্যতার এক বৈশিষ্ট্যই ছিল অরণ্যচারী ঋষিকুল ও নাগরিক গৃহস্থের ভাববিনিময়। তিনি লিখেছেন, অরণ্যের ভিতর থেকেই প্রাচীন ভারতের দুটি মহান্ যুগের সভ্যতা—বৈদিক ও বৌদ্ধ সভ্যতা লালিত পালিত হযেছে। শুধুমাত্র বৈদিক ঋষিরা নন, বুদ্ধদেবও তাঁর বাণী প্রচারিত করেছেন আম্রকুঞ্জে, লতাবিতানে। নগর সভ্যতার সংকীর্ণ গলিতে এমন মহৎ ও বিশাল ভাবনা প্রচার করা যেত না।[২৫] রবীন্দ্রনাথের মতে অরণ্য ভারতীয় সভ্যতাকে দিয়েছে এক সুস্পষ্ট নৈতিক প্রবণতা। অরণ্যবাসীরা ইট, কাঠ, লোহার কঠিন কারায় বন্দী ছিলেন না। অরণ্য তাঁদের দিয়েছে ফল, ফুল, আগুন জ্বালানোর কাঠ, আর কুশ ঘাস। তাঁদের জীবনে,—কর্মে এবং অবসরেও অরণ্যের প্রভাব ছিল অমোঘ। তাঁরা তাদের জীবনের সঙ্গে এক বিস্তৃততর ও বৃহত্তর জীবনের ঐক্য অনুভব করেছিলেন। অরণ্য তাদের যা কিছু দিত—আলো, বাতাস, খাদ্য—সবই যে শুধুমাত্র পৃথিবী, বৃক্ষ এবং শূন্যতা থেকে সৃষ্ট তা নয়, সব কিছুরই উৎসমূলে রয়েছে এক পরম আনন্দের নির্ঝরতা তাঁরা স্বতঃই অনুভব করেছিলেন। এর জন্যই মানবসভ্যতার বেদীমূলে ভারতের অর্ঘ এক সুমহান ঐক্যচেতনা যা ব্যক্তি-সত্তাকে গ্রথিত করেছে সমগ্র বিস্সৃষ্টির সঙ্গে আত্মা, হৃদয় ও মননের যোগে।[২৬]

রবীন্দ্রনাথের এ আলোচনা যেন বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রচারিত বেদান্তক্ত সর্বভূতে প্রেমের শিক্ষারই পুনরুক্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই অরণ্য প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার সম্পর্ক যে সত্য, ঐতিহাসিক বাস্তব তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনিই মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় তীর্থস্থানগুলির অবস্থান সেইখানে যেখানে মহিয়সী প্রকৃতি নিজেকে অনাবৃত করেছে বিশিষ্ট মহিমায়। রাজচক্রবর্তী ও তাঁর পূর্বপুরুষ যে একজন অরণ্যচারী ঋষি তা প্রকাশ করতে গর্ব অনুভব করতেন। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যে অরণ্যের ভূমিকা সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক

তাৎপর্যে মহত্তম। বাল্মিকী, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্টে অরণ্যই নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রের সৃজনভূমি। সেকস্‌পীয়রের কিছু নাটকে উন্মাদ আবেগের যে উলঙ্গ প্রকাশ দেখি, চারু আরণ্যক পরিবেশ সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে তা থেকে রক্ষা করেছে। তপোবন হয়ে উঠেছে শান্তি ও পবিত্রতার নন্দন কানন।[২৭]

এইভাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তপোবন সভ্যতার ভূমিকার আলোকে ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। ভারতে অরণ্যের এই ভূমিকা ইউরোপীয় সাহিত্যে অরণ্যের ভূমিকা থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ সেকস্‌পীয়রের তিনটি নাটকের উল্লেখ করেছেন, অ্যাজ য়ু লাইক ইট, দি টেম্পেষ্ট এবং অ্যা মিড সামার নাইট্‌স ড্রীম, রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, "We are face to face with a spectacle in which man is out to lord it over nature and not to allow his passion to be mellowed by the fellowship with nature." এমনকি প্যারাডাইস লস্ট, যাকে মনে করা হয়েছিল স্বর্গোদ্যানে প্রকৃতির আদর্শ মিত্রতায় মনুষ্যত্বের নির্দেশক, তাতেও এই মৈত্রীর খুব কম চিহ্নই আছে। "Bird, beast, insect or worm/ Durst enter none, such their awe of man"—মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক মিল্টন এভাবেই বর্ণনা করেছেন।[২৮] রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে তুলনা করেছেন কুমারসম্ভবম ও শকুন্তলায় কালিদাসের প্রকৃতি ব্যবহার করার অনিন্দ্য রীতির এবং অবিস্মরণীয় ভাষায় তিনি ভারতীয় সাহিত্যে অরণ্য আদর্শের বিশিষ্ট ভূমিকার উল্লেখ করেছেন।

এখন নব্যহিন্দু আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কারটির তাৎপর্য এবং স্থান পরীক্ষা করে দেখা যাক। দ্বিতীয় অংশটিকে প্রথমে গ্রহণ করলে বলতে হয়, আরণ্যক আদর্শের উপর জোর দেওয়ার সঙ্গে নব্যহিন্দু আন্দোলনের যে কোন সম্পর্ক আছে, রবীন্দ্রনাথ তা মেনে নিতেন না। তাঁর নিজের বিবৃতি অনুসারে, আরণ্যক আদর্শের প্রতি তাঁর অনুরাগের উৎস তাঁর পিতার দ্বারা শান্তিনিকেতনে তপস্যার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সর্বভূতে প্রেমের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আরণ্যক আদর্শের নৈতিক প্রকাশরূপে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতি এবং সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে ঐক্য অবশ্যই বিবেকানন্দ ব্যাখ্যাত বেদান্তের সর্বেশ্বরবাদের সারবস্তু। নিঃসন্দেহে এটি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে, অন্যসব খাঁটি ব্রাহ্মের মতো রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দ প্রচারিত সন্ন্যাস আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের কোন গোষ্ঠীই আরণ্যক আদর্শকে গ্রহণ করেনি, এমনকি ব্রাহ্মমতাদর্শ অনুযায়ী ধর্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত আশ্রম হিসাবেও নয়। ভারতীয় সভ্যতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আরণ্যক আদর্শের উপর রবীন্দ্রনাথ যে জোর দিয়েছেন তার সক্রিয় অংশরূপে

তিনি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এইরকম আশ্রম গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু এইসব কেন্দ্রের ধর্মীয় শিক্ষায় যে বিশ্বাস, বিশেষ করে ব্রাহ্মবিশ্বাস, তাকে অস্বীকার করতে তিনি যত্নবান ছিলেন। আরণ্যক আদর্শ মূলতঃ ব্রাহ্ম ছিল কি নব্যহিন্দু সে আলোচনা এখানে অবান্তর। নব্যহিন্দু আন্দোলন কোন একজন নেতার দ্বারা পরিচালিত হয় নি এবং অনমনীয় ভাবনা ধারায় নির্দেশিত একটি কেন্দ্রীভূত আন্দোলনও ছিল না। হিন্দুধর্মাভিমুখী যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, গীতা ও বেদান্তের নৈতিক শিক্ষা এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট কর্মবাদ, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের অন্বেষা, হিন্দু বিশ্বজনীনতাবাদ এসব কিছুই নিঃসন্দেহে একটি নতুন আন্দোলনের সংজ্ঞা নির্দেশ করে; কিন্তু ঠিক যেমন বঙ্কিমের শিষ্য না হয়েও বিবেকানন্দ মহত্তর প্রাণশক্তি ও সুনিশ্চিততর উদ্দেশ্যের সঙ্গে বঙ্কিম প্রচারিত তত্ত্বটিকে জোরালো করেছেন, তেমনি এঁদের কারোরই শিষ্য না হয়ে রবীন্দ্রনাথও জাতীয় সভ্যতার মননের মাধ্যমে এঁদের বাস্তবায়িত আদর্শের অনুসন্ধানে সাহায্য করেছেন। এই বিস্তৃততর অর্থে রবীন্দ্রনাথ যতটা নব্যহিন্দু ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ততটাই ছিলেন বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ।[২৯]

ভারতীয় সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ হিসেবে আরণ্যক আদর্শের প্রচারের তাৎপর্য ছিল সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী। সব বিরোধীতা সত্ত্বেও, আরণ্যক ধর্মের সমূহ প্রবণতাটাই ছিল সন্ন্যাসধর্ম অভিমুখী, অথবা সবধরণের বলপ্রয়োগ বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ কখনই পূর্ণ অহিংসা প্রচার করেন নি, এটি ছিল মহাত্মার হিন্দু নীতি-ধর্ম। মহাত্মা আরণ্যক আশ্রমের ধারণাটিকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে যোগ করেছেন চরম অহিংসা।[৩০] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, আরণ্যক আশ্রমগুলি ছিল শান্তির আলয়[৩১] এবং ইঙ্গিত করেছেন, অহিংসার মাধ্যমে ঐক্যের ধারণাই পৃথিবীর প্রতি ভারতের বিশেষ বাণী। ধর্মরাজ্যের অনুসন্ধানে বঙ্কিমের ক্ষত্রিয় আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব, বিবেকানন্দের দেওয়া এরই সংশোধিত রূপ এবং রবীন্দ্রনাথের আরণ্যক আদর্শ—এইসব ভাবনাই ছিল পাশাপাশি সঞ্চারমান ও ক্রিয়াশীল, এবং নব্য বাঙলার যৌবনকে কল্পনার উত্তুঙ্গ শীর্ষাভিযানে দীক্ষিত করেছিল, উন্মোচন করেছিল ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার নতুন প্রকাশ ভঙ্গীর।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. কৃষ্ণচরিত্র : বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪১২।
২. ঐ, : প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
৩. ঐ, : প্রথম অধ্যায়, একাদশ পরিচ্ছেদ।
৪. ঐ, : ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মহাভারত থেকে সংগৃহীত।

৫. ঐ, : মহাভারতের 'কর্ণবধ' অধ্যায় থেকে সংগৃহীত।
৬. কৃষ্ণচরিত্র : বঙ্কিম রচনাবলী, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
৭. ঐ : একাদশ অধ্যায়।
৮. কৃষ্ণচরিত্র : চতুর্থ অধ্যায়, নবম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমের আলোচনা
৯. কৃষ্ণচরিত্র : পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পাদটীকা।
১০. কৃষ্ণচরিত্র : ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
১১. ঐ, : পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
১২. ঐ, : পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
১৩. ঐ, : ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ-অষ্টম পরিচ্ছেদ।
১৪. কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর যোগাযোগ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।
১৫. দ্রৌপদী : বিবিধ প্রবন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র।
১৬. ধর্মতত্ত্ব : বঙ্কিম রচনাবলী, একাদশ অধ্যায়।
১৭. কৃষ্ণচরিত্র : বঙ্কিম রচনাবলী, চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম পরিচ্ছেদ।
১৮. "প্রথমে একটা তামাসা দেখ! ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝলি রাম' হ'ল; ওরা ইউরোপীয়রা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহাউৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগ সুখ আকর্ষণ ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, নলিনীদলগত—জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্' গাচ্ছি; আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইউরোপী। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা! এ কথাটা বুঝতে হবে।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য : স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৬।
১৯. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য : বিবেকানন্দ।
২০. ধর্মই হল মীমাংসার অন্বেষার বিষয়। জৈমিনি ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন : ধর্ম হল আদেশ বা নির্দেশ, যা মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। ধর্ম পরকালে সুখ দেয়, অধর্ম দেয় যন্ত্রণা। আর কর্ম করলে 'অপূর্বর' সৃষ্টি হয়, এতে ফল লাভ হয়। প্রথম যুগের মীমাংসকরা কেবলমাত্র ধর্মে বিশ্বাস করতেন, মোক্ষে নয়, আর তাঁদের আদর্শ আকাঙ্খা ছিল স্বর্গলাভের। কিন্তু পরবর্তীকালের মীমাংসকরা মোক্ষে বিশ্বাস করেছেন এবং স্বর্গের আদর্শকে মুক্তিতে (অপবর্গ) রূপান্তরিত করেছেন।
২১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য : বিবেকানন্দ : বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ)। 'যখন বৌদ্ধ রাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে।' পৃ. ১৫২।
২২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য : বিবেকানন্দ : বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ)। 'এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মে আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন,

ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন'। পৃ. ১৫২।

২৩. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য : বিবেকানন্দ।

২৪. Creative Unity : Macmillan, 1971, p. 53. Creative Unity প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। 'তপোবন' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে)। বলাবাহুল্য এটি রবীন্দ্রনাথের রচনা।

২৫. তপোবন : শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৮০।

২৬. তপোবন : শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ, পৃ, ৭৯-৮০।

২৭. তপোবন : শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৮৯।

২৮. ঐ : পৃ. ৯১-৯২ ; Creative Unity, p. 61।

২৯. তপোবন নামের পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ যেখানে পশ্চিমের কাছে ভারতের সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই পুস্তকটি বিবেকানন্দের প্রয়াণলাভের অনেক পরে প্রকাশিত হয়।

৩০. এই আদর্শের জন্য মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের কাছে কতখানি ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের সময় মহাত্মা গান্ধী অরণ্যের ঋষিকল্প ধারণার সূত্রপাত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিংবা তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই এটি ঘটেছিল।

৩১. 'তপোবন শাস্ত রসাস্পদ।'

৯

ধর্ম ও রাজনীতি

নব্যহিন্দু আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে একে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা। বিবেকানন্দের মতে এর লক্ষ্য ছিল স্ত্রীজাতি ও দরিদ্র শ্রেণীকে শিক্ষাদান ও বেদান্তিক আদর্শ প্রচার করে এক নতুন ভারত সৃষ্টি করা। বঙ্কিম সামাজিক পুনর্জীবনের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিকল্পনাও যুক্ত করেছিলেন। তাঁর কথায়, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল দেশে একটা নৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্জন্ম এবং ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। উভয় চিন্তাবিদই মনশ্চক্ষে অবলোকন করেছিলেন নিরন্তর ধর্মীয় আবেগের দ্বারা কলা ও সাহিত্যের পূর্ণ-যৌবন প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে এক সাংস্কৃতিক পুনর্জন্ম। পুনর্জীবন সম্বন্ধে নব্যহিন্দু নেতৃবৃন্দের ধারণাকে আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা করছি।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) নব্যহিন্দু আন্দোলনের কাছে কতখানি ঋণী তা আমরা উপলব্ধি করতে পারব অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩০) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ঘোষণা ও কর্মসূচী বিচার করলেই। তার আগে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এঁরা সকলেই ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে বঙ্কিম চিন্তার ধারক, কিছু পরিমাণে বিবেকানন্দেরও।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উপাদান ছিল দেশভক্তি ও তার মহিমাকীর্তন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশভক্তির যে চরম প্রকাশ দেখি তা আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলশ্রুতি। এ-প্রসঙ্গে ডিরোজিওর কবিতার কথা উল্লেখ করতে হয়, যেগুলি সম্ভবত স্বদেশ প্রেমের প্রথম কবিতারূপে বিবেচিত হতে পারে। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্', যা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্র, এ-জাতীয় কবিতার একেবারে

শেষ পর্যায়ের। বস্তুত, স্বদেশী আন্দোলনের দেশপ্রেমের উৎস ছিল হিন্দুকলেজের প্রথম যুগে, ১৮১৭-১৯০৫ সময়ের মধ্যে এই আবেগ আরও ঘনীভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে নব্যহিন্দুদের অবদান ১৮৮২-তে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' প্রকাশের পূর্বে অনুভূত হয়নি। তাই অনেকে যুক্তি দেখান, ১৯০৫-এর আন্দোলনকে নব্যহিন্দু আন্দোলনের ফসল বলা সঙ্গত নয়। কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে এযুক্তি টেকে না। ১৯০৫-এর দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রাক্-বঙ্কিম যুগের দেশপ্রেমের সাদৃশ্য খুবই কম। বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে যদি আমরা মনে রাখি যে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা তাঁর লেখায় দেশপ্রেমের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দু'ধরণের দেশপ্রেমের কথা বলেছেন—প্রাক্-বঙ্কিম যুগের দেশপ্রেম ও বঙ্কিম পরবর্তী যুগের দেশপ্রেম। বিপিনচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার ঠিক চারমাস আগে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এ-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এবং স্বভাবতই প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাক্-বঙ্কিম যুগের দেশপ্রেম সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন যে, তিরিশ-চল্লিশ বছর পূর্বেও দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু বাস্তবতার পরিবর্তে তা ছিল আবেগসর্বস্ব। সে দেশপ্রেমের উৎস ছিল ইংরেজী সাহিত্য, ইউরোপীয় ও আমেরিকার ইতিহাস, পাশ্চাত্য দেশগুলির স্বাধীনতা-যুদ্ধের কাহিনী প্রভৃতি। ভারতবর্ষকে ভালবাসার নামে আমরা ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট হয়েছি। আমাদের দেশপ্রেম আমাদের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা, আচার-বিচারের প্রতি ভালবাসাকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি। আমাদের দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা ছিল অখ্রীষ্টানদের প্রতি খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের ভালবাসার মতো, যাঁদের মুক্তির জন্য তাঁরা আগ্রহী ছিল।[১]

তাহলে ১৯০৫-এর 'নতুন দেশপ্রেমে'র স্বরূপ কি? বিপিনচন্দ্র বলেছেন, 'Love of India now means a loving regard for the very configuration of this continent,···a love for its language, literature, its philosophies, its religion, a love for its culture and civilization ;—this is the characteristic of this new patriotism. And we owe it, it must be said, to a very large extent to the *religious and social reaction of the last twenty years*।[২]

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে বিপিনচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম, সুতরাং নব্যহিন্দু আন্দোলনের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না তাই এই আন্দোলনকে তিনি বিগত কুড়ি বছরের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ারূপে বর্ণনা করতে চেয়েছেন।[৩] কিন্তু ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পালের এই স্বীকৃতি যে বিগত কুড়ি বছরের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিই এই নতুন স্বাদেশিকতা উপরোক্ত যুক্তিকে খণ্ডন করে যে, স্বদেশী আন্দোলন যুগের স্বাদেশিকতা হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে উদ্ভূত দেশপ্রেম থেকে আগত।

স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে দ্বিতীয় উপাদান ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, যার গোড়াপত্তন করেছিলেন রামমোহন, সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় যার ব্যাপ্তি ঘটে ও ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক রূপ নেয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বা কংগ্রেসের ভূমিকাকে বিন্দুমাত্র খাটো না-করেও বলা যায় স্বদেশী আন্দোলন এঁদের কাছে খুব সামান্য পরিমাণেই ঋণী। কংগ্রেস সেই সময় ছিল উচ্চমধ্যবিত্তদের প্রতিষ্ঠান এবং প্রতি অধিবেশনে ব্রিটিশের প্রতি তার আনুগত্যের সমালোচনা এক দুঃখজনক ও ক্লান্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অরবিন্দের মতে, **The Congress in Bengal is dying of consumption; annually its proportions sink into greater insignificance; its leaders, the Bonnerjis, Banerjis and Lalmohan Ghoshes have climed into rarefied atmosphere of the Legislative Council and lost all hold on the imagination of the young men. The desire for a nobler and more inspiring patriotism is growing more intense।**[8]

বঙ্কিমের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে (এপ্রিল, ১৮৯৪) অরবিন্দ বঙ্কিম স্মারক প্রবন্ধে একথা লিখেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে 'উদ্দীপনাময় স্বাদেশীকতা' বঙ্কিমের রচনার-ই ফল। আমরা সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলব যে, বয়কট বা স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা অথবা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ কোন কিছুই কংগ্রেসের তৎকালীন রাজনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা সূচিত বা উৎসাহিত হয়নি। বিপিনচন্দ্রের মতে, ঐ সময়ের কংগ্রেসের দেশপ্রেম 'অস্বাভাবিক' ও 'অনুগত দেশপ্রেমে'র নামান্তর ছিল।[৫]

তৃতীয় উপাদান ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা। ১৮৮০ পর্যন্ত প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছে।[৬] 'জাতীয় পত্রিকা' (National Paper) নামে তিনি একটা পত্রিকাও বের করেন, সেখানে তিনি হিন্দুদেরকে একটা জাতিরূপে বর্ণনা করেছেন। 'মেলা' নিজেই উদ্যোগী হয়েছিল আত্মস্বয়ম্ভর, দেশভক্তি ও দেশীয় সাহিত্য ও হস্তশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করতে।[৭]

অস্বীকার করা যাবে না যে, 'হিন্দুমেলা'ই প্রথম সংস্থা যা স্বদেশী ধারণার জন্ম দিয়েছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশীয় শিল্পের বিকাশের যে উদ্যোগ দেখা যায় তার সূচনা হয়েছিল হিন্দুমেলা থেকেই। কিন্তু সম্প্রতি কিছু লেখক 'জাতি' ও 'হিন্দুজাতি' শব্দদু'টির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। একথা উল্লেখযোগ্য যে 'মেলা' মূলত ছিল সামাজিক সমাবেশ।, সংগঠকগণ উক্তি করেছেন, ভেসে যাবার মুহূর্তে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতসভা ও সংহতির ব্যাপারে হিন্দুমেলা ছিল

আমাদের কাছে একমাত্র সম্বল।[৮] 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে' ও 'সংহতির ব্যাপারে' কথাদুটি তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুমেলাকে স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রদূতরূপে দেখাটা অনৈতিহাসিক। খুব সামান্য দর্শকই মেলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের দুই নেতা রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র মেলার প্রতি স্নেহপরবশ ছিলেন কিন্তু তাঁরা এমন কোন দৃষ্টান্ত দেননি যা দেখে মনে হয় যে 'মেলা' ১৯০৫-এর সেই বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সঙ্গীত শুনিয়েছিল।

চতুর্থ উপাদান হল, তিলক, ফাদ্‌কে ও চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রভাবকে বাদ দিলে স্বদেশী আন্দোলনে অন্যতম প্রেরণা জুগিয়েছিল ওদের মারাঠি প্রভাব। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিলকের 'খাজনা বন্ধ' আন্দোলন বস্তুত প্রথম খাঁটি জাতীয় আন্দোলন। তাঁর 'গণপতি-উৎসব' স্বদেশী যুগে বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়। 'শিবাজী-উৎসব' অভিনন্দিত ও গৃহীত হয়, রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় শিবাজী স্থান পান। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির প্রেরণা উৎসও চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁরা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন। এই সমস্ত কার্যাবলী স্বদেশী আন্দোলনকে প্রভাবিত করে।

জাতীয়তাবাদের পুরোহিত বঙ্কিম

বঙ্কিমের ধ্যান-ধারণা স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করে। তাঁর ধ্যান-ধারণাগুলোকে চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়: (১) আবেদন নিবেদন মূলক রাজনীতির সমালোচনা; (২) অতীতে হিন্দুদের রাজ-নৈতিক শৌর্যের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভবিষ্যতে তার পুনরুত্থানের সম্ভাবনা; (৩) ধর্মে স্বদেশ প্রীতির স্থান নির্ণয় করে এক নতুন দেশ প্রেমের ধারণা সৃষ্টি করা এবং (৪) ধর্মরাজ্যের ধারণা। এই চারটি উপাদান স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ গঠন করেছিল, যদিও দেখা গেছে যে আন্দোলনকারীরা বঙ্কিমের ঐসব মহান ধারণাগুলোকে যথাযোগ্যভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং অনেকক্ষেত্রে ঐসব ধারণার অবমাননা করেছেন।

আবেদন নিবেদনের রাজনীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, শুধু মাত্র এর জন্যই কংগ্রেস উনিশ শতকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের ইতিহাস মূলত নরমপন্থী ও চরমপন্থীর বিরোধের ইতিহাস। এই সময়ে মহারাষ্ট্রে ও বাঙলায় সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় চরমপন্থীরা। সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যায়, নরমপন্থীরা জয়লাভ করে। কিন্তু রাজনীতিতে যে-কোন আন্দোলনে উদ্যোক্তার ভূমিকা রয়ে গেল দলহীন চরমপন্থীদের হাতে, অন্তত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত, যখন উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়। কিন্তু এ সমঝোতা ছিল ক্ষণস্থায়ী। গান্ধিজীর উত্থান অনুরূপে হলেও চরমপন্থীদের অনুকূলে যায়। সুতরাং আবেদন নিবেদনের রাজনীতির সমালোচনা কংগ্রেস বা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ-সমালোচনা শুরু করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮০-৮৫র মধ্যে দুটো ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমে। প্রথমটিতে[৯], 'হনুমান বাবু সংবাদ'-এ রিপনের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনে উল্লসিত এক ইংরেজী শিক্ষিত বাবুর সমালোচনা করা হয়েছে, এবং দ্বিতীয়টিতে[১০] 'পলিটিকস্'-এ তিনি ঐসময়ে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের অনুসৃত রাজনীতির প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন। একথা সত্য যে, এই প্রবন্ধ দুটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই লেখা হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেস ইতি-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫৮), দি ইনডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন (১৮৭৬) এবং অনুরূপ সংস্থার মতো একই নীতি গ্রহণ করেছিল বলে বঙ্কিমের সমালোচনা কংগ্রেসের নীতির প্রতিও সমানভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এটাই সম্ভবত ইংরেজী শিক্ষিত বাবুদের প্রতি প্রচণ্ডতম ব্যঙ্গ, যাঁরা দাসত্বের মনোভাব নিয়ে দু-এক বছর পরেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করতে চলেছিলেন। আরও নিশ্চিত এবং উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমের প্রয়োজন উপলব্ধি করে অরবিন্দ ১৯০৭-এ বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশে' লিখেছিলেন, বঙ্কিমই সর্বপ্রথম তাঁর সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্বলতা অনুধাবন করে 'লোক-রহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ নির্দয়ভাবে তাকে ব্যঙ্গের মধ্যে প্রকাশ করে-ছিলেন। অরবিন্দ লিখেছেন, "He (Bankim) saw that force from above must be met by a mightier reacting force from below, —the strength of repression by an insurgent national strength. He bade us leave the canine method of agitation for the leonine"।[১১]

স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্কিমের দ্বিতীয় অবদান ঐতিহাসিক চেতনাকে জাগ্রত করা, যা হিন্দুর ইতিহাস অথবা হিন্দুর রাজনৈতিক বা সামরিক ইতিহাসকে অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট ছিল। বস্তুত 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রাক্-বুদ্ধ যুগের ইতিহাসের ধারণা ছাড়া বঙ্কিম ইতিহাসের কোন মৌলিক গবেষণা করেন নি। আমরা আগের এক অধ্যায়ে দেখেছি যে 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম মহান্ ক্ষত্রিয় আদর্শ তুলে ধরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। হিন্দু ইতিহাসে এটি বঙ্কিমের বড় ও মৌলিক অবদান হলেও সামরিক কৃতিত্বের দিক থেকে বিচার করলে এটিকে বঙ্কিমের একমাত্র বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বলা চলে না। হিন্দুদের সামরিক কৃতিত্ব রচনায় বঙ্কিম ইংরেজ বা মুসলমান লেখকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

করতে ঘটনা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই বঙ্কিমের সবচেয়ে বড় মৌলিকত্ব।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ভারত-কলঙ্ক' নামে একটি প্রবন্ধের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে, বঙ্কিম দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ব্যাপী মুসলমানদের ভারত বিজয় আলোচনা প্রসঙ্গে কিভাবে হিন্দুদের সামরিক গৌরবই প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে ইসলাম তার বিজয় বৈজয়ন্তী মাত্র পঞ্চাশ বছরে উড়িয়েছে ভারতের বাইরে কিন্তু ভারতবর্ষে সময় নিয়েছে পাঁচশত বৎসর। তাছাড়াও এই প্রবন্ধে বঙ্কিম একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিয়েছেন, যে দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ব্রিটিশ লেখকদের অপব্যাখ্যা থেকে হিন্দু ইতিহাসকে রক্ষা করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এলফিন্‌স্টোনের (Elphinstone) মতে ভারতে মুসলমান বিজয়ের কারণ ধর্মের প্রতি হিন্দুদের গভীর সংসক্তি। বঙ্কিমের মতে, যদি এটাই হেতু হয়ে থাকে তাহলে ভারতে মুসলমান বিজয় একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত, কারণ উনিশ শতকেও যেখানে ধর্মের প্রতি গভীর সংসক্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেখানে দ্বাদশ শতাব্দীর ধর্মের সংসক্তির তো কথাই নেই। বর্তমানের চেয়ে নিঃসন্দেহে আরো সুগভীর ছিল।

হিন্দুদের ইতিহাস সম্পর্কে এ এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখকের মতে হিন্দুরা ছিল দুর্বল জাতি। কিন্তু বঙ্কিমের বক্তব্য যে, এই দুর্বলতার কলঙ্ক অমূলক কারণ হিন্দুদের পতনের কারণের মধ্যে সামরিক দুর্বলতা যুক্ত নয়। কারণগুলি হল, সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতা-প্রীতির অনুপস্থিতি ও জাতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মতো বাসনার অভাব। ভারতে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাবার দায়িত্ব ছিল রাজার। স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষ কখনো অস্ত্র ধারণ করেনি। ব্যতিক্রম শুধু মেবারের রাজপুত, মারাঠা ও শিখগণ। এইভাবে বঙ্কিম হিন্দুর ইতিহাস নতুনভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছিলেন, যা জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

একথা সত্য যে হিন্দুজাতির বীরত্বগাথা রচনায় বঙ্কিম পথ-প্রদর্শক ছিলেন না। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল টড্ (Col. Tod) রচনা করেছিলেন 'Annals and Antiquities of Rajasthan'। কিন্তু বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বাঙলাদেশে ঐতিহাসিক চেতনাকে জাগ্রত করেন তাঁর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে ঐতিহাসিক প্রবন্ধে। তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে রাজপুত বীরত্ব। এগুলি অবশ্যই কাল্পনিক কিন্তু কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকার বাস্তবতাকে আচার্য যদুনাথও নিখুঁত বলে প্রশংসা করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে তাকে অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র দত্ত রচনা করেছিলেন, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'। উপন্যাস দুটিতে যথাক্রমে শিবাজী ও রাণাপ্রতাপের

বীরত্ব কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এ ধরণের ঐতিহাসিক রোমান্সে কিছু ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেগুলি নিশ্চিতরূপে মানুষের কল্পনাকে ধরে রেখেছিল। এ সম্পর্কে বঙ্কিমের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র কথা বলতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, প্রথম দিকে 'দুর্গেশনন্দিনী' আমার দেশভক্তিকে উদ্দীপ্ত করেছিল। 'বীরেন্দ্রসিংহে'র প্রতি সহানুভূতিতে আমার মন সম্পূর্ণভাবে ভরে গিয়েছিল, বিশেষকরে দরবারের দৃশ্য, (যেখানে বিমলার হাতে মুসলমান আক্রমণকারী নিহত হয়েছে) আমাদের যুবক মনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১২]

আচার্য যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিপিনচন্দ্রের এই কথাকে বিচার করা যেতে পারে। বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রভাব নির্ণয় প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ অধ্যাপক গুচের (Gooch) লেখা 'Times Literary Supplement' (জুন ৩০, ১৯৪৫) থেকে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। গুচ্ লিখেছিলেন, "Historical fiction has played an active part in reviving and sustaining the sentiment of nationality, which for good or evil has changed the face of Europe in the nineteenth centuries". আচার্য যদুনাথের মতে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো দেখিয়েছে যে, ইংরেজী পণ্ডিতদের এই অভিমত 'নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ সত্য'।[১৩]

বঙ্কিমের তৃতীয় অবদান, স্বদেশ প্রেমের নতুন ধারণা। ধর্মে স্বদেশ প্রেমের স্থান নির্দেশ করে একে তিনি উচ্চাঙ্গের কবিতায় প্রকাশযোগ্য একটা শক্তিশালী ভাবানুভূতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন, তা হয়ে উঠেছিল সর্বোচ্চ আদর্শের বাহক। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, বিপিনচন্দ্র কথিত 'নব স্বদেশ প্রেমে'র (New Patriotism) স্রষ্টা। অরবিন্দও তাঁকে সেই রকমই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু স্বদেশের জন্য বঙ্কিমের মহান্ কাজের প্রসঙ্গে অরবিন্দ 'স্বদেশ-প্রেম-ধর্ম' (Religion of Patriotism) কথাটি ব্যবহার করার পর থেকে ঐতিহাসিকেরা পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় ধরে সীমাহীন পুনরাবৃত্তি করে আসছেন যে, বঙ্কিম 'জাতীয়তাবাদ-ধর্ম' (Religion of Nationalism) প্রচার করেছিলেন। বস্তুত বঙ্কিম যে শুধু জাতীয়তাবাদ শব্দটাই কখনো ব্যবহার করেননি তা নয়, পাশ্চাত্ত্যের 'স্বদেশ প্রেমের' থেকে তাঁর 'স্বদেশপ্রেমে'র পার্থক্য নির্দেশ করতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর 'ধর্ম' এবং 'স্বদেশপ্রেম' সমার্থক ছিল না, বরং তাঁর স্বদেশপ্রেম নিয়ন্ত্রিত হোক ধর্মের দ্বারা এই-ই ছিল তাঁর অভিলষিত। বঙ্কিমের চিন্তার ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তিনি স্বদেশ প্রেমকে ধর্মের অঙ্গ বলেছিলেন। বঙ্কিমের শিক্ষার মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে 'আনন্দমঠে'র (১৮৮২) পরিবর্তে 'ধর্মতত্ত্ব'

(১৮৮৮) দিয়ে শুরু করতে হবে, যা এযাবৎ বেশীর ভাগ লেখকগণই এড়িয়ে গেছেন।

ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণা হল মানবিক বৃত্তির চূড়ান্ত বিকাশ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, মানুষের বৃত্তিসমূহের বিকাশ ও সর্বেশ্বর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই ছিল বঙ্কিমের ধর্মের প্রধান কথা। 'কার্যকারিণী বৃত্তির' মধ্যে ভক্তির পরেই প্রীতির স্থান এবং প্রীতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে সর্বজীবে প্রেমের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমের এই মানব ধর্মবাদ শুধু নিজেকে, নিজের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বদেশ। বঙ্কিম স্বদেশ প্রেমকে সর্বোচ্য স্থান দিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে মানবতার সেবার প্রকৃষ্ট উপায় হল মানবপ্রীতিকে ঈশ্বরমুখী করে তোলা— অন্য কথায়, সেই সেবাকে পবিত্র ও নিষ্কাম করে তোলা। স্বদেশ প্রেমের চূড়ান্ত রূপ দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ, কিন্তু অন্য দেশের অনিষ্ট চিন্তা নয়,—একমাত্র অন্য দেশের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অন্য দেশের বিরুদ্ধাচরণ।—এই অর্থেই শুধু বঙ্কিমের দেশপ্রেম ধর্মীয়। বঙ্কিম 'জাতীয়তাবাদী ধর্ম' প্রচার করেন নি, তিনি শুধু ধর্মে জাতীয়তাবাদের স্থান নির্দেশ করতে চেয়েছেন। তার নিজের ব্যবহৃত কথাটি ছিল 'স্বদেশ প্রীতি'। এই চিন্তা নিঃসন্দেহে 'জাতীয়তাবাদী ধর্ম' এই ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।[১৪]

বঙ্কিম তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে তাঁর ধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্যের স্বদেশ প্রেমের তুলনা করেছেন।[১৫] 'ধর্মতত্ত্বে' গুরুর মুখ দিয়ে বঙ্কিম বলেছেন, "আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় **Patriotism** নহে। ইউরোপীয় **Patriotism** একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় **Patriotism** ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত **Patriotism**-এর প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন"।[১৬]

বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেম নিশ্চিতভাবেই মানবতার দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু স্বদেশপ্রেম কখনোই ধর্মের বিকল্প নয়। 'আনন্দমঠ' স্বদেশীযুগে পবিত্র ধর্মপুস্তক-রূপে বিবেচিত হত। স্বদেশপ্রেমের উপরোক্ত ধারণা নিয়েই 'আনন্দমঠ' পাঠ করা উচিত ; এবং 'আনন্দমঠকে' গভীরভাবে অধ্যযন করলে এই প্রতীতি জাগে যে, বঙ্কিম স্বদেশপ্রেমের সে ধারণা সৃষ্টি করতে চাননি যা 'ধর্মতত্ত্বে' আলোচিত সীমা-বদ্ধতাকে অস্বীকার করেছিল।

'আনন্দমঠ' বহু পঠিত ও আলোচিত। বলা হয়ে থাকে যে 'আনন্দমঠে'

বঙ্কিমচন্দ্র নতুন ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, জন্মভূমিকে দেবী কালিকারূপে বন্দনা করা ছিল এর উদ্দেশ্য। কোন গ্রন্থকারের বক্তব্যের এইই বোধহয় ভয়ঙ্করতম বিকৃতি সাধন। 'সত্যানন্দে'র আরাধ্য কালী নন, তিনি বিষ্ণুর পূজারী, বিষ্ণু যুদ্ধের দেবতা, সমস্ত অমঙ্গলের বিরুদ্ধ প্রতীক।[১৭]

কালীরূপে স্বদেশপূজা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য এই যে, মা ঈশ্বর নন, বিষ্ণুর আশ্রিত শিশুদেবী। আসলে তিনি মা জগদ্ধাত্রী। তিনি আবার সেই রূপ গ্রহণ করবেন যখন তাঁর সন্তানদল আক্রমণকারীদের অত্যাচার থেকে তাঁকে রক্ষার কাজে সফল হবেন।[১৮] তিনি বস্তুত শান্তি ও সমৃদ্ধির দেবী, তাঁর রূপান্তরে তিনি বিজয় জ্ঞান ও সৌন্দর্যের প্রেরণা দেবেন, পরিণত হবেন গৌরবময়ী ও বিজয়িনী রূপে।

তাহলে আনন্দমঠ আমাদের কি শিক্ষা দেয়? ধর্মের আবরণে এ কি হিংসাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রচার? পাঠকের মনে কি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মুসলমান ও ইংরেজ নিধনের প্রয়োজনীয়তা বোধ সৃষ্টি করে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় পায়? আনন্দমঠ মূলত সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতি এর গৌণ ব্যাপার। আনন্দমঠ একটি বিয়োগান্তক গাথা, এর বিষয়বস্তু হিন্দু পুনরুত্থান। এখানে বর্ণিত হয়েছে স্বদেশপ্রেম যত মহান্ আদর্শ-ই হোক না কেন 'শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেম' অভিষ্ট সিদ্ধ করতে ব্যর্থ। এখানে সেই স্বদেশপ্রেমের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে যে স্বদেশপ্রেম ধর্মের বিকল্প নয়, কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এখানে ভক্তির জয়গান করা হয়েছে, ভক্তিকে আত্মোৎসর্গের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে।[১৯] এখানে ডাকাতি করে অর্থ আহরণের জন্য সত্যানন্দের মতো সংযমী পুরুষকেও অপরাধী করা হয়েছে।[২০] এখানে মায়ের দিব্যদর্শনের রূপরেখা অঙ্কন করা হয়েছে, যে-মা 'সর্বালঙ্কার পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী, বালার্কবর্ণাভা সকল ঐশ্বর্যশালিনী', কিন্তু দিব্যদর্শনের এই মাকে দেখতে হলে তাঁর সন্তানদেরকে হৃদয় পবিত্র করে নিতে হবে।

একথা স্বীকার্য যে, আনন্দমঠের ব্যাখ্যা ও স্বদেশপ্রেমের ধারণা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল মাতৃভূমিকে শ্রেষ্ঠ সেবা উৎসর্গ করতে। স্বদেশী আন্দোলনে এটিই আনন্দমঠের একমাত্র অবদান নয়। একথা সত্য যে, স্বদেশীযুগে লিখিত স্বদেশী গান ও কবিতা যা রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদ রচনা করেছেন সবই আনন্দমঠের সুর গ্রহণ করেছিল। এর ফলেই অরবিন্দের ভাষায় "the Motherland was revealed for the first time as something more than a stretch of earth or a mass of individuals,—as a great Divine and Maternal power in a form of beauty that can dominate the mind and seize the heart" বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে যদি আমরা হেমচন্দ্র বা রঙ্গলালের দেশাত্মবোধক কবিতার সঙ্গে স্বদেশী যুগের দেশাত্মবোধক কবিতা

ও গানের তুলনা করি। হেমচন্দ্র গ্রীস ও রোমের পাশাপাশি ভারতীয় গৌরব-গাথা রচনা করেছেন, রঙ্গলাল স্বাধীনতার গানও গেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কবিতা ও গান বাঙালী মনে সুদূর প্রসারী কোন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু স্বদেশী যুগের কবিতা ও গানের মধ্যে জঙ্গীমনোভাব অনুপস্থিত থাকলেও দেশ-মাতৃকার প্রতি পূজা ও প্রার্থনার গভীর একাগ্রতায় একটা সম্পূর্ণ নতুন জাতি ও চেতনা সৃষ্টি করে জনমানসে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল। পূজা ও প্রার্থনার গভীরতা সৃষ্টিকারী এই নতুন আঙ্গিকই স্বদেশী আন্দোলনে আনন্দমঠের সবচেয়ে বড় অবদান।

কিন্তু এর সঙ্গে স্বদেশী যুগের বিপ্লবীরা আনন্দমঠের মধ্যে এমন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন যা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আনন্দমঠের অনুকরণে গোপন সমিতি তৈরী হয়েছিল, রাজনৈতিক হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ-সবই আনন্দমঠের শিক্ষার বিকৃত রূপ।

স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্কিমের চতুর্থ অবদান, ধর্মরাজ্যের ধারণা। বঙ্কিমের মতে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ-জয়ের পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে চেয়ে-ছিলেন। এই ধর্মরাজ্য কেবল অতীত ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়, বঙ্কিম সমসাময়িক ভারতে এর প্রতিষ্ঠা কামনা করতেন। বঙ্কিমের কথায়, কৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ, ধর্মের প্রচার এবং ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। যদি তা সম্ভব হয়, সমাজ সংস্কার হবে আপনা থেকেই, অন্যথায় সমাজসংস্কার অসম্ভব ব্যাপার।

এই ধর্মরাজ্যের রূপ কেমন ছিল? ধর্মরাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ বঙ্কিম কখনো দেননি। এটা কোন রাজ্য নয়, যেমনটি আমরা ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতি-হাসে' পাই। ভূদেবের হিন্দু রাজত্বের মতো বঙ্কিমের ধারণা অবাস্তব ছিল না। বঙ্কিম যে, বিশদ চিত্র দেননি তা বস্তুত সমালোচনা নয়, সম্বর্ধনার ব্যাপার। স্বদেশী আন্দোলনে ধর্মরাজ্যের ধারণা পরবর্তী কালে গান্ধীজীর রামরাজ্যের মতো এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রযুক্ত হয়েছিল। এই উভয় ধারণার অস্পষ্টতা রাজনৈতিক সংগ্রামের পক্ষে প্রয়োজ্য ছিল কারণ এটি বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ ও দলের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ধর্মরাজ্য ছিল পুনর্জাগরণের প্রতীক, ভূদেবের পুনর্জাগরিত রাজ্যের রূপরেখা নয়। সার্বজনীনতা এর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই যুদ্ধকে শুধুমাত্র ইংরেজের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ রাখে নি।

বিবেকানন্দ ও স্বদেশী আন্দোলন

'আনন্দমঠ' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' গৃহীত পুনর্জাগরণের ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া স্বদেশী আন্দোলনে বিবেকানন্দের অন্যতম অবদান। 'ধর্মরাজ্য' শব্দটিকে কখনও ব্যবহার

না করলেও বিবেকানন্দ এই ধারণাকে ধর্মীয় শিক্ষকরূপে পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। তিনি ধারণাটিকে আরো তাৎপর্যময় করেছেন তাঁর 'সংগ্রামী হিন্দুত্ব' (Aggresive Hinduism)-এর চিন্তার দ্বারা। পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের সফলতা খুব বিরাট মাপের ছিল না। তিনি নিজেও দু-একটা বীজ বপনের বেশী কিছু দাবি করেন নি। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরে এসে তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে যে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন তাতে মনে হয় তিনি তাঁর অনুগামীদের কাছে দিগ্বিজয় করার মতো অসাধারণ কিছু করেছেন। তাঁরা মনে করেছিলেন তিনি যা করেছেন তাতে সমস্ত পৃথিবী একদিন ভারতের ধর্মরাজ্যের ধারণাকে গ্রহণ করবে। একথা স্মরণযোগ্য যে, স্বদেশীর 'স্বরাজ' সম্পর্কে নীতি ছিল বিমূর্ত, যা বিবেকানন্দের সেই ঐতিহাসিক বিজয় অভিযানের স্মৃতিতে রচিত হয়েছিল। 'স্বরাজ' বস্তুত বঙ্কিমের ধর্মরাজ্যের ভিন্নরূপ ও বিবেকানন্দের চিন্তার মিলিত ফসল।

স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা রচিত হয়। এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে যা ইতিপূর্বে ভারতের মাটিতে দেখা যায় নি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হয়।[২১] কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে ৭ই আগষ্ট এক সভার মাধ্যমে সূচিত হয় স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ রদ না করা পর্যন্ত বিলিতি পণ্য বয়কটের একটি কর্মসূচী গৃহীত হয়। বয়কট রচনা করে স্বদেশীর পথ। দেশী মূলধনে দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[২২] জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছরই চরমপন্থীদের প্রভাবে কংগ্রেসেও বয়কটকে স্বীকার করা হয়, কংগ্রেস বয়কট, স্বরাজ, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা পুনর্জাগরণের নীতি গ্রহণ করে। ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বস্তুত এই আন্দোলনের বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল জাতীয় জীবনের সামাজিক পুনর্গঠন—সে পুনর্গঠন সাধিত হবে স্বরাজ, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার নতুন ধ্যান-ধারণায় এবং সে যুদ্ধের হাতিয়ার হবে বয়কট। অবশ্য যে সংকীর্ণ লক্ষ্য নিয়ে এই আন্দোলনের উৎপত্তি, সেই বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে।

স্বরাজের নীতি

সাধারণত মনে করা হয় যে 'স্বরাজ' ছিল স্বাধীনতার সূত্র। বস্তুত এই শব্দটির স্রষ্টা তিলকও স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে এটির তেমন ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হয় না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে চরমপন্থীদের দাবির চাপে কংগ্রেস স্বরাজকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেও এর রূপ এত অস্পষ্ট ছিল যে, ঐ বছরই এর ব্যাখ্যা নিয়ে

চরমপন্থী ও নরমপন্থীগণ বিভক্ত হয়ে যান। স্বরাজকে স্বাধীনতার অর্থে গ্রহণ করলেন চরমপন্থীগণ। অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম'[২৩] পত্রিকায় এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি লিখেছিলেন, বর্তমানে ভারতে দুটি নয়—তিনটি দল আছে। অনুগত, নরমপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী (চরমপন্থী)। ব্রিটিশের সুশাসন এবং শাসনকার্যে সীমিত অংশগ্রহণে অনুগতরা সন্তুষ্ট। নরমপন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী এবং এজন্য তাঁরা অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। জাতীয়তাবাদীগণ সাম্রাজ্যের ভিতরে অথবা বাইরে স্বাধীনতার থেকে কম এমন কিছুতেই সন্তুষ্ট নন।[২৪]

আবার, আমাদের আদর্শ, স্বরাজ অথবা বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। প্রত্যেক জাতির স্ব-স্ব ধ্যান-ধারণা অনুসারে বাঁচার অধিকার আমরা দাবী করি।[২৫] বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় স্বরাজের এই অর্থই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর ভাষায়, আমাদের কাছে স্বরাজের প্রকাশিত আদর্শ হল স্বর্গীয় গণতন্ত্রের আদর্শ। গণতন্ত্রের এই আদর্শ ইউরোপ এবং আমেরিকার নিষ্ঠুর (cruel) গণতন্ত্রের থেকে উচ্চমানের। এর বাণী সব মানুষই দেবতা। ভারতীয় গণতন্ত্রের সাম্য স্বর্গীয় সাম্যের অনুরূপ; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান—সব মানুষের স্বর্গীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ।[২৬]

বিপিনচন্দ্রের 'স্বর্গীয় গণতন্ত্র' স্পষ্টত বঙ্কিমের ধর্মরাজ্যে ফিরে গেছে। কিন্তু 'সব মানুষই দেবতা' এবং 'ভারতীয় গণতন্ত্রের সাম্য স্বর্গীয় সাম্যের অনুরূপ' এই উক্তির মধ্যে রয়েছে বিবেকানন্দের প্রভাব। বস্তুত বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্র সম্পর্কে রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে বিবেকানন্দের মানবিক প্রকৃতির বৈদান্তিক চিন্তার সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে। ঘটনাচক্রে গণতন্ত্রের ধারণা তাঁর নিজের সংযোজন কিন্তু বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের রচনা পাশ্চাত্ত্য উদারতার উল্লেখে পূর্ণ। পাশ্চাত্ত্যের উদার গণতন্ত্র ছিল নরমপন্থীদের লক্ষ্য। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের 'স্বরাজে'র নীতি ছিল ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে একে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা মাত্র।

এর সঙ্গে 'বন্দেমাতরম'-এ প্রকাশিত (নভেম্বর ২৫, ১৯০৭) অরবিন্দের 'শ্রীকৃষ্ণ ও স্বৈরতন্ত্রে'র তুলনা করা যেতে পারে। কৃষ্ণ রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন কিন্তু নিজে কখনো রাজ্যভার গ্রহণ করেন নি বা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো জীবন ধারণও করেন নি। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের যুক্তিগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করে অরবিন্দ লিখেছেন, "look at that one great divine figure in the history of India—the God in man whose life and teaching influence Hindu thoughts even to the present day. The scourage of all tyrants counsellor of Kings,

was brought up amongst cowherds. They were his playmates, his early associates. The great deliverer of mankind from despotism of all types and degrees imbibed and strengthened his democratic tendencies by living and moving amongst people working in the humblest spheres of life"।[২৭]

স্বেচ্ছাচারী ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছেন অরবিন্দ। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁর মুখে কৃষ্ণ উচ্চারিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "The nation that looks up to Sri Krishna as their ideal hero and man of action can never submit to autocracy in any form. They will never insult the divinity in themselves by bending their knees to an autocrat, however powerful"।[২৮]

এইভাবে অরবিন্দের হাতেও গণতন্ত্র ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যাত হয়েছে, এবং শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ গণতন্ত্রবাদীরূপে চিত্রিত হয়েছেন। আরো উল্লেখযোগ্য তাঁর 'এশিয়ার গণতন্ত্র' (Asiatic Democracy)[২৯] নামে প্রবন্ধ। এখানে তিনি গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইউরোপীয় ধারণাকে সমালোচনা করেছেন। লিখেছেন, গণতন্ত্র খ্রীষ্টানধর্মের মাধ্যমেই প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে প্রবেশ করেছে, এবং জার্মান জাতির সামন্ততান্ত্রিক প্রবৃত্তিগুলোর সঙ্গে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে আবার এশিয়ায় ফিরে এসেছে নতুন রূপে রূপান্তরিত হয়ে। তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগুলি যুক্ত ছিল সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশ এবং সামন্ততন্ত্রের অংশ হিসাবে খ্রীষ্টধর্মের হাস্যকর বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিপ্লবের সঙ্গে। অরবিন্দের দৃষ্টিতে, এটাই ছিল ইউরোপীয় গণতন্ত্রের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ।

প্রকৃত গণতন্ত্র হল বিমুক্ত আত্মার গণতন্ত্র। কিন্তু ধারণা কি রাজনীতির সংজ্ঞায় অনূদিত হতে পারে? অরবিন্দের বিশ্বাস, হতে পারে। একথা স্পষ্ট যে, অরবিন্দ শুধু বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ধারণার মিলনই ঘটান নি, ধর্মরাজ্যের সার্থক চিত্র-চিত্রণে তিনি নিজেও অনেক কিছু সংযোজন করেছিলেন।

স্বদেশী

স্বরাজের পর স্বদেশী। এখানেও প্রচলিত ধারণার সঙ্গে স্বদেশী নেতৃবৃন্দের দুস্তর ব্যবধান। স্বদেশীর অর্থ শুধুমাত্র দেশী বস্ত্র উৎপাদনের জন্য তাঁত প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ম্যানচেস্টারের বস্ত্র বয়কটের মাধ্যমে। বয়কটকে আরো জোরদার করার জন্য আন্দোলনের প্রথম দিকে স্বদেশী বস্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বস্ত্র বয়কটের জন্য প্রচণ্ড অভিযান চালান হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, স্বদেশী আন্দোলন খুব দ্রুত স্বদেশী

শিল্প গড়ে তোলার প্রাথমিক লক্ষ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।[৩০] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ম্যানচেস্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনকে এমন এক তাৎপর্য দান করেছিলেন যার মূল্য ছিল শাশ্বত। রবীন্দ্রনাথের ধারণার বাস্তব রূপটি পরে গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীতেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ গঠনের পরিকল্পনায় নব্যহিন্দু ধারণা নিয়ে এগিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ অনুসৃত 'সভ্যতার সূত্র'ও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের মতে স্বদেশী সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন সম্ভব নয়, যদি না আমরা পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় সভ্যতার মূল পার্থক্যকে অনুধাবন করি। ইউরোপে সভ্যতার সক্রিয় শক্তি ছিল রাষ্ট্র, ভারতে ধর্ম, অবশ্য সামাজিক কাঠামোতে। তাঁর নিজের ভাষায়, "ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেই-খানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপ আঘাত পায়। বিলাতে রাজ-শক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।[৩১]

বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা স্পষ্টতই উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে স্বামীজীর প্রভাব লক্ষ্য করতে পারবেন। 'সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান'—বিবেকানন্দের ভারতবিদ্যা পাঠের এটিই মূলসূত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আরো বেশী কিছু বলেছেন, তিনি বিভিন্ন সভ্যতার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও সমান আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর, এবং স্বদেশীর সংজ্ঞা নিরূপণে তিনি ভারতের সামগ্রীক সত্তার উপরেই জোর দিয়ে তার সামাজিক অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ভারতের ধর্মের সাংগঠনিক রূপই হল সামাজিক নিয়ম। স্বদেশী সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের পুনরুজ্জীবন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না; অরবিন্দের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে সেই মুহূর্তে এর তাৎপর্য ছিল আরো গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ।

এই সামাজিক স্বাতন্ত্র্য কি? রবীন্দ্রনাথের মতে, "নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম শিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর—আমা-দের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত".[৩২]

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়গণ বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন প্রনয়ণের অধিকারের স্বত্ব বিনামূল্যে ত্যাগ করেছিল। এমন কি হিন্দু সামাজিক প্রথাগুলিও

ভারতীয়দের পক্ষে অথবা বিপক্ষে ইংরেজ সরকার কর্তৃক রচিত হচ্ছিল।[৩৩] রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব ছিল এই অধিকারগুলিকে মুক্ত করে সামাজিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা হোক। তাঁর স্বদেশী সমাজ বস্তুত কোন রাজনৈতিক সত্তাবিশিষ্ট নয়। তিনি সামাজিক ব্যবহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও বাণিজ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি, বিচার[৩৪] প্রভৃতি এর অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রিটিশ সরকার নির্মিত রাজনৈতিক ধর্মকে গুঁড়িয়ে না-দিয়ে এই রকম সমাজ সম্ভব কি না! তাঁর কর্মসূচীর দু-একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ইঙ্গিত দেয় এবং প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোকে মারাত্মকভাবে আঘাত না-করলে সেগুলি সম্ভবও নয়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা না-করে যদি আমরা আরো ক্ষুদ্র একক যা গ্রামবাংলায় নেমে আসি তাহলে দেখব রবীন্দ্রনাথের সামাজিক কর্মসূচী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটিশ ভারতে ভারতের নিয়তিও এতে নিহিত।

সুপ্রাচীন কাল থেকে স্বয়ংশাসিত গ্রামগুলি ছিল ভারতীয় সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গ্রামগুলিকে দেখা হতে লাগল শহরের মানুষের খাদ্য জোগাবার উৎসরূপে। ফলে সমাজের ক্ষুদ্রতম এককরূপে গ্রামের চেহারাটা হারিয়ে গেল। এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। রবীন্দ্রনাথের মতে ক্ষুদ্রতম সামাজিক একক রূপে গ্রামের তাৎপর্য মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কস্থাপনের মধ্যে, এখানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার প্রভেদ। তাঁর নিজের কথায় "মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না। গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয় সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে। গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামী-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের বন্ধন।···ভারতবর্ষে ঘরে পরে, উচ্চনীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুক একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ-দেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথিশালা, দেবালয় অন্ধ খঞ্জ-আতুরদের প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন দিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই"।[৩৫] কিন্তু সমাজের এই বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে গেছে গ্রামের ক্রমাবনতির ফলে। রবীন্দ্রনাথের 'সামাজিক স্বাতন্ত্র্য' লাভের লক্ষ্য এজন্যই। তাই প্রয়োজন ছিল এই ক্ষুদ্র একককে জাতির বৃহত্তর পরিচিতির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। কিভাবে এই মেল-বন্ধন সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এক্ষণে আমাদের সমাজের পতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদ সভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হই-

বেন ·· এই সমাজপতি কখনো মন্দ হইতে পারেন কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকেন, তবে মোটের উপর কোন ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারেনা। ···ইহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন। সমাজের সমস্ত অভাব মোচন, মঙ্গল কর্ম চালনা ও ব্যবস্থা রক্ষা ইহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন"। স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত সমাজপতি ও নায়কের কথাই বলেছেন।

সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ঐক্য বন্ধনের পন্থারূপে বাংলাদেশের নানা স্থানে মেলা করবার পরামর্শ দিয়েছেন যেখানে অনুষ্ঠিত হবে যাত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দু-ধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গল-সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে"।

জাতীয় শিক্ষা

জাতীয় শিক্ষা বিতর্ক স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে আর একটি নব্যহিন্দু প্রেরণা। বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই ঐতিহাসিক পরিবেশে জন্ম নিয়েছিল স্বরাজ এবং স্বদেশী। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার এমন কোন পটভূমিকা ছিল না। বহুবছর ধরেই ইংরেজী ভাষা শিক্ষার একমাত্র বাহনরূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল। এমন কি নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধও এর কাছে যথেষ্ট ঋণী ছিল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধকে[৩৬] অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা কতখানি উপযুক্ত তা দেখালেন। কিন্তু প্রাক্-স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন সম্পর্কে তেমন আপত্তি তোলেন নি।[৩৭] জাতীয় শিক্ষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হবার কয়েক বছর পূর্ব থেকেই বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার সীমাবদ্ধতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বঙ্কিমের মতে, সবার্থসার্থক জ্ঞানের তৃষ্ণা ইংরেজী শিক্ষা মেটাতে পারে না, অপরদিকে বিবেকানন্দ একে 'জাতীয়তাবোধহীন' (De-nationalis-ing) শিক্ষারূপে সমালোচনা করেন। বঙ্কিম গীতায় বিবৃত জ্ঞানের ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন তিনটি বস্তুর—(১) সৃষ্টির ধারণার জন্য ভৌত বিজ্ঞান (Physical Sciences), যেমন অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র ; (২) নিজের জানার জন্য জীববিদ্যা, যেমন প্রাণীবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা ; এবং (৩) ঐশ্বরিক জ্ঞানের জন্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, যেমন উপ-

নিষদ, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র এবং বিশেষ করে গীতা। ইংরেজী শিক্ষায় অবশ্য বঙ্কিম ত্রুটি লক্ষ্য করেন নি।[৩৮] বিবেকানন্দ বঙ্কিমের মতে ধর্মনিরপেক্ষ ইংরেজী শিক্ষার রূপটাকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ধারণা ছিল[৩৯], এই শিক্ষা শুধু কেরাণীকুল সৃষ্টির যন্ত্রমাত্র। গ্রন্থাগার-ভিত্তিক এই শিক্ষা ভারতীয়বোধ-শূন্য।

একথা উল্লেখযোগ্য যে, বিবেকানন্দ বা বঙ্কিমচন্দ্র কেউই 'জাতীয় শিক্ষার' কথা বলেন নি, যেহেতু প্রথম থেকেই তাঁদের ধারণা ছিল শিক্ষার মূল লক্ষ্য 'মানুষ' গঠন করা। বস্তুত স্বদেশী নেতারাও এই তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষাকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যে-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচিতে গৃহীত হয় তা হল স্বদেশী আন্দোলনের সূচনার পরেই ব্রিটিশ সরকার বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'কার্লাইল সার্কুলার' জারী করেন। যেহেতু ছাত্রসমাজ ছিল আন্দোলনের প্রধান শক্তি সেইজন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত বিদ্যালয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ', সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের নব্য-হিন্দু আদর্শকেই এইসব বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শ ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করলে স্পষ্টতই বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ প্রদর্শিত উদ্দেশ্য ও পন্থা তার মধ্যে ধরা পড়ে।

এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার উল্লেখ করা যেতে পারে, যা পরবর্তী-কালে 'বিশ্বভারতী'র জন্ম দিয়েছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন—বিবেকানন্দের মৃত্যুর একবৎসর আগে। বিবেকানন্দ ছাত্রবস্থায় ব্রহ্মচর্যপালনের উপর বিশেষ জোর দিতেন। প্রাচীন ভারতেও এই ব্রহ্মচর্য পালনের গুরুত্ব ছিল। বিবেকানন্দের মতে ইংরেজী শাসনে শিক্ষার এই আধ্যাত্মিক দিকটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথও এই ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তপোবন সভ্যতার ধারণা আমরা অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

বয়কট

'বয়কট' শব্দটি থেকেই বোঝা যায় যে কথাটা নব্যহিন্দু ধারণা নয়। আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে শব্দটি গৃহীত হয়েছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ভারতবর্ষে বয়কটের প্রথম সূত্রপাত ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে,

বোম্বায়ের বস্ত্রশিল্পের পক্ষে ম্যানচেস্টারের বস্ত্র পরিত্যাগের মাধ্যমে।[৪০] বঙ্কিম বা বিবেকানন্দ কখনোই এই প্রস্তাব দেননি। বঙ্কিম সমসাময়িক রাজনীতিকদের রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশপণ্য বয়কটের কথা চিন্তা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বয়কটকে সমর্থন করেন নি তাই নয়, এর বিরোধীতা করেছিলেন প্রচণ্ডভাবে। নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বয়কট আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আগে তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। দাদাভাই নৌরজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে বয়কটকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, বয়কট আর যাই হোক কোন সংগ্রাম নয়। এখন প্রশ্ন হল বয়কট কি বঙ্কিম প্রভৃতি নব্যহিন্দু চিন্তাবিদ্ কর্তৃক বহুকাঙ্খিত পুনর্জাগরণের সংগ্রামের প্রস্তুতি?

অন্তত তিলক ও অরবিন্দ নিঃসন্দেহে এরকমই চেয়েছিলেন। তিলকের পন্থা সংগ্রামশীলতা—ভিক্ষাবৃত্তি নয়, চরমপন্থীদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নরমপন্থীগণ এই বিপজ্জনক ঝুঁকি গ্রহণে অসম্মত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই কংগ্রেস বিভক্ত হয়। তিলক ও অরবিন্দ বয়কটকে গ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসাবে—স্বরাজের নব্যহিন্দু ধারণাকে উপলব্ধি করার জন্য পুনর্জাগরণের সংগ্রামে। 'বন্দেমাতরমে' অরবিন্দ লিখেছিলেন, "We have repeatedly said that Boycott is not a gospel of hatred. It is simply an assertion of our independence our national separateness. But neither do we pretend that we can ask the rulers to overflow with feelings of benevolence for the Boycott···Boycott has come among us not to bring peace but a sword".[৪১]

অরবিন্দের ধারণায় বয়কট ছিল তরবারি, শান্তির অস্ত্র নয়। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া অন্য কিছু অরবিন্দের দৃষ্টিতে ছিল না। অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার অর্থ, অসহযোগিতার মাধ্যমে সরকারের সমস্ত শাসনযন্ত্র অচল করে দেওয়া। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ লিখেছিলেন আমাদের পন্থা হল স্ব-নির্ভরতা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। এই নীতির মূল কথা হল যতদিন না আমরা আইন প্রনয়ণ, অর্থ ও শাসনে যথেষ্ট পরিমাণে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করছি ততদিন সমস্ত সহযোগিতা অস্বীকার করা। অষ্টাদশ শতকে আমেরিকার শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের 'No representation no taxation'-এর মতো 'No control, no cooperation' আমাদের বিক্ষোভের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।[৪২]

এই কথাগুলি প্রমাণ করে যে অরবিন্দ গান্ধীজীর মতো কোন আন্দোলন না-করলেও গান্ধীজীর অনেক আগেই এই ধরনের আন্দোলনের কথা চিন্তা করে-

ছিলেন। কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তাবনা ছাড়া অন্য কিছু মনে করেন নি। এই কথাগুলি লেখা হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পরে। তিলক তখন কারারুদ্ধ, বিপিনচন্দ্র ইংলণ্ডে স্বেচ্ছানির্বাসিত এবং রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন। আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ লিখেছিলেন, "The grim forces that have been moving under the surface will now find the field upon to them by the shattering of the keystone of the old political edifice. The disappearance of the old Congress announces the end of the preparatory stage of (our) movement (and) the beginning of a clash of forces whose first full shock will produce chaos. The fair hopes of an orderly and peaceful evolution of self government, are gone for ever. Revolution, bare and grim, is preparing her battlefield, mowing down the centres of order··· and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could have wished it otherwise, but God's will be done"।[৪৩]

উপরোক্ত লেখাটির মধ্যে স্বপ্নবিলাসীর মনোভাব ব্যক্ত হলেও বয়কট আন্দোলন কোনদিকে মোড় নিচ্ছে তার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ-আন্দোলন চলেছিল বিপ্লবের দিকে, যে-বিপ্লব রূপ নেবে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের যুদ্ধে।

সন্ত্রাসবাদ অথবা পুনর্জাগরণের সংগ্রাম ?

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' থেকে গৃহীত নামের এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল রাজনৈতিক সংগঠন। এর উদ্দেশ্য ছিল নব্যহিন্দুর লক্ষ্য—'ন্যায়ের রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করা। দেশের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা ছিল এর আদর্শ। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভগিনী নিবেদিতা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গীতা-অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক ছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু নিঃস্বার্থ সেবা ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ ছিল এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মূলমন্ত্র।

অরবিন্দ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র, অরবিন্দ ছিলেন সহ-সভাপতি। কিন্তু অরবিন্দ সেইসব গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন যেগুলি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত ছিল। একথা সত্য যে, সমিতির কিছু সদস্য অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু সমিতির অধিকাংশ সভ্য

তা সমর্থন করেন নি। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সন্ত্রাসবাদকে স্বাধীনতা লাভের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' হিংসা ও অপরাধ প্রচার করেনি সত্য, কিন্তু তাঁর দলই রাজ-পুরুষদের হত্যার জন্য বোমা তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিল। এই সমস্ত হিংসাত্মক কাজের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অরবিন্দের উপর বর্তাবে।

'আনন্দমঠে'র সত্যানন্দের শিষ্যদের মতো 'ভবানী মন্দির' স্বাধীনতার জন্য স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের শিক্ষার কথা প্রচার করে। সন্ন্যাসীদের মতো স্বচ্ছাসেবকদেরও কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া প্রয়োজন ছিল। জাগতিক সুখ পরিত্যাগ করে শারীরিক শক্তি অর্জনের জন্য তারা উপাসনা করত শক্তির দেবী কালীকে। অরবিন্দ প্রায় সদানন্দের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন কিন্তু তবুও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। সদানন্দ ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত, যিনি শক্তি ও ভালবাসার দেবতা। অরবিন্দ বিষ্ণুর পরিবর্তে কালীকে গ্রহণ করে শক্তি আরাধনার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। এই শক্তি আরাধনাই ছিল গুপ্ত সমিতিগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই নীতিহীন হিংসার চর্চা, যার উপর ভিত্তি করে অরবিন্দের বিপ্লব গড়ে উঠেছিল, তেমন দৃঢ় ছিল না। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গোটা ব্যাপারটাই আমদানী করা হয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডের সন্ত্রাসবাদী ও রাশিয়ার 'নিহিলিষ্ট'দের কাছ থেকে।

এইই যথেষ্ট নয়। গীতার নিষ্কাম কর্মের মন্ত্র বিকৃতরূপ গ্রহণ করেছিল হত্যার মধ্যে। ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ যোদ্ধার অবশ্য কর্তব্য—শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ স্বার্থহীন হত্যায় আরোপ করে হত্যাকে করা হয়েছিল গৌরবময়। এখানেই বঙ্কিমের বক্তব্য ও উপদেশ কোন স্থান গ্রহণ করতে পারেনি, যিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ক্ষত্রিয়দের নির্মম রক্ত-তৃষ্ণার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শান্তিকামী। বঙ্কিম চেয়েছিলেন গীতার ব্যাখ্যা এই পটভূমিকায় হোক। গীতার নীতির বিকৃতি ঘটে তিলকের হাতে, যিনি শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁয়ের হত্যার ন্যায্যতা সমর্থন করতে চেয়েছিলেন গীতার আলোকে।[৪৪] এও সম্ভব যে, বাঙলার সন্ত্রাসবাদীরা উৎসাহ পেয়েছিলেন তিলকের কাছ থেকে, কেননা ভারতের প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় তিলকের বক্তৃতায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। যে ভাবেই হোক না কেন, গীতার এই বিকৃত ব্যাখ্যাই সন্ত্রাস-বাদীগণ গীতার বিশুদ্ধ শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছিলেন।

কানাইলাল দত্তের জীবনীকে[৪৫] এই বিকৃতির পরিণামরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'আলিপুর বোমার মামলায়' অভিযুক্ত কানাই ছিল জেল হাজতে। বন্দী সঙ্গীদের মধ্যে অরবিন্দ ছিলেন অন্যতম। কানাই বোমা তৈরী করতে জানত কি না বা সে একটাও বোমা তৈরী করেছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু কানাই

ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা আনন্দোচ্ছল বালক মাত্র। রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে কানাই গোটা বন্দীশালায় খুঁজে বেড়াত বিস্কুট, মিষ্টি ও ফল। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে দলের একজন বয়স্ক ব্যক্তির বর্ণনায় জানা যায়, একদিন রাত্রে প্রায় একটার সময় কানাই আনন্দে রীতিমত নৃত্য করছিল। আনন্দের কারণ নিদ্রিত এক ভদ্রলোকের মাথার বালিশের ভিতর থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট পেয়েছে। হৈ চৈ শুনে অরবিন্দ জেগে ওঠেন, কিন্তু কানাইকে কিছু বলার আগেই কানাই খান কয়েক বিস্কুট গুঁজে দেয় অরবিন্দের হাতে। ঘুষ পেয়ে অরবিন্দ চুপ করে যান, কানাইয়ের বিপদও কেটে যায়।

বিশ্বাস হয় না এই কানাই ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করতে পারে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন পরেই তাই ঘটল। প্রকাশ্য দিবালোকে, জেলের মধ্যে একদল দর্শকের চোখের সামনে কানাই ও সত্যেন হত্যা করল নরেন গোঁসাইকে, যে বিশ্বাসঘাতকতা করে দলের সব কথা পুলিশের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। কানাইয়ের এই কাজের সমর্থনে বলা যায় যে, এর ফলে অরবিন্দ সমেত অনেকের জীবন সম্ভবত রক্ষা পায়। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের মতে পুলিশ ইতিপূর্বেই বারীন ঘোষ ও অরবিন্দ সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই পেয়ে গিয়েছিল এবং অনেক সন্ত্রাসবাদী অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করে ফেলেছিল এই বিশ্বাসে যে, তাদের স্বীকারোক্তি দলের অন্যান্যদের মুক্তি দিতে সাহায্য করবে। সুতরাং নরেনের মৃত্যুতে প্রকৃতপক্ষে লাভ কিছুই হয়নি।

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। নরেনকে হত্যা করার অপরাধে কানাইয়ের মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে দণ্ডাদেশ ঘোষিত হবার সময় থেকে ফাঁসি দেবার দিনটির মধ্যে তাঁর এক অদ্ভুত পরিবর্তন হয়, দেহের ওজন বেড়ে যায় ষোল পাউণ্ড। জেল কর্তৃপক্ষ ফাঁসির দিন কানাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বারীন ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর দলে এইরকম আরো ছেলে আছে কি না। উপেন্দ্রনাথের কথায় কানাইয়ের মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত পদ্মের মত অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত মনে হচ্ছিল।

এই কাহিনীর তাৎপর্য এই যে বঙ্কিম ও অরবিন্দের কল্পনাশক্তি ব্যর্থ হয়েছিল; ব্যর্থতার কারণ অরবিন্দের 'বিপ্লবের' ধারণা পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে, এক কথায় সন্ত্রাসবাদে, যার লক্ষ্য ছিল, 'মর, না-হয় মার'।

ইতিমধ্যে নব্যহিন্দু আন্দোলন মিলিয়ে যাচ্ছিল। তবু স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শত ব্যর্থতা নিয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ সম্ভবত এই দুটি ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু এর বৃহত্তর তাৎপর্য হল 'রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ'। মহাত্মা গান্ধী এইজন্যই বলতে পেরেছিলেন, বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙনের প্রথম অবস্থা।[৪৬] এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই

সফলতার কাছে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ যতখানি হেতু, নব্যহিন্দু আন্দোলন ভারতে রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে ততখানি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ মূল আন্দোলনের ব্যর্থতার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করতে গিয়ে নব্যহিন্দু চেতনা হারিয়ে যাচ্ছিল, যা ছিল এর একমাত্র লক্ষ্য। এর অন্যান্য লক্ষ্যগুলি ছিল,—সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর উত্থান, শিক্ষার মাধ্যমে স্ত্রীজাতির উন্নতি এবং প্রাচীন সভ্যতার আলোকে হিন্দুসমাজকে আলোকিত করা। বিভিন্ন কারণে এগুলি সাফল্য অর্জন করেনি।

ব্যর্থতার বড় কারণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্খা, যা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকে বাঙালী যুবকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭—এই বিয়াল্লিশ বছর কেটেছিল শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য, আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়েছিল। 'নব জাগরণের' অন্যান্য বিষয়গুলি, যা নব্যহিন্দু আন্দোলনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, অবজ্ঞাত হতে থাকে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনাগুলি শুধুই আক্ষেপে ভরা। এইজন্য তাঁর রচনাগুলি রাজনৈতিক সংগ্রামের উৎস হলেও, তিনি নিজে রাজনীতি থেকে সরে যান।

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের ব্যর্থতাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নব্যহিন্দু আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের সমর্থন। অথচ তাঁদের চিন্তা ও কর্ম রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে এমনভাবে আবৃত ছিল যে প্রাচীন সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়ে কোন কার্যকরী উৎসাহ তাঁরা দেখাতে পারেন নি।

স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা অনুসারে রামকৃষ্ণ মিশন সমাজের নীচু শ্রেণীর মানুষের মুক্তির জন্য লোকশিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের মানবসেবা-ধর্ম আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেও, রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর শিক্ষাদর্শ গ্রহণ না করে শিক্ষাবিস্তারের কাজ শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এই প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দের নব্যহিন্দু চেতনাকে অনুসরণ করে শিক্ষাকে রূপ দিতে কখনও সচেষ্ট হয়নি। এই ব্যর্থতাও নব্যহিন্দু আন্দোলনের অসফলতার জন্য কম দায়ী নয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছিল। রাজনীতি থেকে অরবিন্দের নিষ্ক্রমণ নব্যহিন্দু আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনা। নব্যহিন্দু আন্দোলনে সমসাময়িক হতোদ্যম ভারতীয়দের রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস ছিলেন অরবিন্দ। অরবিন্দই ধর্মরাজ্যের চিন্তাকে প্রসারিত ও উজ্জীবিত করে ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে অনেকখানি রূপ

দিয়েছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ পথে বিপ্লবীরা এগিয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মনিয়ন্ত্রিত দেশপ্রেমকে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন দেশপ্রেমের ধর্মে'। বিবেকানন্দের পর তিনিই ছিলেন নব্যহিন্দুর সবচেয়ে বড় ও সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী। তাঁর জীবনের প্রথম অর্ধ মানবত্তার মুক্তি সংগ্রামে নিয়োজিত। অপর অর্ধ নিজের মুক্তির জন্ত ব্যয়িত। কিন্তু বিবেকানন্দ যেখানে কর্মের মধ্যে এবং অসময়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন, অরবিন্দ জীবনের মধ্যভাগে আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় রাজনৈতিক কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. Bipin Chandra Pal : Swadeshi and Swaraj, pp. 17,
২. Ibid, pp. 19-20.
৩. উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই নামে তিনি আর্য সমাজ আন্দোলন, থিয়োসফি এবং শশধর ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের আদর্শকে প্রচার করেছেন।
৪. R. C. Majumdar : Historyof the Freedom Movement in India, Vol. 1, p. 373.
৫. Bipin Chandra Pal : Swadeshi and Swaraj, pp. 24-29. ১৯০৫, ফেব্রুয়ারী মাসে এটি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার ছ'মাস পূর্বে।
৬. যোগেশ চন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ. ৮৮।
৭. ঐ, পৃ. ৯১।
৮. ঐ, পৃ. ৯২।
৯. হনুমানবাবু : লোকরহস্য (১৮৭৪)।
১০. পলিটিকস্ : কমলাকান্ত (১৮৭৫)।
১১. Sri Aurobindo : Bankim-Tilak-Dayananda, 1947, p. 10.
১২. Bipin Chandra Pal : Memories of my Life & Times, Vol. I, pp. 227-28.
১৩. বঙ্কিম রচনাবলী : শতবার্ষিকী সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
১৪. বঙ্কিমচন্দ্র : ধর্মতত্ত্ব, একবিংশতিতম অধ্যায় ও চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।
১৫. ঐ, অধ্যায়-২৪।
১৬. ঐ, অধ্যায়-২৪।
১৭. আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
১৮. আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।
১৯. আনন্দমঠ : উপক্রমণিকা।
২০. অন্তিম অধ্যায়।
২১. ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।
২২. S. Sarkar : The Swadeshi Movement, Chapter III, A Tripathi : The Extremist Challenge, p. 151.
২৩. Bande Mataram, April 26, 1907.

২৪. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee : Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics, p. 117.

২৫. R. C. Majumdar : Freedom Movement in India, p. 191.

২৬. Bipin Chandra Pal : Swadeshi and Swaraj, p. 207.

২৭. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee : Sri Aurobindo and the New thought in Indian Politics, p. 237.

২৮. Ibid, p. 238.

২৯. Bande Mataram, March 16, 1908.

৩০. R. C. Majumdar : History of the Freedom Movement in India, Vol. II, p. 33.

৩১. রবীন্দ্র রচনাবলী : শতবার্ষিকী সংস্করণ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বাদশ খণ্ড, স্বদেশ ও সমাজ, পৃ. ৬৮৫.

৩২. ঐ, পৃ. ৬৮৫.

৩৩. ঐ, পৃ. ৬৮৫।

৩৪. ঐ, পৃ. ৭৭৫।

৩৫. ঐ, পৃ. ৬৯০, ৬৯২।

৩৬. বঙ্কিমের মাতৃভাষার স্বপক্ষে বক্তব্য।

৩৭. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ, মে ১৯০৫। পাঠকদের স্মরণ করা উচিত যে, স্বদেশী আন্দোলন ৭ই আগস্ট ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হলেও এর আবেগ সৃষ্টি হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব থেকে।

৩৮. বঙ্কিমচন্দ্র : ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চদশতম অধ্যায়।

৩৯. R. C. Majumdar (ed) : Vivekananda Centenary Volume, p. 488

৪০. R. C. Majumdar : History of Freedom Movement in India, Vol II.

৪১. Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee : Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics, p. 135.

৪২. Karmayogin : An open letter to my Countrymen, July 3, 1909.

৪৩. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee : Sri Aurobindo and the New Thought in Indian Politics, p. 382.

৪৪. Ram Gopal : Lokamanya Tilak, p 147

৪৫. উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : নির্বাসিতের আত্মকথা।

৪৬. M. K. Gandhi : Hindu Swaraj.

১০

উপসংহার

আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য ভাব-ইতিহাস (History of ideas); নব্য-হিন্দু আন্দোলনের ভিত্তি গঠনে যে সব ধ্যান-ধারণা কার্যকারী ভূমিকা নিয়েছিল, সে সব ধ্যান-ধারণা বিকশিত হওয়ার ঐতিহাসিক পর্যায় বর্ণনা করা। এখন আমরা নব্যহিন্দু আন্দোলনের প্রভাব নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব। বাঙলার ইতিহাসে এই আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, কেননা এর তত্ত্বশক্তি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলি থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা জগতে একটা বিরাট আলোড়ন তোলে। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই আন্দোলনের প্রভাবের একটা তথ্যনিষ্ট ও যুক্তিবাদী পর্যালোচনা।

প্রথমতঃ জাতিভেদ, বর্ণভেদ, শুদ্ধাশুদ্ধি ও অসংখ্য নিষ্প্রাণ আচার আচরণকে সরিয়ে নব্যহিন্দু চিন্তাবিদেরা হিন্দুধর্মের ভিতর থেকে কয়েকটি অপূর্ব নির্যাস বের করেছেন। হিন্দুধর্মের মৌলিক ধর্ম-গ্রন্থ হিসাবে তাঁরা 'উপনিষদ' ও 'গীতা'র মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন; সর্বজীবে প্রেম ও নিষ্কাম কর্মের তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন; ত্যাগের মাধ্যমে কিভাবে মুক্তিলাভ ঘটতে পারে তাঁরা তা দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, নব্যহিন্দু চিন্তাবিদেরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার 'দিব্যদর্শন'কে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কল্পনায় ভারতীয় সেই ছবিকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টায় প্রাচীন ভারতকে ইতিহাসের আলোয় টেনে তুলেছেন এবং সমগ্র সমাজের মধ্যে প্রবাহিত করিয়ে দিয়েছেন একটা ইতিহাস চেতনা। স্বর্ণোজ্জ্বল হিন্দুযুগের নব-ব্যাখ্যা ও নব-প্রাণ প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালীদের মধ্যে একটা নতুন চেতনার অস্তিত্ববোধ জাগরুক হয়ে ওঠে; শুধু তাই নয়, আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক অবয়ব গঠনেও এর অবদান ছিল বিরাট।

আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নব্যহিন্দু আন্দোলন একটা

তাত্ত্বিক দর্শন উপস্থাপিত করে। নৈতিক ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণা ও বিবেকানন্দের বিকাশ সম্পর্কিত ধারণা এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে সংগ্রামী মনোবৃত্তি, স্বদেশী সমাজ ইত্যাদির মতো নব্যহিন্দু ধারণাগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রকৃতই প্রভাবিত করে, বিশেষ করে 'স্বদেশী আন্দোলনে' এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

কার্যাবলীর নিরিখে এই আন্দোলন অংশত সফল, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত বিবরণের মধ্যেই এটি স্পষ্ট। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি অত্যন্ত জটিল, তাছাড়া এই বিষয়টি আমাদের আলোচনারও অন্তর্গত নয়, তবু এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই আন্দোলনের ব্যর্থতা এর তত্ত্ব ভাবনার অসংগতির কারণে নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলার সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে এর ব্যর্থতা অনেকখানি সংশ্লিষ্ট।

এই আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, বাংলার সংস্কৃতি-জীবনে এর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। একটা মহান্ সাহিত্য কীর্তি, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও একটা নতুন ধরণের ধর্মীয় পরিমণ্ডল এই আন্দোলনের ফলে গড়ে ওঠে, যেখানে আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভের বাসনার সঙ্গে মানবতাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীর সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক দশকগুলিতে বাঙলায় যে গৌরবময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তার সব কৃতিত্ব কেবলমাত্র নব্যহিন্দু আন্দোলনে আরোপ করলে ভুল হবে, উদীয়মান জাতীয় চেতনার সঙ্গেই এটি সংশ্লিষ্ট। আবার জাতীয় চেতনার উদ্বো-ধনে এই আন্দোলনের যেমন প্রধান ভূমিকা ছিল, তেমনি জাতীয়তাবাদী পরি-বেশ থেকেও এই আন্দোলন অনেকখানি প্রভাবিত হয়। বাঙলার বিবর্তমান সাংস্কৃতিক জীবনকে দেখতে হবে এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই।

(১) **সাহিত্য** :—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কীয় ধারণা সাধারণতঃ নব্যহিন্দু আন্দোলনের ঋণকে অস্বীকার করে, সাহিত্যের এই বিকাশ পশ্চিমী আমদানী বলেই মুখ্যতঃ স্বীকৃত। তাই আমরা দেখি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা মাইকেলের বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যগাথা প্রাচ্যদেশের চেয়ে পাশ্চাত্ত্যের সূত্রেই বেশী প্রকট, যদিও সংস্কৃত দেশীয় রীতিতে এর আত্ম-বিকাশ অনেকখানিই সংযুক্ত। সাহিত্যে বঙ্কিমের পরিচয় মূলতঃ 'উপন্যাস (Novel) ও প্রবন্ধ (Essay)-কার হিসেবে; প্রবন্ধ সম্পূর্ণতঃ পাশ্চাত্ত্য রীতি, উপন্যাসও তাই; —'কাদম্বরী'র বিশাল দূরত্বেই কেবলমাত্র একে যুক্ত করা যেতে পারে। নিখুঁত বিচারে অবশ্য পাশ্চাত্ত্যের প্রচলিত ধারণায় উপন্যাস বঙ্কিম লেখেননি, তবু সত্য যে 'দুর্গেশনন্দিনী'-র মতো উপাখ্যান স্কটের ঐতিহাসিক

রম্যোনাসের আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) থেকে বঙ্কিমের উপন্যাসের যে ধারা গড়ে ওঠে 'ঐতিহাসিক' কিংবা 'পারিবারিক' উভয়ের সঙ্গেই পাশ্চাত্ত্য রীতির সাদৃশ্য অতি ক্ষীণ। বঙ্কিমের যে কোন 'পারিবারিক' উপন্যাসের আলোচনাতেই এটি প্রমাণিত ; এবং এইসব উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস প্রাণ পেয়েছে এমন এক ধরণের গতিশীলতার স্পর্শে যা বস্তুত গ্রীক ট্রাজেডী অনুসারী। আবার, কাহিনী বিন্যাসে অলৌকিক ঘটনার সংযুক্তিও উল্লেখযোগ্য; উপন্যাস নয়, বরং ট্রাজিক নাটকের সূত্রেই কাহিনীগুলি চরম মুহূর্তে পৌছে যায়। নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের সাহিত্য মাত্রা তাঁর নিজেরই সৃষ্টি, তবু তাঁর সাহিত্য রচনায় পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব বিশেষভাবেই শক্তিশালী, এ কথাটা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। বাংলা সাহিত্যে গীতি-কবিতা (Lyric) অর্বাচীন নয়; চণ্ডীদাসের কাব্য, যার অনেকখানি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেম-কাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম, গীতি কবিতার আদলেই গড়া। কিন্তু আমাদের এই প্রাচীন কবি ইংরাজী গীতি-কবিতা সম্পর্কে পূর্ণতঃই অপরিচিত ছিলেন, পরিচয়ের কোনরকম সুযোগ থাকাই সেখানে সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সেখানে সবটুকুই গ্রহণ করেছেন; তাঁর কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস সবক্ষেত্রেই এই গ্রহণ বড় স্পষ্ট।

এইসব সাহিত্য রচনার বহিরঙ্গের কাঠামোকে ছেড়ে আমরা যখন তার অন্তঃস্থ বিষয়ের কাছে আসি, আমরা সম্পূর্ণ একটা নতুন জিনিসের মুখোমুখি হই, এবং নব্যহিন্দু প্রভাব সম্পর্কে লক্ষণীয় দৃষ্টান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। এর অর্থ এই নয় যে, ঐসব লেখকেরা নব্যহিন্দু চিন্তাধারাই প্রচার করেছিলেন, অবশ্য বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' সম্পর্কে এ মন্তব্য অনেকাংশে সত্য। হিন্দু সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে কিছু কিছু রচনা নব্যহিন্দু ;—প্রচলিত প্রথাকে অন্ধভাবে অনুসরণ কিংবা বর্জন নয়, বস্তুতঃ মানব সম্পর্কের একটা বিশেষ আপেক্ষিকতায়, বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলি একটা মহত্তর পূর্ণতার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেছে। তারা সব নব্যহিন্দু—হিন্দুয়ানীর গৌরবগান করে; যুদ্ধ ও জয়ের পরিবর্তে সেবা ও ত্যাগের আলোকে উজ্জ্বল প্রাচীন সভ্যতার বিশিষ্টতার পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায়; বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপাদানের প্রতি জোর দিয়ে নারীসুলভ কোমলতাকে পৌরুষের দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত করে, যাতে ভাষা তার বৈশিষ্ট্য না হারায় এবং মানবীয় আবেগের শ্রেষ্ঠতম বাহনও হয়ে ওঠে।

রচনাশৈলীর এই সংস্কৃতকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নবহিন্দু আন্দোলনের পূর্বে মাইকেলের রচনায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি বড় বিস্ময় যে, মাইকেল, যিনি তাঁর সময়কার সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পশ্চিমী ভাবাক্রান্ত, সাহিত্যরচনায় সংস্কৃত শৈলীর প্রতি তিনিই নির্ভর করেছেন। ইংরাজী ও ইউ-

রোপের অন্যান্য ধ্রুপদী ভাষার প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা নিয়েও এবং কাব্যরচনায় মিল-টনের ব্ল্যাঙ্ক্‌ভার্সকে গ্রহণ করেও, মাইকেল তাঁর কাহিনী নির্বাচন করেছেন বাল্মিকী থেকে, এবং শুধু তাই নয়, ইউরোপীয় শৈলীকে অনুকরণের চেষ্টা না করে সংস্কৃত-করণের জন্যই প্রয়াস করেছেন। ছন্দ ও শৈলীর এই পুনর্গঠন চর্চায় মাই-কেলের কাব্য শ্রেষ্ঠতম, প্রতিভার বিরাট জাদুতে গেঁয়ো ভাষাও কাব্যে শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম আবেগের বাহন হতে পেরেছে।

মাইকেলের অবদান যেখানে ভাষা ও ছন্দে, বঙ্কিমের সৃষ্টি সেখানে বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় চরিত্র চিত্রণে। চরিত্রগুলি বিস্ময়কর তাদের বৈচিত্রে, বিস্ময়-কর কারণ বঙ্কিমকে বাদ দিলে আমাদের সাহিত্যে এ বিষয়ে অদ্ভুতভাবেই দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। বঙ্কিমের জগৎ যেন হিমালয়ের মতো, সে জগতে নারীরা অশ্রুমতী নয়, সমাজ শৃংখলের বেদীতে তারা জীবন উৎসর্গ করে না; সে জগৎ সৌর্যের জগৎ, কর্মই সেখানে প্রধান শক্তি : অস্ত্রের ঝনঝন শব্দে সৈনিকরা সেখানে উন্মত্ত হয়ে ওঠে; রাষ্ট্রের পতন কামনায় রাষ্ট্রনেতা সেখানে অনিমেষ, অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করে নারী সেখানে ছুটে যায় তার প্রিয়তমর মিলনাকাঙ্খায় কিংবা একইসঙ্গে উভয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আবেগের প্রচণ্ড তীব্রতায়, পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সাধনের আকাঙ্খায় সত্যদ্রষ্টা আত্মোৎসর্গ করে, আবেগপ্রবণ তরুণ এক পাপ থেকে অন্য আর এক পাপচক্রের মধ্যে নিমজ্জিত হতে হতে ছিন্ন ভিন্ন আত্মাকে ঈশ্বরে সমর্পন করে প্রশান্তি খোঁজে—এক কথায়, বঙ্কিমের জগৎ জীবনের সমস্ত আঙ্গিক নিয়ে ফুটে ওঠা এক বিশাল জগৎ, সাহিত্যকর্মের চরম উৎকর্ষতায় জীবনকে স্পর্শ করার শেষ সীমানা পর্যন্ত এ জগতের পরিধি। তাদের প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছাতে না-পারা ব্যর্থ সব নায়কদের নিয়েই বঙ্কিমের কাব্যসুলভ সাহিত্যিক উৎকর্ষতা, কিন্তু তবু সেইসব ব্যর্থ নায়কদের মধ্যেও ধ্বনিত হয়ে উঠেছে মহৎ লোকেরা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে নিয়েই জীবন পথে চলে কারণ এসব বাদ দিলে তার মানসিক বৃত্তির বিকাশলাভেই বাধা পড়ে।

যখন আমরা বলি এই কর্ম ও সংগ্রামের জগৎ একান্তই নব্যহিন্দু চিন্তাধারা প্রসূত তখন আমরা বোঝাতে চাই যে, বঙ্কিমের অধিকাংশ নায়কই ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ; বেশীরভাগ সময়ই এই নায়কেরা রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সংগ্রাম করে (যেমন রাজসিংহ, সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক, সীতারাম) কিংবা ক্ষাত্রচিত শৌর্যেই তারা সংগ্রামী (যেমন প্রতাপ, ভবানন্দ), কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই (রাজসিংহকে বাদ দিয়ে) তারা বিয়োগান্তক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে গেছে। এইসব সাহিত্যকর্মে হিন্দুয়ানী বিশেষ নেই বলে তর্ক চলতে পারে, ঠিক যেমনভাবে বঙ্কিমের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সম্পর্কে পরবর্তী-কালের বঙ্কিম সমালোচকেরা অভিযোগ করেছেন যে এইসব উপন্যাস হিন্দু

সংকীর্ণবাদের কাহিনী এবং বিদ্বেষপূর্ণ রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যম। কিন্তু সূক্ষ্ম-দর্শী পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করবেন যে, বৃহত্তর অর্থেই বঙ্কিমের সৃষ্ট নায়কেরা হিন্দু মতাবলম্বী; সমগ্র নব্যহিন্দু আন্দোলনের পরিসরেই তাদের পদচারণা। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখলে এবং ঠিক ঐ সময়ের (১৮২০--১৮৭০) ধর্মীয় ইতিহাসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আলোচনা করলে আমাদের বক্তব্য অভ্রান্তই হয়ে উঠবে। ধর্মের ক্ষেত্রে বঙ্কিম পূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্য যেমন ব্রাহ্মসংস্কারবাদ তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঐ যুগ সংস্কারের যুগ, যার সূত্রপাত ঘটেছিল 'নব বাবু বিলাস', মাইকেলের প্রহসন, দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ইত্যাদি রচনায়। ধর্ম ও সামাজিক আচার আচরণে পরবর্তী যুগটি যেমন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা পশ্চিমীকরণের মধ্যে বিশিষ্ট, ঠিক তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে হিন্দু মহাকাব্যের নায়ক নায়িকাদের মাইকেল প্রমুখ গ্রীক ছাঁচে গড়ে তোলার মধ্যে বিশিষ্ট। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়কদেরকে বিচার করতে হবে এই প্রেক্ষাপটেই।

বঙ্কিম সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির বিশ্লেষণে আমাদের সিদ্ধান্তে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সকলেই জানেন, বঙ্কিমের সৃষ্ট অধিকাংশ নারীচরিত্রই সংস্কৃত শব্দ 'সতীত্বে'র মহিমা প্রচার করেছে। বিবাহিতা নারীর বিশ্বস্ততার সম্পর্কেই সতীত্ব শব্দটি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু স্বামীর প্রতি যৌন বিশ্বস্ততা সতীত্বের একটি অংশমাত্র, সতীত্ব প্রকৃতপক্ষে একটা বিশাল ধারণার অনুপুঙ্খ অনুভব। এর মধ্যে রয়েছে নারীর 'মর্যাদা'—স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর সমবিশ্বস্ততা ও সামাজিক সম্মান যা বিবাহিতা নারীর অবশ্য প্রাপ্য; এর মধ্যে রয়েছে তার ধর্মীয় অভিষেক, যাতে স্বামীর প্রতি ভক্তিতে তার মোক্ষলাভ ঘটে এবং স্বামীর দুর্বলতায় বীরাঙ্গনা আদর্শের প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে ওঠে, এর মধ্যে রয়েছে মাতৃত্ব, যে মাতৃত্ব সন্তান পালনকে উপাসনারূপেই গণ্য করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'সতীত্ব' শব্দটি একটা বিশাল, মহান্ ও বহুধারণার অমূর্ত প্রকাশ, এবং কোন সন্দেহ নেই বঙ্কিমের সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি 'সতীত্ব' ধারণার মূর্তিমতি প্রকাশরূপেই চিত্রিত হয়েছে। উদাহরণে দেখা যায়, 'ভ্রমর' নিজেকে স্ত্রীর মর্যাদাতেই প্রকাশ করেছে, সে বরং মৃত্যু বরণ করবে তবু অনাচারী স্বামীকে স্বীকার করবে না; দুর্বল ও অস্থিরমনা 'রমা' স্ত্রীর প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা লাভেরপ্রচেষ্টায় জনসাধারণের হৃৎকম্প সৃষ্টিকারিণী ইস্পাৎ কঠোর হয়ে উঠেছে; রয়েছে 'লাবণ্য'; সবশেষে ভক্তির জন্য 'শান্তি' ও 'প্রফুল্ল' তাঁদের স্বামীকে অলৌকিক মহত্বের পথে চালিত করেছে। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সতীত্ব থেকে স্খলিত 'শৈবালিনী' প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পার্থিব নরকাগ্নিতে জলে পুড়ে মরেছে। সাহিত্যিক বঙ্কিম এক্ষেত্রে নীতিবাদকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, তবু বঙ্কিমের প্রতিভা সচেতনভাবেই হিন্দু

সততার প্রতিমূর্তিরূপেই নারীচরিত্রগুলিকে উন্মোচন করেছে; তাঁর নারীচরিত্র-গুলি তুচ্ছতায় অবনমিত নয়, বস্তুতঃ তাঁর সকল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় প্রাণশক্তি-রূপেই প্রতিভাত।

রবীন্দ্রনাথে পৌছে আমরা কতকগুলি প্রাথমিক অসুবিধার সম্মুখীন হই, যাতে তাঁর রচনায় নব্যহিন্দু ধারণা খুঁজতে কিছু বাধা আসে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এত বিশাল ও বৈচিত্র্যময় যে কোন একটা বিশেষ ধারণায় তাকে বাঁধা যায় না, তাছাড়া এ প্রচেষ্টা ভ্রান্ত হতেও বাধ্য। তবু আমাদের একটা বিশেষ সুবিধা আছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমাদের বিচার্যবিষয়। সুতরাং তাঁর লেখা এর পরের রচনাগুলি আমাদের আলোচনার বাইরে। তাহলেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় নব্যহিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি অনেক বিষয়ে তিনি ব্রাহ্মবাদী এবং তাঁর অনেক রচনাতেও এর স্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর প্রথমদিককার রচনা, 'বিসর্জনে'র কেন্দ্রীয় ভাবনায় দেখা গেছে, মা কালীর সামনে পশুবলি দেওয়া অত্যন্ত জঘন্য ও নিষ্ঠুর প্রথা বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু তবু সন্দেহ নেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথের রচনায় নব্য-হিন্দু ধারণার একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে, বিশেষ করে 'চৈতালী' ও 'নৈবেদ্য',—প্রাচীন ভারতের আরণ্যক আদর্শই এদুটি কাব্যের প্রধান ভাব। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি স্পষ্ট আহ্বানই এই কবিতাগুলিতে ধ্বনিত হয়েছে।

আমাদের সময়সীমায় (১৯১১ পর্যন্ত) লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটো রচনা 'কথা ও কাহিনী' ও 'কাহিনী'তে নব্যহিন্দু ঝোঁকই শুধুমাত্র উপস্থিত নয়, যাতে মৌলিক তথ্যের একটা নতুন মাত্রা আমাদের সিদ্ধান্তে আসে এবং এটি উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে, প্রকৃতপক্ষে এ রচনাদুটি নব্যহিন্দু ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত। 'কথা ও কাহিনী' কতকগুলি ব্যালাড-এর সমষ্টি—এই ঐতিহাসিক ও আধা ঐতি-হাসিক কাহিনীগুলি থেকে বঙ্কিমও তাঁর রসদ সংগ্রহ করতে পারতেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীগুলিকে তাঁর নিজস্ব বিশিষ্টতায় রূপায়িত করেছেন। কোন অর্থেই কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কবিতা এগুলি নয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ কয়েকজন নায়ক নায়িকার জীবনের তীব্রতম মুহূর্তের স্থিরচিত্র সে সব। আত্মবিকাশের অন্ধ আবেগে স্বতাড়িত আত্মবলির তাদের সেই চরম মুহূর্তগুলি রবীন্দ্রনাথ এঁকে-ছেন অল্পকথায় ও কারুকার্যহীন সরল ভাষায়। বেশ কিছু কবিতায় নাটকীয়-ভাবেই আত্মত্যাগের অনুভবগুলি ছড়িয়ে পড়েছে। 'কথা ও কাহিনী' সম্পূর্ণ নতুন মাত্রার ধর্মীয় কবিতা, বিশ্ব সাহিত্যে এর তুলনীয় কোন কবিতা নেই।

'কথা ও কাহিনীর'র সঙ্গে 'কাহিনী'র সাদৃশ্য অল্প, সংলাপাকারে পাঁচটি কবিতার সমাহার এই কাব্যগ্রন্থটি, এর তিনটি চরিত্র মহাভারত থেকে নেওয়া,

কিন্তু প্রত্যেকটিতেই[১] এক ধর্মীয় ভাবনা বহমান। এদের মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন' সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

আমাদের সাহিত্যে 'গান্ধারীর আবেদন' মহত্তম কবিতাগুলির অন্যতম। এর মূল বিষয় কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি রাজ্ঞী গান্ধারীর নিষ্ফল আবেদন—দুর্যোধন পাণ্ডবদেরকে কৌশলে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করলে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্বামীদের এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সামনে প্রকাশ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের প্রচেষ্টায় যে দানবীয় পাপ ও কলঙ্ক সম্মানীয় কুরুবংশের উপর পড়েছে, সে কারণে দুর্যোধনকে নির্বাসন দেবার জন্য গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। কাহিনীটি মহাভারতের অবিকল এবং চরিত্রগুলিও মূলের অনুরূপ। অত্যন্ত যত্নশীলভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীকে অনুসরণ করেছেন।

সমগ্র মহাভারতের চুম্বক হিসাবে 'গান্ধারীর আবেদন' অনন্য, বিশাল মহাকাব্যের সহস্রভাগের একভাগ জুড়েও কবিতাটি নেই। এর অনন্যতা আরো যে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে মায়ের মুখেই তার সন্তানের ভয়ঙ্কর বিজয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মের যে অবনমন সংঘটিত হচ্ছে তার উদ্ঘাটন এবং সে মা তার ভয়াবহ আধ্যাত্মিক বিচ্ছিন্নতা দিয়ে পরিপূর্ণ অনুভব করেছে যে, এক সংকট ধীরে ধীরে তার সংসারকে গ্রাস করতে আসছে। তার সন্তানে যত বেশী রাজকীয় মহিমা প্রাপ্ত হচ্ছে, অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা আসছে তত বেশী বেশী পরিমাণে। আত্মধ্বংসী গর্বে দুষ্ট সন্তান, ধ্বংসের আগমনে সচেতন তবু মোহমুগ্ধ পিতা, ধ্বংস এড়াবার ক্ষমতাও তার নেই, সর্বোপরি ধর্মপরায়ণা মা তার অপরিসীম যন্ত্রণায় ব্যাকুল—এসব কিছুই অতুলনীয় মাহাত্ম্য ও শিল্পশৈলীর অসাধারণ টানে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরেও খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা সাহিত্যে নব্যহিন্দু ধারণার প্রভাব সম্পর্কে আমাদের উপরোক্ত আলোচনা স্পষ্টতঃই সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ আমাদের নেই, এবং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনেক রচনাও বাদ পড়ে গেছে—রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার ছোটগল্প কিছু কিছু গল্প যেমন, 'দৃষ্টিদান' ও 'মেঘ ও রৌদ্রে' নব্যহিন্দু ভাবনা প্রকৃতই স্পষ্ট। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের মহৎ সৃষ্টি 'গোরা'কেও আমরা পশ্চাতে রেখেছি; 'গোরার' নায়ক একজন নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম পরেশবাবুর চেয়েও তার মহত্ত্ব বেশী, এবং পরেশবাবুর ব্রাহ্মচিন্তা অবশেষে যখন গোরার নব্যহিন্দু চিন্তার উপর বিজয় ঘোষণা করে, সে বিজয় কাকেও অভিভূত করে না, গোরার নব্যহিন্দু ইমেজই পাঠকদের আলোড়িত করে। সাহিত্যে নব্যহিন্দু প্রভাব বিষয়ে আমাদের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত, তবু দেখা যায় যে আমাদের সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ও মহৎ অংশ জুড়েও নব্যহিন্দু ধারণা প্রবাহিত।

(২) **চিত্রকলা** :—আমাদের মতে এ যুগের চিত্রশিল্প সাহিত্যের মতো অত উৎকৃষ্ট নয়। তবুও একথা সর্বজনস্বীকৃত যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় ভারতীয় চিত্রশিল্পে যে নতুন ধারা গড়ে ওঠে, সেই ধারাই আধুনিক যুগে সৃষ্ট একমাত্র ভারতীয় শিল্পধারা যা মৌলিকতা ও উৎকর্ষে চমকপ্রদ। আরো, বিদ্রোহ হিসাবেই স্বীকৃত যে এই 'নব্য ভারতীয় শিল্পী'রা পশ্চিমী শিল্পরীতির অনুকরণের বিরুদ্ধে যে শিল্পচর্চা শুরু করেছিলেন সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—যাতে তাদের শিল্প উৎকৃষ্ট হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এই নতুন শিল্পীরা নব্যহিন্দু ছিলেন, তাঁরা মূলতঃ 'জাতীয়', কিন্তু তবু লক্ষ্য করা যায়, অবনীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণ-লীলা'-বিষয়ক চিত্রমালা, কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার' থেকে কিছু কিছু দৃশ্যের চিত্ররূপ, 'বুদ্ধ ও সুজাতা'—এসবই এক অর্থে নব্যহিন্দু, কেন না এসব ছবির প্রাণভোমরা রয়েছে অতীত ভারতের সভ্যতায়, নব্যহিন্দু আন্দোলনের যা একটা বিশেষ দিক। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের আগ্রহ ধর্মীয় কারণে নয়, তাঁর আগ্রহ রোমাণ্টিকতার কারণে। তাই আমরা দেখি, তাঁর বুদ্ধ ছবিখানি ('বুদ্ধ ও সুজাতা' নাম্নী) সমস্ত পবিত্রতা ও ঐতিহ্যগত অবস্থানকে ছাপিয়েও রবীন্দ্র-নাথের উপগুপ্তকে মনে করিয়ে দেয়, এবং তাঁর নিজের (অবনীন্দ্রনাথের) কচ চরিত্রটি ও ('কচ ও দেবযানী' নামে চিত্রটি অভিহিত) বড্ড বেশী পরিমাণে রোমাণ্টিক। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকে বিচার করতে হবে এই সীমাবদ্ধতায়, এবং এই সীমাবদ্ধ-তাকে স্বীকার করলে শিল্প-ভাবনার যে বৈচিত্র্য আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় তাতে নব্যহিন্দু প্রভাব থাকা সম্ভবপর বলেই ধারণা হয়।

(৩) **রামকৃষ্ণ মিশন** :—আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অন্বেষার সঙ্গে মানবতাবাদী কর্মকাণ্ডের একীকরণের নব্যহিন্দু তত্ত্ব যে কত প্রভাবশালী তা লক্ষ্য করা যাবে বিবেকানন্দের প্রয়াণলাভের পর থেকে অসংখ্য ধর্মীয় সংস্থার উদ্ভবের মধ্যে; এইসব ধর্মীয় সংস্থা নব্যহিন্দু ভাবনার ঐ দুই লক্ষ্যকে একসূত্রেই গেঁথেছে এবং বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত সংস্থার সঙ্গেও এইসব সংস্থার সাদৃশ্য অনেকখানি। মানব-সেবামূলক কাজে অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের তুলনা হয় না তবু রামকৃষ্ণ মিশন এই ধরণের সংস্থার কাছে পথ-প্রদর্শক। আমাদের আলোচনা কেবলমাত্র রামকৃষ্ণ মিশনকে নিয়ে, অন্যগুলির আলোচনা আমরা করছি না।

বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত মিশন যদি কেবলমাত্র দেশজুড়ে হাসপাতাল, ত্রাণকেন্দ্র ও বহুসংখ্যক সাহায্য সংস্থা গঠনের মধ্যেই তার সেবাকর্মকে নিয়োজিত রাখত তাহলেও এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হত। এ বিষয়ে অতীতকালে গড়ে ওঠা ধর্মীয় সংস্থাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্মার্নাহ নয়। রামকৃষ্ণ-মিশন স্থাপনের পূর্বে শত শত ধর্মীয় সংস্থা আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের মতো মানবসেবামূলক উদ্যোগ নিতে কাউকে দেখা যায় নি।

বিবেকানন্দের যুগান্তর সৃষ্টিকারী বাণীর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ভগিনী নিবেদিতা পূর্বেকার ধর্মীয় সংস্থাসমূহের মানবসেবামূলক কাজকর্মের দুর্বলতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "In India the head and front of the demand made on a monastic order is that it produces saints." বিবেকানন্দ মিশনের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী তার প্রমাণ মিলবে এই সাক্ষ্য থেকে যে আমাদের দেশে একটিও কোন বিশিষ্ট ধর্মীয় সংস্থা ছিল না, যারা অন্ততঃ মৌখিকভাবেও মানব-সেবার কথা বলবে। এক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতই একটা 'যুগান্তকারী' ঘটনা।

মানুষের সেবা প্রকৃতপক্ষে সেকুলার বলে অনেকে বলতে পারেন, এ ধরনের কাজে পূর্ণতঃ সাফল্য আসবে সেকুলার সংস্থার মাধ্যমেই, কিংবা এমনকি রাষ্ট্রের মাধ্যমেও। বিবেকানন্দ মিশনের তাৎপর্য এই যে, সাহায্যদানকেও এই প্রতিষ্ঠান ভাবগম্ভীর ধর্মানুষ্ঠানের উচ্চ ভাবনায় তুলে ধরতে পেরেছে এবং কর্মশালার গন্ধে কলুষিত ও হৃদয়হীন ডোলকেও (Dole) পবিত্রতায় মহিমান্বিত করেছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার, ভগিনী নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের অন্যান্য কয়েকজন শিষ্যের সেবাকর্মের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মহামারী দেখা দিলে সে প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ লিখেছেন, "When the sweepers had fled away, (I) chanced upon a white woman one day clearing the streets with broom and basket in hand. This was none other than Nivedita." তিনি আরো লিখেছেন, "If the stench of garbage accumulated in a narrow lane repelled even the practised sweepers (another disciple) would non chalantly snatch the basket and spade from one of them and set about removing the decomposed heap till the sweepers too would step forward... At the end, he would congratulate them and embrace them warmly, regardless of their social distance or dirty bodies. Or if there was an uncared for patient he would hug him and nurse him to recovery." ইনিই ছিলেন স্বামী সদানন্দ।

উপরের দুটি উদাহরণ থেকে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে গৌরবোজ্জ্বল মহিমা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী সদানন্দ এভাবেই মানবসেবামূলক কাজে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মিশনের নিজস্ব অফিসিয়াল ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনার উল্লেখ নেই। এমনকি স্বামী গম্ভীরানন্দের 'ইতিহাসে'ও এই ভাবই প্রধান যে, মিশনের অবদান মূলতঃ তার কর্মকাণ্ডের বিশালতায়, রামকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য

সংস্থাই সেখানে মূল বিচার্য। উপরে আমরা মাত্র দুটো উদাহরণ দিয়েছি, তবু এ থেকেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ নিবেদিতা ও সদানন্দের মধ্যে 'সেবা'র মহৎ আদর্শ কার্যকরী ছিল। অন্যান্য আরো কয়েকজন সন্ন্যাসীর মধ্যেও যে এ ধরণের সেবাকর্মের আন্তরিক আগ্রহ ছিল ভগিনী নিবেদিতার বক্তব্য থেকেও তা মিলবে : "I know of one disciple, who, in the early days of the order, was so filled with the impulse of this reverence (for work as worship) that he sucked the sores of the lepers to bring them case."[2]

বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনই নব্যহিন্দু আন্দোলনের একমাত্র প্রত্যক্ষ ফসল যা এখনও টিকে রয়েছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা মারা যান; কতক অর্থে তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। নিঃসন্দেহেই তাঁদের কাজকর্ম উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। তবু কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের অবসানে নব্যহিন্দু আন্দোলনের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে; আন্দোলনের ধর্মীয় ভাব চাপা পড়ে গিয়ে রাজনৈতিক প্রবাহ মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা উচ্চারণ করা বালখিল্যতা, তবু অস্বীকার করা যায় না যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই সংস্থা বিবেকানন্দের আকাঙ্খিত সুমহান্ প্রকল্পের রূপায়নে প্রচেষ্টা পায়নি। বিবেকানন্দের সেই পরিকল্পনার প্রথম লক্ষ্যটি ছিল, সারা দেশে সন্ন্যাসীদেরকে ছিটিয়ে দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণকে উন্নত করে তোলা যাতে জনসাধারণের জীবিকা সমস্যার সমাধান হয়, এবং নারী জাতির জাগরণ সম্ভব করে তোলা।